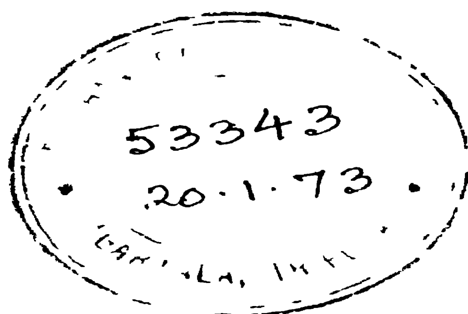
সংস্কৃতির ধর্ম

দক্ষিণারঞ্জন বসু

সংস্কৃতির ধর্ম

দক্ষিণারঞ্জন বসু



ভারতী বুক স্টল
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীহৃষীকেশ বায়িক
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন, ১৯৫১

মূল্য ঃ আট টাকা মাত্র

মুদ্রক ঃ
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৫, চিন্তামণি দাস লেন
কলকাতা-৯

সূচীপত্র

ডক্টর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

করকমলে

এই লেখকের অন্যান্য
বইয়ের কয়েকখানি

শতাব্দীর সূর্য
ছেড়ে আসা গ্রাম (দুই খণ্ড)
বিদেশ বিভূঁই
পরম্পরা (উপন্যাস)
লাইলাক একটি ফুল ,,
এক আকাশে অনেক তারা ,,
বনহরিণীর সংসার ,,
বন্যায় বন্যায় ,,
সুভদ্রার ভিটে (গল্প)
অনেক সুর ,,
জীবন-যৌবন ,,
মধুরেণ ,,
একটি পৃথিবী ,,
একটি হৃদয় ,,
ফুলের মতন ,,
সাগররাণীর দেশে (কিশোর উপন্যাস)
পেনাং-এর পাহাড়ে ,,
বীর বাহাদুর ,,
আরও সূর্যের কাছে (কবিতা)
অলক্ষ্যে বিকেল ,,
আশা যখন বৃষ্টি ,,
পদ্মা আমার গঙ্গা আমার ,,

'সংস্কৃতির ধর্ম' গ্রন্থখানি রচনার একটি ইতিহাস আছে। হয়তো সব গ্রন্থেরই তা' থাকে, তবে এ ইতিহাস বিশেষ ইতিহাস বলেই উল্লেখ্য।

ইংরিজি বিশ শতকের পঞ্চাশ দশকে বিভিন্ন সভা-সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে আমি ক্রমাগত বিচলিত বোধ করতে থাকি এক অভাবিত বিভ্রান্তির ঘোরে পড়ে। সভায় সভায় এই বিভ্রান্তিকর ভ্রম সংশোধনের চেষ্টা করেও যখন দেখি 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান' সম্বন্ধে ব্যাপক ভুল ধারণা ছড়িয়ে রয়েছে বাঙালী জনসাধারণের মধ্যে, শুধুমাত্র নৃত্যগীত এবং নাট্যাভিনয়কেই তারা 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান' বলে মনে করেন, তখন সংস্কৃতি বিষয়ে, সংস্কৃতির ধর্ম নিয়ে, দু'তিনটি প্রবন্ধ রচনার ইচ্ছা আমার মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে। সেই ইচ্ছার প্রেরণাতেই সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশ্বমনীষীদের মতামত সংগ্রহ করতে থাকি এবং তার ভিত্তিতেই আমার বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করে আমি কয়েকটি প্রবন্ধ তৈরী করে ফেলি।

স্বর্গত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় তখন অধুনালুপ্ত মাসিক 'বসুধারা' পত্রিকার সম্পাদক। তাঁকে 'সংস্কৃতির ধর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধটি দিলে তিনি তা' পরবর্তী সংখ্যাতেই প্রকাশিত হবে বলে আমায় জানিয়ে দিলেন এবং পবের মাসের 'বসুধারা'য় আমার সেই লেখা পড়ে 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক প্রখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক সজনীকান্ত দাস মহাশয় আমায় ডেকে পাঠালেন তাঁর কাছে। 'সংস্কৃতির ধর্ম' বিষয়ক আলোচনা একটি লেখাতেই শেষ করা চলবে না, ধারাবাহিকভাবে এ নিয়ে লিখতে হবে—নির্দেশ দিলেন সজনীকান্ত। যখন তাঁকে জানালাম, এ বিষয় নিয়ে আরো দুটি লেখা আমি তৈরী করে রেখেছি, তাতেও সেদিন তিনি তৃপ্ত হতে পারেন নি। বলেছেন, সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায় এবং আমাদের জাতীয় ও ব্যক্তিজীবনের কোন ক্ষেত্রে সংস্কৃতির কতটা প্রভাব তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ চাই। সেজন্য মাসের পর মাস লিখে যেতে হবে।

বাস্তবিক পক্ষে সজনীকান্তের অনুপ্রেরণাতেই 'বসুধারা'য় আমি প্রায় দেড় বছর ধরে 'সংস্কৃতির ধর্ম' বিষয়ে লিখে চলি এবং আমার প্রতিটি রচনাই আচার্য চারুচন্দ্র সাগ্রহে প্রকাশার্থ গ্রহণ করতেন। সজনীকান্ত মাঝে মাঝেই আমাকে,

নতুন নতুন সব বইয়ের কথা বলতেন যা এই নিবন্ধাবলী রচনায় আমার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

'সংস্কৃতির ধর্ম' গ্রন্থখানি তাই আচার্য চারুচন্দ্র ও সজনীকান্তের হাতে প্রথম তুলে দিতে পারলে আমি অসীম আনন্দ পেতাম। কিন্তু গভীর দুঃখের কথা, তাঁরা উভয়েই দীর্ঘদিন লোকান্তরিত।

এই গ্রন্থ রচনায় স্বভাবতই আমাকে স্বদেশের এবং বিদেশের বহু মনীষীর রচনার সাহায্য নিতে হয়েছে। বিশেষ করে আচার্য ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সংস্কৃতি বিষয়ক বিবিধ আলোচনা থেকে উদ্ধৃতি তুলে অনেক জায়গাতেই আমার বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করতে আমি প্রয়াসী হয়েছি। এই সুধী গ্রন্থকারদের কাছে আমার অপরিসীম কৃতজ্ঞতা এবং অপরিশোধ্য ঋণ আমি অকপটে স্বীকার করছি।

এবার প্রস্তাবনা হিসেবে 'সংস্কৃতির ধর্ম' গ্রন্থের বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কিছু বলা যেতে পারে।

সে প্রসঙ্গেই বলছি, সভ্যতা যদি হীরকখণ্ড হয় তা'হলে সংস্কৃতি বা কালচার হলো তার দ্যুতি। রবীন্দ্রনাথ এমনি করেই আমাদের সংস্কৃতি কথাটি বুঝতে শিখিয়েছেন।

সংস্কৃতি সভ্যতার ঘাড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে সভ্যতা আর সংস্কৃতি এক বস্তু নয়। এই কথাটি সব সময়ই আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। জানা থাকা দরকার, প্রকৃতিতে সভ্যতা নামক বিষয়টি হলো অনেকটা স্থূল, বড়ো প্রয়োজনের ছকে তার চলার পথটি প্রথম থেকেই বাঁধা। সভ্যতা বলতে আমরা যা বুঝি সে পথ থেকে তার বিচ্যুত হবার উপায় নেই।

সংস্কৃতি কিন্তু তা' নয়। বরং বলা চলে একদিক থেকে সংস্কৃতি ঠিক তার উল্টো পথ ধরেই চলে। সে পথ এবং তার পরিবেশ সংস্কৃতির স্বকীয় সত্তায় সমুজ্জ্বল। পরিষ্কার করে বলতে হলে একথাই বলতে হয় যে, সংস্কৃতির যে পথ সে পথে বাস্তব প্রয়োজনের কিংবা বৈষয়িক চাহিদার কোনো কাঠ-পাথর নেই। প্রকৃতিতে সংস্কৃতি হলো সূক্ষ্ম। প্রয়োজনের ভূত কোনো কালেই তাকে ধরতে পারে না। কব্জায় আনতে পারে না। সে আপন মনে আপনি চলে। আপন মনেই সে রসের সমুদ্র থেকে নিজের হাতের ঘটটি ভরে নেয়।

ঐতিহ্য বা ট্রাডিশন কথাটিও জাতের দিক দিয়ে সংস্কৃতি বা কালচার-এর

সঙ্গে এক নয়। ঐতিহ্য ভালোও হতে পারে, আবার মন্দও হতে পারে। এখানে মন্দ মানে বিশ্ব-কল্যাণের কষ্টিপাথরে কষে দেখা মন্দ। কিন্তু সংস্কৃতির ঘটে সে কুরস বা মন্দ ধরে না। সরস বা সুরস দিয়ে সংস্কৃতি তার ঘট ভরে রাখে। অন্য রসের সে ধার ধারে না।

তবে সভ্যতা আর সংস্কৃতিতে একটা দিকে মিল আছে। উভয়ের দৃষ্টিই বিশ্বমুখীন। কোনোটির যাত্রাপথেই ভূগোলের প্রাচীর নেই। জাতীয়তার বেড়া নেই। উভয়েই মানব-চেতনার সামগ্রিক সত্তা, খণ্ডের পাথর দুইয়ের কারুরই পথ রোধ করে রাখতে পারে না।

আবার আর এক দিক দিয়ে ঐতিহ্যের সঙ্গেও সংস্কৃতির কিছুটা যোগসূত্র আছে। ঐতিহ্যের ঘাট থেকেই তো সংস্কৃতি তার ঘট ভরে নেয়। সে ঘট ভরার জন্য সংস্কৃতি কখনও আকাশ-গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকে না। কোনো জাতির ঐতিহ্যে যা-কিছু কল্যাণকর উপাদান আছে, সংস্কৃতির কাজ হলো তা' সংগ্রহ করে আত্মস্থ করে নেওয়া। এই সংগ্রহকেই নিজের ভাণ্ডারে সঞ্চয় করে রাখা। কেন সঞ্চয় করা? বিশ্ব-মানবের মনের খোরাক সরবরাহ করার জন্য। তার আনন্দবিধানের জন্য।

এ দিক দিয়ে সংস্কৃতির কাজ অনেকটা উদ্যানের কাজের মতো। বিচিত্র ফুলের সমারোহ নিয়েই উদ্যান। কতো রূপ, কতো রং, কতো গন্ধ সেখানে। আপাতদৃষ্টিতে উদ্যান বিচিত্র। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে, এই বৈচিত্র্যের ভেতরও একটি ঐক্যের সূক্ষ্ম সুতো আছে। সেই সুতো বিচিত্রকে একটি সুন্দর ঐক্যের বাঁধনে বেঁধেছে। এই একীকরণের কাজটিই উদ্যানের কাজ। বিচিত্র বলেই সে আরও সুন্দর। আর এই সৌন্দর্য মানুষের আনন্দবিধানের জন্য— তৃপ্তিবিধানের জন্য।

আগেই বলেছি, সংস্কৃতির গতি বিশ্বমুখীন। কালচার বা মানসিক উৎকর্ষ এখন আর জাতিবিশেষের কৃতিকে অবলম্বন করে নেই। কালচার বিশ্ব-মানবের সাধারণ সৃষ্টি এবং সাধারণ সম্পদ। সমগ্র জগৎ সেখানে এক। এতে আজ আর কোনো জাতিই বাদ পড়তে পারে না।

আমাদের আচার্যগণ বহু যুগ আগেই বলেছেন:

'যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি,
সর্বভূতেষু চাত্মানং—ততো ন বিজুগুপ্সতে॥'

'যিনি সমস্ত প্রাণীকে আপনাতে দেখেন, আর আপনাকে সমস্ত প্রাণীতে দেখেন, তিনি কারও কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন না, কাকেও ঘৃণা করেন না।'

'আত্মৌপম্যেন ভূতেষু দয়াং কুর্বন্তি সাধবঃ', 'উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্'।—এ সব তো আমাদের দেশের সাধারণ কথা। লাতিন লেখকের homo sum, humani nibil a me alienum puto—' মানুষ আমি, মানুষ সংক্রান্ত এমন কিছু নেই যাকে আমি নিজের থেকে দূরের জিনিস বলে মনে করি।

আমরা চাই, অন্ধকারের বাইরে গিয়ে আমরা যেন জ্যোতি দেখতে পাই। আমাদের প্রার্থনা 'তমসো মা জ্যোতির্গময়', এবং More Light, আমাদের প্রার্থনায় আছে, 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ', তিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিচালিত করুন। 'স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু'—তিনি আমাদের শুভবুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত করুন। বাইরের জগতের সৌন্দর্য আর মোহ যেন আমাদের অভিভূত করে সার সত্যের সন্ধানের পথে বাধা না দেয়—

'হিরণ্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বম্ পুষন্ন অপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥'

'সত্যের মুখ হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা আবৃত, হে পুষা দেবতা, সত্যধর্ম দর্শনের জন্য তুমি তা সরিয়ে দাও।'

আমাদের প্রার্থনা, 'ভদ্রং কর্ণেভি শৃণুয়াম দেবাঃ'—হে দেবগণ, যা ভদ্র তাই যেন আমরা কান দিয়ে শুনি; 'ভদ্রং পশ্যেম অক্ষিভির্ যজত্রাঃ'—হে পূজিত দেবগণ, যা ভদ্র তাই যেন আমরা চোখ দিয়ে দেখি।

সংস্কৃতির ধর্মই হলো এই 'ভদ্র'কে গ্রহণ করা। বিশ্ব-মানবের পক্ষে যা কল্যাণকর, যা 'Light and sweetness' তাকে বরণ করা। সংস্কৃতিবোধের ভেতর দিয়েই বিশ্ববোধের জন্ম। কাজেই সংস্কৃতি চর্চা যত বেশী হয়, বিশ্বের পক্ষে ততই কল্যাণ।

সেই শুভ উদ্দেশ্য পূরণে 'সংস্কৃতির ধর্ম' গ্রন্থখানি কিঞ্চিৎ সহায়ক হলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে হবে।

কলকাতা

দক্ষিণারঞ্জন বসু

সংস্কৃতির ধর্ম

সংস্কৃতি কী, এক কথায় তার উত্তর দেওয়া সহজ নয়। কারণ, সংস্কৃতির স্বরূপের মতো তার সংজ্ঞাও খুব ব্যাপক। প্রাজ্ঞ জন নানা ভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন। গ্যেটের কথাই ধরা যাক। সংস্কৃতির আলোচনায় তিনি সংস্কৃতিবান মানুষের কথা তুলেছেন। এইসব সংস্কৃতিবান মানুষ প্রাত্যহিকতায় হারিয়ে যান না, তাঁদের চাওয়া-পাওয়া মাত্র কয়েকটি স্থূল জিনিসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তাঁরা পড়তে চান, জানতে চান, ভাবতে চান। গ্যেটে আরো ক'টি বিষয়ের কথা বলেছেন যেগুলো সংস্কৃতিবান মানুষের চাওয়া উচিত বলে তাঁর ধারণা। গ্যেটের মতে ঃ

'One ought everyday, at least, to hear a little song, read a good poem, see a fine picture and if it were possible say a few reasonable words.'[1]

অর্থাৎ, সংস্কৃতিবান হতে হলে প্রতিদিন একটু গান শুনতে হবে, কমপক্ষে একখানা ভালো ছবি দেখতে হবে, একটি কবিতা পড়তে হবে, ইত্যাদি।

এমার্সন হয়তো এর উত্তরে বলবেন, এটা সংস্কৃতি নয়—বার্নিশ। কারণ,

'Culture is one thing and Varnish another'.

এমার্সন হয়তো চীনা ভদ্রলোকদের সংস্কৃতিবান বলতে রাজী হবেন না। কেননা, এঁদের সংস্কৃতি-চর্চাও ছিল গ্যেটের রুটিন-মাফিক।

১ Goethe : *Wilhelm Meister's Apprenticeship Bk. V., Chap. I.* Translated by Carlyle.

তাতে সংস্কৃতির চর্চা হয়তো হয়, সংস্কৃতি হয় না। এমার্সন[২] বলেছেন, সংস্কৃতি হচ্ছে একটা যন্ত্রের মতো। সমালোচকদের কাছে যেমন ভাষা, জ্যোতিষীদের কাছে যেমন দূরবীন, সংস্কৃতিবান মানুষের কাছে সংস্কৃতিও তাই। তাঁর মনের শক্তি এর মধ্যে দিয়ে পূর্ণতার সন্ধান করে।

কিন্তু তার পথ কি? Jesee Lee Benett[৩] বলেন, পথ হলো পড়াশুনা করা। তাঁর মতে, যাঁদের মনে জ্ঞানের আগুন এবং চোখে রূপের নেশা আছে, তাঁরা সংস্কৃতিবান।

কিন্তু টি. এস্. এলিযট এর প্রতিবাদ করবেন। কাবণ, এ আলোচনা সম্পূর্ণ ব্যক্তি-কেন্দ্রিক। সংস্কৃতি বলতে এলিয়ট বোঝেন সমাজের সংস্কৃতি, ব্যক্তির নয়। ব্যক্তিকে নিয়েই সমাজ গড়ে ওঠে ঠিকই, তবুও তিনি রবীন্দ্রনাথ বলতে বাঙলা দেশ বুঝতে গররাজী। কেন, সেটা আলোচনাযোগ্য।

অনেকে মনে কবেন, তাঁর প্রতিবেশী ব্যক্তিটি খুবই কালচার্ড। কারণ, তিনি কথাবার্তায় পারদর্শী। পোশাক-পরিচ্ছদে ভালো, অর্থাৎ রুচিবান। তদুপরি, গান-বাজনায় তাঁর মতি আছে। কিন্তু এলিয়ট তাঁকে কালচার্ড বলবেন না। তাঁর মতে, এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এই লোকটি হয়তো জ্ঞানী নন, এবং এমনও হওয়া সম্ভব যে তাঁর গান শোনার কান আছে, কিন্তু ছবি দেখার চোখ নেই। এর পর আপনি আব একজনের উদাহরণ আনলেন। সে-ভদ্রলোক দিনরাত বই নিয়ে পড়ে থাকেন। সর্ববিষয়ে সমান অভিজ্ঞতা তাঁর। এলিয়ট এঁকে বলবেন—পণ্ডিত। তখন আব একজনের কথা উঠতে পারে, ব্যাপক

২ Emerson, *Letters and Social Aims: Progress of Culture.*

৩ Jesse Lee Benett : *On Culture*

অর্থে যিনি দর্শন চর্চা করেন—অর্থাৎ কবি, সাহিত্যিক কিংবা ধার্মিক ব্যক্তি। কিন্তু দর্শন-চর্চাই যদি এঁর কাজ হয়, তবে এলিয়টের মতে এই ব্যক্তিকে বুদ্ধিজীবী আখ্যা দেওয়া চলতে পারে, কালচার্ড ব্যক্তি বলা চলবে না। এর পর যদি উদাহরণ হিসাবে একজন গায়ক বা চিত্রকরের কথা তোলা হয়, তিনি এলিয়টের কাছ থেকে শিল্পী আখ্যা পেতে পারেন, সংস্কৃতিবান মানুষ বলে বিবেচিত হবেন না।

এখন দেখা যাচ্ছে, ভদ্র আচরণ (good manners) যাঁদের, তাঁরা বিদ্যাহীন হলে আমরা তাঁদের সংস্কৃতিবান বলতে পারি না। উদ্ধৃত বিদ্বানকেও না। অথচ সুন্দর আচরণের মতো বিদ্যাও সংস্কৃতির একটি শর্ত। শিল্পী যিনি—তাঁর রচনায় যদি intellectual বা বুদ্ধিদীপ্ত উপাদান না থাকে, তবে তাঁকেও সংস্কৃতিবান বলতে অক্ষম আমরা। কারণ, আমাদের সংস্কৃতিতে শিল্প যেমন দরকারী উপাদান, তেমনি দরকারী বুদ্ধিও। চিত্রকলা বিষয়ে উদাসীন গায়কের কথা আগেই বলেছি। অর্থাৎ, তাহলে এলিয়টের মত[৪] অনুযায়ী: আমাদের এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে হচ্ছে যে, সংস্কৃতি সামাজিক প্রকৃতি। একক ভাবে মানুষ তার উপাদান হলেও, তাকে সম্পূর্ণ করতে অক্ষম। তা যেমন ব্যক্তির সামর্থ্যের বাইরে, তেমনি দলেরও। কোনো বিশেষ শ্রেণীরও সাধ্য নেই সংস্কৃতিকে পুরো করে।

সংস্কৃতির সঙ্গে সমাজের এবং ব্যক্তির এই সম্পর্ক পৃথক আলোচনার বিষয়।

Dictionary of World Literature এ সংস্কৃতির শব্দগত অর্থে বলা হয়েছে:

The training of human faculties to more perfect activity and achievement.

---

৪ Eliot: *Notes Towards the Definition of Culture.*

কার্লাইল[৫] বলেছেন :

'The great law of culture is, let each become all that he was created capable of being.'

অর্থাৎ, মানুষের মনুষ্যসত্তার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ বা তার জন্য সাধনাই culture। নিছক সাধনা কিন্তু culture নয়। যা ইতিমধ্যেই সাধনার ক্রিয়ায় এবং ফলাফলেও অর্জিত তাই কালচার। পাওঈস্ তাঁর *Meaning of Culture* বই-এ তাই বলেছেন। তাঁর মতে—

'Culture would not be culture if it were not an acquired taste.'[৬]

কিন্তু এই যুক্তিতে আমাদের আগেকার সংজ্ঞাটা বাতিল হয়ে যায় না। কারণ, তাতে যে বিষয়টির কথা বলা হয়েছে সেটি মানবসত্তা। মানবসত্তা বিচিত্র এবং বহুধা বিভক্ত একটি জটিল বিষয়। মোটা বুদ্ধিতে আমরা তার অন্তত দুটো ভাগ কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পাই। একটা জৈবিক দৃশ্য-ভাব। তার প্রত্যক্ষ প্রয়োজন এই ভাগের লক্ষণ। দ্বিতীয় ভাগ তার অন্দরে। মানসিক রাজ্যে। সেখানে প্রয়োজনের নাম—কামনা বা আকাঙ্ক্ষা। অর্থাৎ—আগেরটি তার যেমন না হলে চলে না, এখানেরটি তেমন নয়। সে পেতে চায়। পেলে সে তুষ্ট। কিন্তু কি ক'রে? এই পথটির মধ্যেই নিহিত সংস্কৃতি। সে চায় বলেই সে সংস্কৃতিবান। অন্তত ও-পথের পথিক। যদি তার পাওয়া পূর্ণ হয়—তখনও সে সংস্কৃতিবান থাকবে। এই পূর্ণতাকে বলতে পারি আমরা সামাজিক ধন। সকলের সম্পত্তি। সংস্কৃতিকে সমাজের করতে হলে, পেতে হবে। শুধু বাসনায় চলবে না। পাওঈস্ তাই বলছেন, অন্য কিছু নয়। কারণ, কথায় বাজীমাৎ সংস্কৃতি নয়। যারা শুধু মুখে সংস্কৃতি দেখায়

---

৫ Carlyle : *Essays*

৬ J. C. Powys : *The Meaning of Culture*, P. 196

তারা সংস্কৃতির উদ্যানে পরগাছা। তাদের কোনো মূল্য নেই। ইংরেজিতে তাদের বলা হয় Jackdaw culture'।

Jackdaw-র এক্ষেত্রে আমরা বাংলা করতে পারি—ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক। সংস্কৃতির আলোচনায় এরা মূল্যহীন। মূল্যবান—মানুষের সেই বাইরের অস্তিত্ব আর ভেতরের অস্তিত্বের একটু আলোচনা। বাইরের ক্ষুধা মেটে আমাদের সামাজিক সংগঠনে, রাষ্ট্রে, পুলিশে, রেশন-শপে, চাল-ডাল-নুন, কাপড়ের কল এবং আত্মরক্ষায়। কিন্তু ভেতরের ক্ষুধা অন্য বস্তু চায়। সাহিত্য রচনা করে কিংবা পড়ে, গান গেয়ে, ছবি এঁকে, সিনেমা দেখে, ধর্মালোচনা করে এবং তথাকথিত সাংস্কৃতিক সম্মেলন ইত্যাদি করে।

দুটো প্রকৃতির মধ্যে যেমন যোগ অনেক, পার্থক্যও তেমনি অনেক। শ্রীঅরবিন্দের কথা দিয়ে সেটাকে স্পষ্ট করি। অরবিন্দ এই দ্বৈত স্বরূপের সমগ্র যোগফলটাকে ভাগ করেছেন তিন ভাগে। 'একটি দিক হলো—মানুষের চিন্তা, আদর্শ ও ঊর্ধ্বমার্গের ইচ্ছাশক্তি ও আত্মার কামনা। আর একটি দিক হলো—সৃষ্টিশীল বিকাশধর্মী সূক্ষ্মানুভূতিসম্পন্ন বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তি। এবং তৃতীয় দিকটি হলো—বাস্তব রূপায়ণের দিক।' দর্শন আমাদের চিন্তাকে সুসংহত ও পরিব্যাপ্ত করে, আর জীবন ও তার অস্তিত্বের সম্যক উপলব্ধিতে সাহায্য করে। ধর্ম, ঊর্ধ্বমার্গের ইচ্ছাশক্তি ও চরম আদর্শ এবং তার উপলব্ধিব ব্যাপারে সহায়ক হয়। শিল্পকলা-কাব্য-সাহিত্য—অনুভূতি, বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তির সৃষ্টিশীল বিকাশের সহায়ক। রাজনীতি আমাদের বস্তু-জগতের পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে মাত্র।

অর্থাৎ, শ্রীঅরবিন্দের মতে, জীবন ত্রিধারায় প্রবহমান হলেও, আসলে সে এক চরম লক্ষ্যের পথিক। তার নাম—পরিপূর্ণ জীবন।

সংস্কৃতি এই পরিপূর্ণ জীবনের দ্যোতক। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেন: সংস্কৃতি হীরকের দ্যুতি। মানুষের দেহের খাদ্য, আলো-হাওয়া যেমন রক্তে, জীবনরসে পরিণত, মানুষের সংস্কৃতিও তাই। সংস্কৃতি সকলেরই আছে। সকলেরই থাকে। যেমন মানুষের দেহে থাকে রক্ত, কম অথবা বেশী, শুদ্ধ কিংবা অশুদ্ধ, রুগ্ণ কিংবা সবল।

বাংলা ভাষায় 'সংস্কৃতি' কথাটি নতুন আমদানী। বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকের আগে অবধি 'কৃষ্টি' বলে অপর একটি শব্দ প্রচলিত ছিল 'সংস্কৃতি'র স্থলে, কিন্তু সে শব্দটি ঠিক ঠিক মনে না ধরায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'সংস্কৃতি'কে সেই 'কৃষ্টি'র স্থলাভিষিক্ত করে দেন। কবিগুরু নিজে এই শব্দটি পছন্দ করেছিলেন এবং এর ব্যবহার শুরু করেছিলেন বলেই হয়তো 'সংস্কৃতি' কথাটির আজ এত বেশী জনপ্রিয়তা। কিন্তু তাহলেও একালে যেরূপ যদৃচ্ছভাবে 'সংস্কৃতি' শব্দটির ব্যবহার চলেছে, তাঁর সময়ে এমনি অবস্থা দেখা দিলে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই কখনো তা বরদাস্ত করতেন না।

একটি বিষয় আমাদের মনে রাখা দরকার, তা হলো এই যে, ইংরেজী Culture শব্দটির ভাব-দ্যোতক বলে ধরে নিলেও 'সংস্কৃতি' কথাটির অর্থ আরো গভীর এবং আরো ব্যাপক। যতই সংস্কৃত-ঘেঁষা হোক না কেন, 'সংস্কৃতি' আসলে কোনো বৈদোক্ত শব্দ নয়, ঋগ্বেদের কোথাও এর উল্লেখ নেই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থে এই শব্দটির সন্ধান পাওয়া যায়। 'সংস্কৃতি' শব্দটি রবীন্দ্রনাথ হয়তো সেখান থেকেই গ্রহণ করেছেন এবং গভীর ও ব্যাপক অর্থেই তিনি তার ব্যবহার আরম্ভ করেছিলেন।

মানুষের জীবনাচরণের নানা ক্ষেত্রে মানব-সংস্কৃতির পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়ে চলেছে। সেই পরিচয়ের মধ্যেই সত্য, শিব ও সুন্দর নিত্য-প্রকাশমান। তাই মানুষের জগতে যা-কিছু সত্য, যা-কিছু শিব

ও সুন্দর তার সব-কিছুরই প্রকাশ-মাধ্যম সংস্কৃতি। আর সেজন্যই মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সংস্কৃতির প্রভাব অসামান্য এবং সে কারণেই সংস্কৃতি একটি চিরন্তন বিষয় এবং তা চিরকাল সমন্বয়মুখী।

সংস্কৃতি প্রসঙ্গ আলোচনায় সংস্কৃতির এই সমন্বয়মুখিতার দিকটি ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন ভারত-সংস্কৃতির দৃষ্টান্ত তুলে ধরে। তিনি লিখেছেন, 'সংস্কৃতি জীবনের সঙ্গে জড়িত—সেইজন্য এর চরম রূপ কোনও এক সময়ে চিরকালের জন্য বলে দেওয়া যেতে পারে না। জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা আর সংস্কৃতিও গতিশীল ব্যাপার। ভারতের [সভ্যতা এবং] সংস্কৃতি যুগে যুগে নোতুন নোতুন ভাবপরম্পরা আত্মসাৎ করবার চেষ্টা ক'রেছে, সমর্থও হ'য়েছে। প্রাচীন ভারতীয় [সভ্যতা আর] সংস্কৃতি তার বিশিষ্ট রূপ পাবার পরে, এদেশে ইসলামী সংস্কৃতির আবির্ভাব হ'ল। এই সংস্কৃতির মধ্যে যা সনাতন আর বিশ্বমানবের গ্রহণযোগ্য, সেটা হচ্ছে এর অন্তর্গত সূফী দৃষ্টিকোণ, সূফী আধ্যাত্মিক অনুভূতি। এই জিনিসকে মধ্যযুগের ভারত সাদরে বরণ ক'রে নিলে, এর মধ্যে সে অচেনাকে খুঁজে পেলে। কবীর, নানক, দাদূ প্রভৃতি সন্তগণের আবির্ভাব হ'ল, ভারতের সূফী সাধকেরা এলেন ; কাশ্মীরের জৈনুল-আবেদীনের মতন উদার-হৃদয় রাজার, সম্রাট আকবরের মতন 'সুল্‌হ্‌-ই-কুল্ল' অর্থাৎ বিশ্বমৈত্রীর প্রচারকের, রাজকুমার দারা শিকোহের মতন হিন্দু আর মুসলমান চিন্তার ও সাধনার দুই মহাসাগরের মিলনাকাঙ্ক্ষী স্বপ্নদ্রষ্টার প্রকাশ ঘটল। ইসলামী সংস্কৃতি আর ভারতীয় সংস্কৃতি, এই দুইয়ের পরস্পরের সঙ্গে সংস্পর্শ কেবল বিরোধের সংঘাত নয়। উগ্র পরমত-অসহিষ্ণুতার কাছে নম্র পরমত-সহিষ্ণুতাকে আপাতদৃষ্টিতে লাঘব স্বীকার ক'রতে হ'য়েছিল সন্দেহ নেই ; কিন্তু ঝড়ের পরে মৃদু সমীরণের মত সূফী মতবাদের আর ভারতীয় ভক্তিবাদের সমীকরণ-ই

হ'চ্ছে ভারতে ইসলামী আর হিন্দু সংস্কৃতির সংযোগ বা সংস্পর্শের মূল কথা। নবীন যুগের এই মিশ্র ভারতীয় সংস্কৃতি—যা বিশুদ্ধ হিন্দুও নয়, বিশুদ্ধ আরবজাত ইসলামও নয়, যা হ'চ্ছে সত্যকার হিন্দু-ইস্‌লামীয় সংস্কৃতি—এই মিশ্র ভারতীয় সংস্কৃতিতে এখন আবার আধুনিক ইউরোপের সংস্কৃতির স্থূল সূক্ষ্ম নানা ভাবধারা এসে মিশেছে —নানা ধরনের খ্রীষ্টান মত ও সাধনা, নানা নোতুন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী আর সাহিত্যিক প্রকাশ, নানা নব-নব শিল্প-সৃষ্টি, Socialism বা সম্পত্তি-সাম্য প্রভৃতি নানা সমাজ-সংস্কারের পরিকল্পনা আর প্রযোজনা। আমাদের আদর্শ হওয়া চাই এক মৌলিক বিশ্বসংস্কৃতি, বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক আবেষ্টনী অনুসারে, বিভিন্ন জাতির ঐতিহ্য ভাষা প্রভৃতির বৈচিত্র্যকে আশ্রয় ক'রে বহুরূপ হ'য়ে যা বিরাজ ক'রবে, আর পৃথিবীর তাবৎ মানবজাতি বা মানব-সমাজকে তাদের সহজ সাধারণ মানবিকতার প্রতিষ্ঠায় সম্মিলিত ক'রে এক ক'রে তুলবে।'[৭]

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কৃতির প্রভাব এবং তার সমন্বয়মুখিতার ধর্মই পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে পৃথক পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে।

৭ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত 'সাংস্কৃতিকী' হতে উদ্ধৃত

সভ্যতার গতিপথে

সংস্কৃতির উচ্চ-নীচ আছে। তবে আমরা তাকে উচ্চ-নীচ না বলে, বলবো—বিচিত্র। সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য আছে। যেমন থাকে ফুলে। সব ফুলই গাছের সংস্কৃতি, কিন্তু সব ফুল একরকম নয়। ফুলে ফুলে নানা বর্ণ, নানা গন্ধ। নানা রকমের স্বাদ। ঐক্যও আছে। কিন্তু সে-কথা পরে। তার আগে উচ্চ-নীচের একটু বিচার আবশ্যক।

সংস্কৃতির সঙ্গে উচ্চ-নীচের ধারণা আমাদের মনে আসে তখনই, যখন আমরা সংস্কৃতির সঙ্গে সভ্যতাকে গুলিয়ে ফেলি। এরা সম্পর্ক-বিহীন এমন নয়, কিন্তু স্পষ্টতই এরা ভিন্ন জিনিস। 'রিফাইন্‌মেণ্ট' বা ভদ্রতা কিংবা শিষ্টাচার যেমন সংস্কৃতি নয়, তেমনি সভ্যতাও সংস্কৃতি নয়। কেন নয়, তাই এবার বলছি।

আমরা জানি, সাহিত্য বা কবিতা সংস্কৃতির একটি উপাদান। কারণ, তাতে আমাদের অন্তরস্থ বাসনা তার পূর্ণতা পায়। মুক্তিলাভ করে। কেউ টাইপ-রাইটার নিয়ে বসে বসে কবিতা লিখলেন। টাইপ-রাইটার বা কলম না হলে তাঁর কবিতা হয়তো হতো, কিন্তু মুক্তি পেত না—পেত না প্রকাশের পথ। তাই বলে কলম কিংবা টাইপ-রাইটার কি সংস্কৃতি? কিংবা তার উপাদান? মোটেই না। টাইপ-রাইটার বা কলম আসলে সভ্যতা-বিকাশের পথে একটি সিঁড়ি। সভ্যতার একটা দান। একটা লক্ষণ। যাঁরা টাইপ-রাইটার তৈরি করেন, তাঁরা কবি নন। কর্মী। সভ্যতার লক্ষণ—এবম্বিধ বাস্তব-প্রকাশ্য কর্মলক্ষণ। সভ্যতা বলতে আমরা

বুঝি—মানুষ তার প্রয়োজনে—যে-সব কৌশল এবং প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে তার সমগ্র যোগফল। রাষ্ট্র, শাসনতন্ত্র থেকে শুরু করে, কাপড়ের কল, ব্যালট-বাক্স, টেলিফোন, রেলপথ, স্কুল, ব্যাঙ্ক—এ-সবই এর অঙ্গীভূত। কিন্তু সংস্কৃতিতে এদের প্রত্যক্ষ দায় অতি অল্প। যদি কিছু থাকে, তবে তা পরোক্ষ। সংস্কৃতির কারবার সভ্যতার এই দানের যোগ্য মূল্যায়নের ওপর। টাইপ-রাইটারের ব্যবহারিক গুণের চেয়ে তার রং বা গঠন সেখানে বেশী বিচার্য। সংস্কৃতি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির, তার চিত্তের অ্যাডভেঞ্চার। সভ্যতা নিছক অ্যাডভেঞ্চার নয়, হিসাবী পদক্ষেপ।

এ ছাড়াও এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথম পার্থক্য ঃ সভ্যতার পরিমাপ হয়, কিন্তু সংস্কৃতির কোনো গজকাঠি নেই। সভ্যতার ব্যবহার প্রত্যক্ষ। সুতরাং তার ক্ষেত্রে অবশ্যই যোগ্যতা-অযোগ্যতার প্রশ্ন আসে। কোন্ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা অধিকতর উৎকৃষ্ট তা যেমন তার আচরণ দিয়ে আমরা বিচার করতে পারি, তেমনি পারি বৈজ্ঞানিক এবং পৌরাণিক প্রথায় ধানচাষের পদ্ধতিরও। শেষেরটিকে আমরা নিকৃষ্ট বলে বাতিল করে দিতে পারি। কারণ, এতে ফসল কম ফলে। গাদা-বন্দুকের চেয়ে মেশিন-গান যে যন্ত্র হিসাবে নিঃসন্দেহে ভালো, এটাও আমরা বলতে পারি। কিন্তু তখনই বলবো যখন আমাদের বক্তব্য সভ্যতা নিয়ে। এটা আদৌ ভালো কি-না, আদৌ আমাদের মেশিন-গানের প্রয়োজন আছে কি-না, সে প্রশ্ন আলাদা। সেখানে valuation-এর কথা আসবে। আমাদের সংস্কৃতি অনুযায়ী আমরা তখন রায় দেবো। সুতরাং অনেক নতুন জিনিস বের করাটা সভ্যতার পরিচায়ক হলেও, সংস্কৃতির নয়। সংস্কৃতির নতুন-পুরোনো নেই, সংস্কৃতি চিরকাল কষ্টিপাথর। তার হাতে সভ্যতার বিচার হয়।

সংস্কৃতি আর সভ্যতার এখানেই দ্বিতীয় পার্থক্য। সভ্যতা পরিবর্তনশীল। কিন্তু সংস্কৃতি তা নয়। সংস্কৃতির যাত্রাপথে কোনো মাইল-পোস্ট নেই। কিন্তু সভ্যতার তা আছে। বলতে গেলে সভ্যতা সব সময়েই চলছে। আজকের আবিষ্কার আগামীকাল বদল হয়। তার শক্তিকে ভর করে নতুন কৌশল জন্ম নেয়। এককালে যাতায়াতের পথে মানুষের সম্বল ছিল দু'খানা মাত্র পা। আজ মহাশূন্যেও সে বিচরণে সক্ষম। সভ্যতা তাকে উপাদান দিয়েছে হাতে তুলে। এ-উপাদানটা অবশ্যই কালকেরটির চেয়ে উন্নততর। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে কি আমরা বলতে পারি সে-কথা? কিংবা চিত্রকলার ক্ষেত্রে? শেক্সপীয়র পুরোনো পৃথিবীর মানুষ আর আমরা একালের—এ-যুক্তিতে কি আমরা বাতিল করে দিতে পারি তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব? মহাভারত পুরোনো কাব্য—তাই বলে কি পুরোনো লাঙলের মতো, কিংবা তালপাতার-কাগজ ব্যবহারের মতো বাতিল করতে পারি আমরা তাকে? পারি না। কারণ, সংস্কৃতি কালজয়ী।

আরও পার্থক্য আছে। সভ্যতা নিজের বেগে নিজে চলে। কিন্তু সংস্কৃতি সে-ভাবে চলে না। তাকে টেনে নিতে হয়। তার কারণ, দুটি দুই চরিত্রের জিনিস। একটি ব্যবহারিক, অন্যটি আন্তরিক। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মানুষের রুচি অনেক ভোঁতা, ভেতরের ঘরে তেমনি সূক্ষ্ম। তাছাড়া, সভ্যতার দান সবাই নিতে পারে। সংস্কৃতিকে সকলে পাবে না। রেলে অশিক্ষিত মানুষও চড়তে পারে। কিন্তু বিশেষ আকর্ষণ না থাকলে কেউ চিত্র-প্রদর্শনীতে পা বাড়ায় না।

সভ্যতা সর্বত্রগামী। কিন্তু সংস্কৃতি নয়। রাশিয়ায় তৈরী এরোপ্লেন ভারতেও গৃহীত হতে পারে। কিন্তু নবদ্বীপের খোল-করতাল টেক্সাসে চালাতে গেলে বিপত্তি ঘটতে পারে। একমাত্র যোগ্য ভিত্তিভূমিতে ভিন্ন জলবায়ুর সংস্কৃতি শিকড় গাড়তে পারে। এবং

তাও অনেক গ্রহণ-বর্জনের মধ্যে। কিন্তু সভ্যতার বেলায় তা নয়। যদি যোগাযোগের পথ থাকে, তবে সভ্যতা হু-হু করে চলে আসে। তাকে ভাবতে হয় কম। তাকে নেওয়া যায় অতি সহজে। তবে অবশ্য কখনও কখনও বাধাও আসে। সে-বাধা অবশ্য ঐ দেশের সভ্যতা উপস্থিত করে না। তা আসে সংস্কৃতির তরফ থেকে। দেশে দেশে সভ্যতা এবং সংস্কৃতির যে প্রতিবেশী পরিচয় থাকে, বিদেশে অনেক সময় তা থাকে না। যখন তেমন অনুকূল সংস্কৃতি থাকে না, তখনই বাইরের সভ্যতাকে সে প্রতিরোধ করে। যেমন ভারতের সংস্কৃতি এক কালে রেলগাড়িকে বাধা দিতে চেয়েছিল। কিংবা যেমন বর্তমানে জন্মনিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাকে প্রতিরোধ করতে চাইছে। Parliamentary Democracy-কে নিতে হলেও তার যোগ্য সাংস্কৃতিক ভিত্তি চাই।

সংস্কৃতি সভ্যতাকে কখনও কখনও এড়িয়ে চলে। বিশেষ করে সেই সভ্যতা যখন থাকে তার চিন্তার বাইরে, কিংবা তার সাংস্কৃতিক মূল্যমানের ওজন-দণ্ডের নীচের দিকে। এমন ব্যাপার প্রতিদিন ঘটে না। কদাচিৎ ঘটে। সভ্যতা-সংস্কৃতির বিরোধ বা সভ্যতার চলার পথে বিপত্তি দৈবাৎ ঘটনা। কিন্তু সংস্কৃতিতে সংস্কৃতিতে সংঘর্ষ প্রায় নিত্য ব্যাপার। এই সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই চলে সংস্কৃতির গ্রহণ-বর্জন, রূপান্তর। বাইরে থেকে যা আসে তাকে যেমন আমরা সব সময় নেই না, তেমনই হুবহুও নেই না।

তা ছাড়া, সংস্কৃতি নিত্য-বস্তু বলেই সভ্যতার সঙ্গে এর আর এক জায়গায় পার্থক্য দেখা যায়। তা হচ্ছে এই—সংস্কৃতি আমরা প্রাচীন গ্রীস থেকেও নিতে পারি, কিন্তু সভ্যতার বেলায় শেষ মতটিই চলে, পুরোনো জিনিস অচল। দশম শতকের চৈনিক চিত্রকলা আমাদের ভালো লাগতে পারে, কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের

রোমান-চিকিৎসাশাস্ত্রকে আমরা বৈজ্ঞানিক সত্য বলে অধীতব্য বিষয় হিসাবে মেডিকেল কলেজে গ্রহণ করতে পারি না।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সংস্কৃতি ও সভ্যতা চরিত্রে দু'জিনিস। সভ্যতা সর্বব্যাপী, স্বচ্ছন্দগতি, দ্রুত এবং তার যাত্রাপথ সহজতর। কিন্তু সংস্কৃতি পথে পথে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়ায়, তার পথ বাঁকা পথ। পরস্পরকে না জেনেও, এক দেশ আর এক দেশের সঙ্গে ব্যবসায় করতে পারে। কিন্তু গান্ধার-শিল্পের জন্ম সাক্ষাতের ফল নয়, মিলনের ফসল।

সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ

সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে যেমন পার্থক্য আছে, উভয় প্রক্রিয়ায় মিলও আছে তেমনি। বাইরের নির্ভরশীলতা তো বটেই, ভেতরে ভেতরে পদ্ধতিগত মিল।

সভ্যতার যান্ত্রিক দিকটা বা করণ-কৌশলের কথাই প্রথমে ধরা যাক। যেমন একটা মোটরগাড়ি এবং একটা চিত্র। মোটরগাড়িটা স্থূল ব্যবহারিক জিনিস। কিন্তু এর একটা সাংস্কৃতিক দিক আছে। তার বর্ণ, আকৃতি ইত্যাদির মাধ্যমে তা প্রকাশিত। আবার, ছবিটারও একটা যান্ত্রিক দিক আছে। তুলি, কলে তৈরি রং এবং শিক্ষা-প্রক্রিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে তা আচরিত। মানুষ এই করণ-কৌশলকে বাদ দিলে ছবিটি পাবে না। আবার, শুধু মোটরটা হলেও মানুষের মন জুড়োবে না। এই যে স্থূলত্বের মধ্যেও চারুত্বের অনুসন্ধান—এটা মানুষের প্রকৃতি। সব মানুষের নয়, সংস্কৃতিবানের। বুড়ো লাঠি নিয়ে চলেছে। লাঠি তার অবলম্বন। কিন্তু এর চেহারাটা সাপের মতো। অদ্ভুত এবং সুন্দর। ঘাড়টা বাঁকানো। তাতে যেমন ধরতে সুবিধা, তেমনি সেটা দেখতেও ভালো। ইণ্ডাস্ট্রি বা শিল্পে এইজন্যই আজ চাতুর্যের সঙ্গে চারুনৈপুণ্যের এমন বাহার।

এবার এদের পরস্পরনির্ভরতা কতখানি তা দেখা যাক। প্রথমেই দেখতে পাই—সভ্যতা একদিক থেকে সংস্কৃতির বাহন। ছাপাখানা তার মস্ত প্রমাণ। বই যখন হাতে লেখা হতো, তখন তার সীমানা ছিল ছোট। সংস্কৃতি তখন ছিল গোটাকয়েক আশ্রমে, গুহায় কিংবা মঠে। আজ তা সর্বত্র। আজকের সংস্কৃতি মহাসাগর।

দ্বিতীয়ত, আমাদের মনে রাখতে হবে, সভ্যতা আমাদের শ্রমকে বিস্তর বাঁচিয়েছে। এমন একটা কাল ছিল এই পৃথিবীতে যখন মানুষের অবসর ছিল অত্যন্ত কম। কোনোমতে প্রাত্যহিক ক্ষুন্নিবৃত্তি করার সাধনাতেই চলে যেত তার আস্ত আস্ত দিন। দিন, বছর, পরমায়ু। ক্রমে প্রকৃতিকে অধীন করে সভ্যতা যত এগুলো, আমাদের অবসর গেল তত বেড়ে। শুধু অবসর অবশ্য সংস্কৃতি নয়। অন্যের শ্রমকে ভোগ করে যাঁরা অবসরের জীবন কাটিয়েছেন বা কাটান— তাঁরা বাড়ীতে গুটিকয় ওস্তাদ পুষলেও আমরা তাঁদের সংস্কৃতিবান আখ্যা দিতে নারাজ। কারণ, মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্ব ন্যায় ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে। আজকের আমেরিকায় বা রাশিয়ায় মানুষের চেষ্টা অবসরকে দীর্ঘতর করায়। তাতে আমরা নির্দ্বিধা সম্মতি দেব। কারণ, এই স্বাধীন অবসর সংস্কৃতির চর্চায় অত্যাবশ্যক। একমাত্র সভ্যতাই তা আমাদের দিয়ে থাকে এবং দিতে পারে।

এখানে আর একটা কথা আমরা আলোচনা করতে পারি। জর্জ সান্তায়ানা বলেছিলেন—

'If profound and noble, cultuie must remain raie, if common, it must become mean.'

অর্থাৎ, সংস্কৃতিতে সর্বজনের ছোঁয়া লাগলে তার কৌলীন্য থাকবে না। সংস্কৃতিকে সামাজিক চরিত্র বললেও, এলিয়ট একদিক থেকে এই মতটাকে সমর্থন করেছেন। এটা অবশ্য তিনি স্বীকার করেছেন যে, সংস্কৃতির চর্চার কোনো বিশেষ শ্রেণী বা দল থাকে না। কিন্তু প্রত্যেক ধর্মের মতো এতেও একদল লোক থাকেন, যাঁরা শুধু একে নিয়েই পড়ে থাকেন। তাঁরা পুরোহিত বা যাজক শ্রেণীর। সমাজের হয়ে সমাজের নামে তাঁরা নিত্য ভজনা করেন। সমাজ শুধু রোববারে চার্চে যায়, কিংবা শনিবারে কালীবাড়ী। তার বেশী কী দরকার? সংস্কৃতির জগতেও শিল্পী বা কবি কী করছে সমাজের

মানুষ তাই জানলেই যথেষ্ট। তাদের সকলকে কবি হতে হবে না।

অর্থাৎ, এলিয়ট-ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরোক্ষে শ্রেণীভেদকে মেনে নিচ্ছেন। কিন্তু আমরা তাঁর সমগ্র বক্তব্যকে স্বীকার করে নিয়েই এই শ্রেণীভেদকে অস্বীকার করবো। সভ্যতা সেই দুঃসাহস আজ দিয়েছে আমাদের। আজ সমাজ এমন অবস্থায় এসেছে যে, তার লক্ষ্য এখন সাম্য। পূর্বেকার অধিকারভেদী সমাজ আজ আদর্শ হিসাবে অপস্রিয়মাণ।

এখন ভোগ বলতে সকলের, অবসর সকলের, সংস্কৃতিও সকলের। শুধু বুদ্ধিজীবীদের নয়, শুধু কবিদেরও নয়। উৎপাদন এবং বণ্টন ব্যবস্থার কল্যাণে এই সর্বব্যাপ্ত আশীর্বাদকে যখন আমরা লাভ করতে পেরেছি, তখন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদকে আর প্রশ্রয় দিই কি করে। কি করে আজ বলবো গাছের উঁচুপাতার দায়িত্ব নীচুতলার আহার-সংস্থান। আজ আমরা বরং বলবো—সূর্য উঠেছে, সবাই আসুক, এখানে অবগাহন করুক। আলোকে তাদের সকলের দেহ উদ্ভাসিত হোক। সূর্য-মহিমার সেখানেই তো যথার্থ সার্থকতা।

এ-কথা যদি আমরা নির্দ্বিধায় ঘোষণা করতে পারি, তবেই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সভ্যতার এই 'অবসর' নামক দানটিকে সহজে স্বীকার করে নিতে পারি আমরা। অন্যথায় নয়।

তৃতীয়ত, সভ্যতা আবার একদিক থেকে সংস্কৃতির পরিবেশও। আমাদের ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়, জ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতসারে আমরা যান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাবের কাছে আমাদের সংস্কৃতিকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হই। আমাদের সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করি। আজকের যান্ত্রিক জীবন যেমন শান্তি সম্পর্কে নতুন ধ্যান-ধারণার জন্ম দিয়েছে, নতুন

কাব্য, নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করেছে—তেমনি নতুন দৃষ্টিভঙ্গিও দান করেছে আমাদের।

মহাকাব্য আজ যে আমরা আর লিখি না, এটা তার একটা প্রধান কারণ। যাত্রার চেয়ে সিনেমাকে এ কারণেই আমরা অধিকতর ভালবাসি।

অন্যদিকে উভয়ের মধ্যে উল্‌টো প্রক্রিয়াও বর্তমান। সংস্কৃতির পরিবেশ যেমন সভ্যতা, তেমনি সভ্যতার পরিবেশও সংস্কৃতি। সংস্কৃতির মানদণ্ডে আমরা সভ্যতার বিভিন্ন দানকে যাচাই করি, তাদের বিচার করি। এ ব্যাপারে সব দেশের, সব যুগের সংস্কৃতির একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি আছে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে যে সহনশীলতার মেজাজ আছে, অন্য সংস্কৃতিতে হয়তো তা সে পরিমাণে নেই। আবার, অন্য সংস্কৃতিতে যান্ত্রিক প্রগতির দিকে যেমন নেশা আছে, আমাদের সনাতন সংস্কৃতিতে হয়তো ঠিক ততখানি নেই। এক দেশের সংস্কৃতি হয়তো, যুদ্ধকে অপরিহার্য বলে মেনে নিয়েছে, অন্য দেশ তা নেয়নি। নেয়নি বলেই ধনতান্ত্রিক সভ্যতায় তার আস্থা কম। বোমাকে সে বিজ্ঞানের কৃতিত্ব বলে না, বলে বর্বরের জয়। এগুলো দৃষ্টিভঙ্গির কথা। সংস্কৃতির কথা। এই বিচারে সভ্যতার এগোনো-পিছোনো অনেকখানি নির্ভর করে।

তাছাড়া, এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই কখনও কখনও সভ্যতা থেমে দাঁড়ায়। আমাদের দেশের শাসনতন্ত্রের কথাই ধরা যাক। যদি এই শাসনতন্ত্র আমাদের সংস্কৃতির পরিপন্থী হয়, তবে এ-কে আমরা নিজের বলে মেনে নিতে পারব না। এতকাল যখন এটা ছিল না, তখন আমাদের সংস্কৃতি এ-কে বা নতুন কিছুকে কামনা করেছিল। সংস্কৃতির সেই কামনা স্বাধীনতা-আন্দোলনে প্রকাশ পেয়েছে। কবিতায়, গানে, ছবি এমনকি নাটকে। সংস্কৃতি এদিক থেকে সভ্যতার প্রেরণা। সভ্যতার চাকা।

কি করে সভ্যতাকে আমরা ব্যবহার করবো, তা আমাদের সংস্কৃতি নির্ধারণ করে। বাষ্পশক্তিতে স্নো-পাউডারের কারখানাও হতে পারে, ইস্পাতেরও হতে পারে—কোন্‌টা আমাদের সিদ্ধান্ত হবে তা একমাত্র আমাদের প্রয়োজনের বিচারে নির্ণীত হবে না—হবে রুচির বিচারেও। অর্থাৎ, সংস্কৃতিব বিচারে।

আসল কথা, সভ্যতার উপকরণ বা ফসলগুলো একটা জাহাজ। তাকে নিয়ে অনেক বন্দরেই পাড়ি জমাতে পারি আমরা। কোন্‌ বন্দরে যাব—সেটি আমাদের সংস্কৃতির পছন্দ। জাহাজটা না থাকলে আমরা আদৌ যেতে পারি না। জাহাজটা যদি ভালো হয়, তবে বেগে চলতে পারি; পুরোনো হলে, আমাদেব গতি হবে ধীর মন্থব। আমাদের জাহাজের জীবন হবে তাব বিধি-ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। ব্যবস্থা যদি ভালো হয়, আমাদের যাত্রা ভালো হবে। যদি খারাপ হয়, তবে আমাদের হবে কষ্ট। এই যা।

কিন্তু আমরা কোথায় চলেছি এর সঙ্গে জাহাজেব কোনো পূর্ব-সম্পর্ক নেই। জাহাজের চেহারার ওপর সেটা নির্ভবশীল নয়। যদি শক্তিমন্ত জাহাজ হয়—তবে ঘাটে-ঘাটে আমরা নিঃশঙ্কচিত্তেই থামব। ঘড়া ভরে নেবো। জীবনকে ভরবো। আবার এগিয়ে চলবো।

অনন্ত মনুষ্য-সমুদ্রে, সীমাহীন কালে এই জীবনের কলসীকে কানায় কানায় ভরে তোলাই সংস্কৃতি। এই সমগ্র যাত্রাটাই সাংস্কৃতিক-জীবন।

সভ্যতার উপকরণ প্রসঙ্গে

আকৃতিহীন, প্রকৃতিহীন 'জেলি' থেকে কি করে সৃষ্টি হলো সর্বজয়ী মানুষ, কেমন করে এই মানুষ গড়ে তুললো সভ্যতা ও সংস্কৃতি— সেই রোমাঞ্চকর ইতিহাস আমাদের আলোচ্য না হলেও, এ আলোচনায় তার উল্লেখ করা চলে।

সভ্যতা যে একদিনে গড়ে ওঠেনি তা আমরা জানি, কিন্তু সভ্যতা যে একজনের হাতে গড়া নয়, তা আমরা মাঝে-মাঝে ভুলে যাই। কখনো-কখনো জাতীয়তার বড়াই আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে। সভ্যতা যেন কোনো-একটি বিশেষ জাতির বাগানে বিকশিত ফুল— এ ধারণা সম্পূর্ণ বিরল নয়। কিন্তু এ ধারণা ইতিহাসের সাক্ষ্যের পরিপন্থী।

যে-সব উপকরণের সাহায্যে সভ্যতা বর্তমান রূপ পেয়েছে, সেই-সব উপকরণ দেশ-দেশান্তরের মানুষের দেওয়া ধন। ইতিহাস আমাদের এই কথাই শেখায়। শুধু কৃষি বা আধুনিক সভ্যতার ভিত্তিপ্রস্তরটুকুই নয়, মিশরের পিরামিডের ধ্যান এবং ধারণা থেকেই বিরাটাকার স্মৃতি ও স্থিতির প্রাসাদ গড়তে শিখেছে ইয়োরোপ। মিশরীয়রা ছিল সূর্যপূজারী। তাদের ম্যমি, বোনা কাপড়, পিরামিড ও সূর্যপূজা মিলিয়ে পণ্ডিতেরা তখনকার সংস্কৃতির নাম দিয়েছেন Heliolithic[১]। হেলিওলিথিক মানে সূর্য আর পাথরের যৌথ সংস্কৃতি।

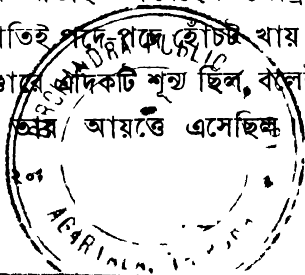
ফিনিশীয় বণিকদের জাহাজে চড়ে সেই সংস্কৃতি অতঃপর পাড়ি

---

১ *What Happened in History*—Gordon Childe

জমালো পূবে ও পশ্চিমে। পৃথিবীর অধিকাংশ অংশে, বিশেষত ইয়োরোপে, তখনো চলেছে উদ্ভিদ ও নানা ধরনের জন্মদায়ী দেবদেবীকে ঘিরে কৌম আচার। অধিকতর শক্তিশালী সূর্য এসে এবার তাদের পুরোনো বিশ্বাসকে পুড়িয়ে ছাই করে দিলে। তার কয়েক শতক পরে সহসা এল মধ্য-এশিয়া থেকে আরো অন্ধকার যুগের মানুষ। ইতিহাসে এরা বর্বর নামে পবিচিত। সে অভীধা আজ অচল। তদানীন্তন পৃথিবীর সবশেষ জ্ঞান ও ধারণা-বর্জিত একটি সম্প্রদায় বলেই ওদের অভিহিত করা চলে। এদের প্রবল প্রবাহে পূর্ব-ইয়োরোপ ভেসে গেল। সেই আদিম স্রোত ক্রমে ছড়িয়ে গেল দক্ষিণ ও পশ্চিম ইয়োরোপেব দিকেও। মিশরের শিক্ষায় যে প্রস্তরযুগ এখানে গড়ে উঠেছিল, এবার তার জায়গায় এসে পৌছল ব্রোঞ্জের শিখা।

ফিনিশীয়রা যখন গ্রীসে প্রথম আবির্ভূত হলো, তখন গ্রীস ছিল সভ্যতায় অনেক পশ্চাৎপদ একটা দ্বীপপুঞ্জ মাত্র। ছোট ছোট গাঁয়ে আদিম মানুষের বাস। তারা না জানে লিখতে, না জানে পড়তে। ধাতুর ব্যবহারও অজ্ঞাত তাদের কাছে। কিন্তু গ্রীসের চরিত্রে ছিল শিশু-স্বভাব। জানবার এবং বোঝবাব আগ্রহ ছিল তার প্রবল। অনেকটা আমাদের দেশের মতো। ফলে, কয়েকশ' বছরের মধ্যেই তাবা এমন একটা সভ্যতাব জন্ম দিতে সক্ষম হলো—যা শুধু ইয়োরোপ নয়, অধিকাংশ পৃথিবীর কাছেই গৃহীত হলো, আদর্শ বলে। যে-সব কারণে গ্রীসের পক্ষে এ অঘটন সম্ভব হলো তার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য—এদের ঐতিহ্যহীনতা এবং যুক্তিপ্রবণতা। রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের চলাব পথে ঐতিহ্যকে অভিহিত করেছেন 'লোষ্ট্র' বলে। নতুনের দিকে চলাব পথে বহু জাতিই পদে-পদে হোঁচট খায়। কিন্তু গ্রীস তা খায়নি। গ্রীসের ভাণ্ডারে এদিকটি শূন্য ছিল, বলেই যুক্তির পদ্ধতিটিও অপেক্ষাকৃত সহজে তার আয়ত্তে এসেছিল। কারণ,



পেছনে যত বাঁধন, মনে যত বেশী বদ্ধধারণার শিকড়—তত বেশী অন্ধ হয় মানুষ।

এ দুটি জিনিস যে মানুষের সভ্যতায় কত গুরুতর, তা এই বিস্ময়কর জাতির ইতিহাস থেকেই অনুমান করা যায়। গ্রীসদেশে ফিনিশীয় বাণিজ্যতরীতে পূর্বদিগন্তের হাওয়া লাগার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আর আর কৌম সমাজের মতো তাদেরও সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় প্রধান ছিলেন যত পুরোহিতরা। পুরোহিতদের দলপতিই ছিলেন তাদের রাজা ও শাসক। যাবতীয় জ্ঞানের আধার বলে স্বীকৃত হতেন তিনি। স্বভাবতই এ-সব রাজা ছিলেন যে-কোনো-রকমের নতুন জ্ঞানের বিরুদ্ধে। কিন্তু এ অবস্থাটা পাকাপোক্তভাবে কায়েম হওয়ার আগেই এলো নতুন জ্ঞানের বহিরাগত ঢেউ। রাজা তথা পুরোহিতরা বাধা দিলেন, কিন্তু দু'হাত তুলে তাকে অভিনন্দন জানাল সাধারণ মানুষ। ফলে দেখা গেল, যদিও জ্যামিতি এবং অঙ্কশাস্ত্রের জন্ম হয়েছিল সুদূর মিশরে, কিন্তু তার প্রথম ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটলো গ্রীসের মাটিতেই। তাঁরা জমি-জরিপের কাজ শুরু করলেন। শুরু করলেন বিজ্ঞান হিসাবে অঙ্কচর্চা। অবশ্য, এটা ঠিক যে, ব্যাবিলনের লোকেরা তারও আগে আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জকে নিয়ে অনুধ্যানে বসেছিলেন সত্য, কিন্তু সে ধর্মীয় কারণে। জীবজন্তুর শারীরবিদ্যারও অনুশীলন করতেন তাঁরা, তবে তাও নিছক ভবিষ্যৎ-বাচনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু গ্রীস পৃথিবীর ঠিকানা নিতে বিজ্ঞান এবং ধর্মকে সর্বপ্রথম আলাদা করে দেখতে লাগল। তাদের এই অনুসন্ধিৎসার ফল হিসাবে পৃথিবী সেদিন যে জিনিসগুলো পেয়েছিল, তার মধ্যে তালিকায় বিশেষ উল্লেখ্য জীব-বিজ্ঞান, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, প্রথম লিখিত ইতিহাস এবং সাহিত্য। অবশ্য, 'সাহিত্য' বলতে তখন ওদেশে যা আবির্ভূত হয়েছিল তা হচ্ছে ধর্মীয় বিধিনির্দেশের অথবা

লৌকিক উপকথার সংকলন। এর থেকেই ধর্মের শেষ বাঁধনটুকু ছিঁড়ে জন্মাল ক্রমে সাধারণের সাহিত্য—লৌকিক সাহিত্য। জন্মাল গ্রীক নাটক—বিশ্ব-সাহিত্যে যা পুরোধা বলে স্বীকৃত।

মানব-সংস্কৃতিতে গ্রীসের এই দানের কাহিনীটি উল্লেখ করলাম দুটো কারণে। প্রথমত, গ্রীস আধুনিক সভ্যতার অন্যতম আদিভূমি হলেও তারা যে কোনোও স্বয়ম্ভু দেশ বা জাতি নয়, তা আবার মনে করিয়ে দেবার জন্য। দ্বিতীয়ত, সভ্যতার উত্থান-পতনের পেছনে মানুষের মনোভূমি তথা সংস্কৃতির ভিত্তি-ভূমিটুকুর গুরুত্ব নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে।

এই মানসিক ভিত্তি-ভূমিটুকুকেই আমরা ইতিহাসের ব্যাপকতর দেহে 'সংস্কৃতি' আখ্যা দিই। যে-কোনো আধুনিক সভ্য দেশকে উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করলেই আমরা ঠিক বুঝতে পারব, জাতির আকৃতি গঠনে এর গুরুত্ব কতখানি। ডিউই বলেছেন—

'It is at least as true that the state of culture determines the order and arrangement of native tendencies as that human nature produces any particular set or system of social phenomena, so as to obtain satisfaction for itself.'[২]

দৃষ্টান্তস্বরূপ মার্কিন সভ্যতার উল্লেখ করা যেতে পারে। আমেরিকার সভ্যতার স্ফূর্তি আজ বিশ্ববিদিত ঘটনা। এ ঘটনা যেসব কারণে সম্ভব হলো, তার মধ্যে অন্যতম কারণ গ্রীসের মতোই এই দেশের ভেতরের ঐতিহ্যশূন্যতা। আদি-দেশের সঙ্গে সব-সম্পর্ক-চোকানো এই মানুষগুলোর মানসিক পটভূমি ছিল নিতান্তই কুমারী। ফলে, বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর সঙ্গে মেলামেশায় যেমন এদের সতীত্ব হারাবার আশঙ্কা ছিল না, তেমনি ভয় ছিল না অতীতকে হারানোরও। নতুন জাতি বলেই, বয়সে কম হলেও আমেরিকা

২ *Freedom and Culture*—John Dewey

সভ্যতায় এমন দুর্দম-গতি। এ জাতির সভ্যতায় যদি বৈশ্য-চরিত্র আমাদের বেশী করে চোখে পড়ে, তবে তার জন্য আমাদের চোখ বা সংস্কৃতি যেমন কিছু পরিমাণে দায়ী, তেমনি বহুলাংশে দায়ী ঐ দেশের স্বাভাবিক মানসিক পরিণতিও। মানুষ মূলতই বৈশ্য—এ-কথা বলা অবশ্য আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু বাঁচার প্রয়োজনে দূর-দূরান্ত হতে বাস্তুহারা মানুষ যেভাবে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে একদিন এই দেশে এসেছিল, তার অন্তরে বৈশ্য ধারণা ছিল স্বাভাবিক। পরিবেশ এবং পরবর্তী ইতিহাস সে অঙ্কুরকে ক্রমে এক মহীরূহ বৃক্ষে পরিণত করেছে, এই যা। তাতে আমেরিকা সজ্ঞানে কোনো বাধা দেয়নি—কারণ পরিবর্তনকে বাধা দেওয়ার মতো চরিত্র শিশুর থাকে না, ঐতিহ্যহীন মানুষ এই পিছুটান থেকে মুক্ত। ঘানা বা গিনি এত তাড়াতাড়ি এভাবে বড় হতে পারবে না। কিংবা আজকের আমেরিকাও পারবে না—সহসা এ-সব বাতিল করে দিয়ে—একটা নতুন কিছু, স্বতন্ত্র কিছুকে গ্রহণ করতে। তার ইতিমধ্যে গড়ে-ওঠা সংস্কৃতি—অর্থাৎ রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংগঠন, জীবনের মূল্য-বোধ তাকে বাধা দেবে। কমিউনিজম সম্পর্কে শুধু রাষ্ট্র-পুরুষদের মনোভঙ্গী নয়, সমগ্র মার্কিন জনগোষ্ঠীর মনোভাব তারই ইঙ্গিত বহন করে।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। যে মার্কিন সভ্যতার কথা আমরা এখানে উল্লেখ করলাম—এ সভ্যতা কি শ্রেষ্ঠতম? অথবা যে সোভিয়েত সভ্যতা মার্কিন দেশের পরম বিতৃষ্ণার বস্তু, তা শ্রেষ্ঠতর? বলা বাহুল্য, প্রশ্ন হিসাবে এ খুবই অবান্তর এবং অজ্ঞতাপ্রসূত। কারণ, সভ্যতার কোনো দেশগত পরিচয় নেই। এ হলো সার্বভৌম সর্বমানবিক কৃতিত্ব। এবং কোনো একক জন-গোষ্ঠী যে তার একমাত্র দাবিদার নয়, সে-কথাও আগেই উল্লেখ

করেছি। সুতরাং কোনো বিশেষ দেশকে সভ্য বা অধিকতর সভ্য আখ্যা দেওয়ার সামর্থ্য অতঃপর আমাদের আর নাই। একমাত্র এটুকু বিচারেই অবতীর্ণ হতে পারি আমরা—কে কিভাবে এই সর্বমানবিক সম্পদকে ব্যবহারে লাগাচ্ছে তার হিসাব-নিকাশ নিতে। একমাত্র এই ব্যবহারের বিচারেই সভ্যতার বিচার সম্ভব। কথাটাকে আবও একটু পরিষ্কার করেই বলি। বৈদ্যুতিক শক্তির আবিষ্কার সভ্যতার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই শক্তিটিই আবার দুষ্কৃতিকারীদের কাছে অঘটন বলে গণ্য। কাবণ, তারা অন্ধকাবেব মানুষ। আলো তাদের শত্রু। মোটব তাদের কাছে আশীর্বাদ বলে গণ্য তখনই যখন ওতে চড়ে তারা ব্যাঙ্ক-লুঠে বেব হয়। কিন্তু যখন মোটরে চড়ে তাদের সন্ধানে পুলিশ ঘোরে, তখন এই যানটিই তাদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত অনভিপ্রেত, অভিশাপ। ঠিক তেমনিই যারা মনে মনে পল্লীব শান্তিপূর্ণ কুটীরে নিরুপদ্রবে বাস করাব পক্ষপাতী, যাদেব মনে রাত্রিকে দিন কিংবা দিনকে রাত্রি করার বাসনা একান্তভাবে অনুপস্থিত—নিত্যনতুন আবিষ্কার হাঁফিয়ে তুলবে তাদের। এজন্যই গর্ডন চাইল্ড বলেছেন,— আমরা দিনে দিনে এগিয়েছি কিনা, তা সত্যিই একটা ভাববাব মতো প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তব পাওয়া সম্ভব একমাত্র ব্যক্তিগত বিচারকের বাঁধা মানদণ্ডে।

'This question have no scientific meaning. There is no hope of any agreement upon its answer That would depend entirely upon the caprice of the inquirer, his economic situation at the time and even on the state of his health'. ৩

গর্ডনের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। তাঁর মতে, এ-জাতীয় প্রশ্নের উত্তব সম্পূর্ণতই ব্যক্তিগত মূল্যবোধের ওপর নির্ভরশীল। সেই মূল্যবোধও

---

৩ *Man Makes Himself*—Gordon Childe

দেশ-কাল, নিজের সামাজিক প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা, বৃত্তি, পেশা, বয়স, এমনকি স্বাস্থ্যের ওপর নির্ভরশীল।

তবে কি সভ্যতা বলতে প্রকৃতপক্ষে কিছুই নেই? এই দুনিয়ার সবই কি মায়া? এর উত্তর অবশ্যই আছে। তবে তা কোনো বিশেষ দেশের কোনো বিশেষ বস্তুর নাম নয়, তা সমগ্র মানুষের ধারাবাহিক ইতিহাসের এক অভিনব দান, চিন্তা এবং ঘটনার একটা দীর্ঘ তালিকা। সমগ্রভাবে এদের বেছে বের করাই সভ্যতার ঐতিহাসিকের কাজ। তার জাত বিচার করা নয়।

জাত বিচার করিতে পারি আমরা—এইসব উপাদানের ব্যবহার-কারী যারা, তাদের। কিংবা যারা এখনও এসবের ব্যবহারে শিক্ষিত হয়নি, তাদের। আগেই বলা হয়েছে, তাতেও চূড়ান্ত বিচার হয় না। ভুল-ত্রুটির সম্ভাবনা থেকে যায়। এর কারণ বিচারকদের বিশিষ্ট মানসভঙ্গী। অথবা বলা যায় তাদের কালচারাল স্টেটাস।

এই কালচারাল স্টেটাস আমাদের তাহলে টেনে এনে দাঁড় করাবে ব্যক্তি-মানুষের সামনে—যে মানুষের তিন আনা তার নিজের, তেরো আনা তার কালের। সভ্য মানুষ বলতে কী মানুষ ভাবি আমরা? ক্লাইভ বেল আমাদের বিচারের জন্য এমন মানুষের একটা নমুনা-ছবি এঁকেছেন। সে মানুষ যুক্তিপূর্ণ হবে, তার নিজস্ব একটা মূল্যমান বা জীবনাদর্শ (Sense of Values) থাকবে। আর থাকবে—

'A taste for truth and beauty, tolerance, intellectual honesty, fastidiousness, a sense of humour, good manners, curiosity, a dislike of vulgarity, brutality and over-emphasis, freedom from superstition and prudery, a fearless acceptance of the good things of life, a desire for complete self-expression and for a liberal education, a contempt for utilitarianism and philistinism, in two words—sweetness and light.' ৪

৪ *Civilization*—Clive Bell

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, ক্লাইভ বেলের এই ফর্দ মেলাতে হলে পুরোনো পৃথিবীতে চলবে না আমাদের। রসিকতা বা রসবোধ প্রাচীন সমাজেও ছিল। সিংহলের ভেদা উপজাতির লোকেরা সঙ্গীদের গায়ে কাঁটা ফুটিয়ে আমোদ পায়—কিন্তু এ নিছক ভালগারিটি, এবং তাছাড়া—হিংস্রতাও বটে, তাই ত্যাজ্য। ঠিক তেমনি, একটি মিলবে তো অন্যটি খুঁজে জড়ো করা কষ্টকর। অর্থাৎ, পৃথিবীর যে সমাজে যে যুগে যা শ্রেষ্ঠতর বলে বিবেচিত হয়েছে, তাই দিয়ে তিল-তিল করে তিনি তৈরি করেছেন এই সভ্যতার তিলোত্তমাকে। আজকের পৃথিবীতেও কোনো বিশেষ দেশে একে খুঁজে পাওয়া যাবে না। একটা পাওয়া গেলেও মিলবে না অন্যটা। তিনটে মিললে গরমিল হয়ে যাবে বাকী দুটোর। এজন্যই আজ একাধিক সভ্যতার উপস্থিতি পৃথিবীতে স্বীকার্য এবং তৎসত্ত্বেও 'সভ্যতা' সকল মানুষের অর্জন-সাপেক্ষ।

ব্যক্তির ভূমিকা ও জাতিগত পার্থক্য

এই জটিল সভ্যতা এবং সংস্কৃতিতে ব্যক্তির ভূমিকা কি, তাই এবার আমাদের ভেবে দেখবার বিষয়। সেটা সঠিকভাবে বুঝতে হলে মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে সংস্কৃতিগত পার্থক্যটি আগে অনুধাবন করতে হবে আমাদের। এটা সর্বজনবিদিত, নাগারা এই বাংলা দেশের সমতলের মানুষের থেকে ভিন্ন জীবনাচারী এবং এদেশের সঙ্গে ইয়োরোপের যে-কোনো দেশের মানুষের জীবনধারণা এবং মূল্যবোধও ভিন্ন। কম-বেশী পার্থক্য আছে দেশে-দেশে, মানুষে-মানুষে, আচারে-আচরণে, বিশ্বাস এবং ধারণায়। সংস্কৃতির সেটা বৈচিত্র্য। কেন কিভাবে এই বৈচিত্র্য এল, সেটা আগে সভ্যতার আলোচনায় বলা হয়েছে। কিভাবে স্থানে স্থানে এ পার্থক্য ক্রমে অপস্রিয়মাণ, তাও বোঝা যাবে ঐ প্রক্রিয়াতেই।

এ প্রক্রিয়ায় অন্যতম সহায় ব্যক্তি-মানুষ। মানুষ সামাজিক জীব। তার ধ্যান-ধারণা যেমন পরিবেশ এবং সমাজ-সংসর্গে গঠিত, তেমনি সমাজেরও সে অন্যতম ক্রিয়াশীল শক্তি, পরিবর্তনের অন্যতম সিংহদ্বার। কোনো মতাদর্শ মানেই মানুষের যৌথ-জীবনাচারের বিশ্বাস-বেদ। এর প্রতিটি শব্দ প্রতিটি কথা সমাজের ভাষা থেকে আহরিত। যতখানি সমর্থন পরিবেশে পাওয়া যাবে ততখানিই তার সাফল্যের সম্ভাবনা। এইজন্যই কখনও কখনও শোনা যায়, অমুক মতবাদটি এদেশে বিদেশী। অর্থাৎ, এই বিশেষ মতবাদ যে ভূমিতে, যে পরিবেশে জাত, এখানে তার অভাব। আবার সামাজিক এবং আনুষঙ্গিক যোগ্য পরিবেশ পেলে বহুদূরাগত মতবাদ, এমন কি যা

আপাত-প্রগতিবিরোধী এমন জিনিসকেও আপন করে নেয় কেউ কেউ।

এই পরিবেশ—এই মানসিক ভিত্তিভূমির অনেকখানিই ব্যক্তি-মানুষের রচনা। সে নিজে সমগ্রের সন্তান। কিন্তু এই সমগ্রকে একক শক্তি হিসাবে প্রভাবিত করাব শক্তি একমাত্র তার মধ্যেই নিহিত।

কখনও কখনও মানুষ এককভাবেই এই দুরূহ কর্তব্য সম্পাদন করে, কখনও কখনও করে অন্য মানুষের সঙ্গে দলবদ্ধভাবে। ইংলণ্ডের রাজকার্যে যিনি প্রথম স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্‌ প্রবর্তন করেন, তিনি ছিলেন একজন রাজকর্মচারী। ভদ্রলোক বিজ্ঞানী ছিলেন না। শিল্প-বিপ্লবের গোড়ার দিককাব কথা। তিনি বন্দরের কাস্টম-অফিসারদের লিখছেন—গত এত সাল থেকে এত সাল পর্যন্ত কত কয়লা বাইরে গেছে তার হিসেব দাও তোমরা। দফাওয়ারী হিসেব। এর আগেকার রীতি ছিল অন্যরকম। অপটু কর্মচারীরা তাঁর মতলব ঠিক বুঝতে না পেরে পুরোনো কায়দাতেই হিসাব পাঠাতে লাগলেন। আর তিনি সে-সব প্রত্যাখ্যান করে লিখতে লাগলেন নোটের ওপর নোট। এভাবে কেবল নিজ কাজের সুবিধাব জন্য এক নতুন কৌশল বার কবলেন তিনি—যা আজ পৃথিবী-জোড়া সংখ্যা-বিজ্ঞানরূপে স্বীকৃত। ব্যক্তিগত এমনি কৃতিত্ব অন্যদেরও দেওয়া যায়—যেমন আমাদের দেশে রামমোহন কিংবা গান্ধীজীকে।

সংস্কৃতির ইতিহাস হলো দলবদ্ধ কৃতিত্বেরই ইতিহাস। ইয়োরোপের রেনেশাস থেকে শুরু করে আমাদের দেশের ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণ তাদেরই কাহিনী। সাধারণত এদের আমরা বলে থাকি বুদ্ধিজীবী। বুদ্ধিজীবী বা ইন্‌টেলেকচুয়াল কথাটার বিস্তৃতি ঘটেছে সোভিয়েত দেশ থেকে। এর সংজ্ঞা আজও বহুদূরবিস্তৃত। সমাজের

সমগ্র সাংস্কৃতিক প্রকৃতি যে যে জিনিসের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত, ম্যানহাইম্ তার শ্রেণী-বিভাগ করেছেন নিম্নরূপ :

(১) প্রথম বিভাগে আছে—সমাজের ইতস্তুতভাবে ছড়ানো বিরাট স্বাধীন-অংশ। সংস্কৃতিকে নানাভাবে প্রভাবিত করে এরা।

(২) দ্বিতীয় বিভাগ হলো—সামাজিক সংগঠনগুলো নিয়ে। যেমন—সরকার, চার্চ, বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্বৎসভা, পত্র-পত্রিকা, রেডিও এবং অন্যান্য যাবতীয় সুসংগঠিত প্রচার-ব্যবস্থা।

কোনো স্বাধীন, গণতান্ত্রিক সমাজের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীরই অবদান বেশী। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে বা ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রে দ্বিতীয় শ্রেণী অধিকতর শক্তিশালী।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীকে আরও কয়েকটি উপ-শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন—(ক) রাজনৈতিক, (খ) বুদ্ধিজীবী, (গ) শিল্পী, (ঘ) নৈতিক, (ঙ) ধর্মীয় এবং (চ) সাংগঠনিক ইত্যাদি।

রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীদের কাজ হলো সমাজের বৃহত্তর জনসংখ্যার ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে একীভূত করে তার মানসিক বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করা। ধর্মীয় বুদ্ধিজীবীদের কাজ এই মানুষগুলোর দৈনন্দিন জীবনকেই সুন্দরতর এবং মহত্তর করার চেষ্টা করা এবং এভাবেই তারা 'Stimulate objective knowledge as well as tendencies to introversion, introspection, contemplation and vellication.' ১

ম্যানহাইমের মতে, যে সমাজ-ব্যবস্থায় এদের জন্য স্থান অল্প, সে সমাজ-ব্যবস্থায় সর্বকর্তৃত্বের চাবিকাঠি চলে যায় রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর হাতে। এবং তার ফলে তাদের সাংস্কৃতিক অগ্রগতিও ব্যাহত হতে বাধ্য। কারণ, সংস্কৃতির বিকাশ সেখানেই সম্ভব

১ *Man and Society*—Karl Mannheim

যেখানে নাগরিকদের হাতে আছে অবসর—এমন অবসর যাতে তার: উদ্বৃত্ত কর্মশক্তি পায় নতুন নতুন পথের সন্ধান এবং তাছাড়া এর জন্য প্রয়োজন স্বাধীনতার। স্বাধীন সমাজে যেখানে এ ধরনের মানুষের সংখ্যা বেশী, সেখানেই সংস্কৃতির উৎকর্ষ বেশী। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানেরও তাই সেখানে সংখ্যাধিক্য।

বুদ্ধিজীবীর এই সংখ্যাধিক্য আর একদিক থে.ক সংস্কৃতিক্ষেত্রে এক সমস্যাও বটে। এ সমস্যা শুধু আমাদের দেশে একক নয়। অবশ্য, কলেজে কলেজে কর্মপ্রার্থী শিক্ষকের ভীড়, সাহিত্য-পত্রে পত্রে কবি-ঔপন্যাসিকের অত্যধিক ভীড় থেকে আমাদের এখানকাব বুদ্ধিজীবীর সংখ্যাধিক্য বেশ উৎকটভাবে দেখা এবং বোঝা যায় সত্য, কিন্তু যে-সব দেশে এভাবে সমস্যাটাকে দেখবার উপায় নেই, সেখানেও এটা স্বীকৃত সমস্যা।

আগেকার দিনে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় গঠিত হতো সাধারণত তিনটি প্রক্রিয়ায়ঃ (১) জন্ম, (২) বিষয়-আশয়, (৩) বাস্তব কৃতিত্ব। জন্মসূত্রে যাঁরা বিদ্বানের আসন পেতেন, তাঁরা ছাড়া অপেক্ষাকৃত নীচুস্তরের বুদ্ধিজীবীরা বিত্তের মানদণ্ডেও কখনও কখনও রাজসভায় শিরোপা পেতেন। আজকের দিনেও খেতাব ইত্যাদি দিয়ে গণ-তান্ত্রিক পদ্ধতিতে সেই পুরোনো প্রথা বাঁচিয়ে রাখবার একটা চেষ্টা দেখা যায় দেশে-দেশে। ফরাসী দেশে সাহিত্যিকরা দ্য গলের মন্ত্রিসভায় আসন পেয়েছেন, আমাদের দেশেও প্রথমে উপ-রাষ্ট্রপতির, পরে রাষ্ট্রপতির আসন দখল করেছেন ডঃ রাধাকৃষ্ণণ শুধু বিদ্যার জোরে। শিক্ষামন্ত্রী এবং অনুরূপ আরো আরো দৃষ্টান্ত দেখানো যেতে পারে চলতি ইতিহাস থেকে। এটা পুরোনো পৃথিবীরই জের। তবে নিঃসন্দেহে আমাদের পক্ষে আনন্দের সংবাদ। কারণ, সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র এই খাতির দেখিয়ে বুদ্ধিজীবীদের বিশেষ কর্তব্যকেই

সম্মান দেখিয়েছেন। অবশ্য, সেই সঙ্গে যদি এঁদের পুরোপুরি কিনে নেওয়ার কথা উঠতো তবে ছিল অন্য কথা।

যাই হোক, বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যাস্ফীতির ফল হিসাবে প্রথমেই যেটা উল্লেখযোগ্য, সেটা হচ্ছে এই—তাদের মূল্যমান হ্রাস। বাজারে ভোগ্যপণ্যের বাজার-দর যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, এদের দরও ওঠা-নামা করে সেই তালে। সেইজন্যই বি এ.-পাস বর যেমন আজ আর পূর্বেকার যৌতুক পায় না, তেমনি কাব্য-লেখকরাও আর পান না সেকালের মতো সভাকবির সম্মান কিংবা সবজনের শ্রদ্ধা। মূল্যমানে এই দর পড়ে যাওয়াব ফলে বুদ্ধিজীবীরা পূর্বেকার মতো তেমন সংখ্যালঘিষ্ঠ না হয়েও শক্তিমান শ্রেণী নন। তাঁরা যথেষ্টসংখ্যক হয়েও দুর্বল শ্রেণী।

দ্বিতীয়ত, পূর্বেকার বুদ্ধিজীবীরা শ্রেণী-স্বাতন্ত্র্য যেভাবে বজায় রাখতে পেরেছিলেন, এখনকার বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। জীবিকার সমস্যা এবং অন্যান্য নানাবিধ কারণে আজ তাঁরা বিচ্ছিন্ন, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শ্রেণী। রেল-অফিসেও কবি আজ কাজ করেন, লেজার লেখেন ঔপন্যাসিক। তৃতীয়ত, নিজের এই বিচ্ছিন্ন দলটাই আজ বহুতর প্রকৃতির মানুষের তৈরী। দলগত ঐক্য যা ছিল পুবাকালে বুদ্ধিজীবীদেব এবং তাঁদেব সামনের সমস্যাব মতোই কম, ফলে ছিল শক্ত—তা আজ বহুতর ফাটলে বিপর্যস্ত। এতে আপাত-সাংস্কৃতিক জীবনে বৈচিত্র্য বাড়লেও, দল হিসাবে পূর্বতন ক্ষমতা তাঁদের লুপ্তপ্রায়।

এছাড়া, আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজ, আরও নানাভাবে বুদ্ধি-জীবীদের ঠেলে দিচ্ছে নতুন-নতুন সমস্যার দিকে। উদাহরণস্বরূপ, 'সস্তা বই' বা 'চিপ এডিশন' বইয়ের উল্লেখ করা চলে।

বই সস্তা হলে বৃহত্তর জনসংখ্যার আনন্দ। তাদের মুক্তি।

বস্তুত, গণতন্ত্র তথা সভ্যতার দাবিও তাই। মঠের গুহায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের গহ্বরে বিদ্যাকে বেঁধে রাখতে নিশ্চয়ই আমরা পরামর্শ দেবো না কেউ। কিন্তু সমগ্রভাবে বুদ্ধিজীবীরা তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বলেই বিশেষজ্ঞদের ধারণা। কারণ, এর ফলে প্রচলিত জনপ্রিয় এবং সহজে খ্যাতিমান লেখকরাই প্রকাশকদেব একমাত্র ধ্যান। অথচ এককালে নতুন লেখকদের আবিষ্কার করতেন তাঁরাই। আজ নতুন লেখকদের পৃষ্ঠপোষণা তাঁদের কাছে একটা দায়স্বরূপ। তাঁরা ওতে মূলধন নিয়োগের চেয়ে পুরোনোদের পূজোই মনে করেন বুদ্ধিমানের কাজ। ফলে ম্যানহাইমের মতে,

'The risk of starting new things becomes too great and the same tendency which makes for democratization of cultural values makes for concentration of business and market control, leading towards monopoly and totalitarian bureaucratic influence.' ২

অর্থাৎ, বুদ্ধিজীবীরা আজ একদিকে ক্রমবর্ধমান সংখ্যার চাপে যেমন বিপর্যস্ত, তেমনি বিপন্ন গণতান্ত্রিক আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থার ফলে। তাঁদের পূর্বেকার দলগত বাঁধন যেমন ছিন্ন, তেমনি খর্বিত তাঁদের পূর্বেকার শক্তি, সমাজের অবশিষ্টাংশে তাঁদের প্রভাব।

২ *Man and Society*—Karl Mannheim

পরিবেশ সৃষ্টি ও সংস্কার সাধনে

তাই বলে এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বুদ্ধিজীবিগণ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছেন কিংবা তাঁদের করণীয় কর্তব্য আজ পুরোপুরি শেষ হয়ে গেছে, এমন মনে করবারও কোনো কারণ নেই। প্রথমত, আমাদের এ-কথা মনে রাখতে হবে, সমাজে 'বুদ্ধিজীবী' নামে বিশেষ ধরনের মানুষগুলোর আয়ু সমাজের আয়ুর সমান। তাদের আকার-প্রকার এবং কর্তব্যভেদ অবশ্যই ঘটবে, কারণ সমাজও পরিবর্তনশীল। তাদের করণীয় কাজের অদল-বদল হবে, কিন্তু একেবারে ছুটি মিলবে না, কারণ তারা সামাজিক মানুষ।

আসলে শিল্প-সাহিত্য-নৃত্যগীত ইত্যাদি যেসব কর্মকাণ্ডকে আমরা বুদ্ধিজীবী কিংবা সংস্কৃতিপরায়ণ মানুষের কাজ বলে ভাবি, সেগুলো সামাজিক মানুষেরই কাজ। নির্দোষ বা সর্বসম্পর্কশূন্য প্রবৃত্তি হিসাবে এগুলোর জন্ম হয়নি। যদিও কোনো কোনো সমাজ-বিজ্ঞানী এটা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, পর্বত-গুহায় মানুষের চিত্রকলার প্রথম স্বাক্ষরগুলো মানবের দৈনন্দিনতার অতীত আনন্দ-মুহূর্তের স্বাক্ষর মাত্র, তবুও এটা আজ স্বতঃপ্রমাণিত যে, এর পেছনে সেই সব আদিম শিল্পীর প্রেরণা ছিল নেহাত জৈব ব্যাপার। পেটের চিন্তায়, শিকারের ধাঁধায় তাঁরা যে শুধু ছবি এঁকে মনে মনে হরিণ তাড়িয়ে বেড়াতেন তাই নয়, সেই মরা হরিণ আগুনে ফেলে নাচতেনও। মানুষের আদি শিল্প-সঙ্গীতের জন্মও এই স্থূল দেহ-গ্রাহ্য সমাজ থেকেই। প্রশ্ন উঠতে পারে, নির্দোষ কামনা-বাসনাহীন কোনো অনির্দেশ্য প্রেরণায় মানুষ নাচে কি-না। এককথায় তার উত্তর—না, নাচে না। প্রেরণাটা

'াংসের মতো স্থূল আহার্য নাও হতে পারে, কিন্তু প্রকারান্তরে তারই প্রতিচ্ছায়া মাত্র। একটি বলকে উপলক্ষ্য করে বেড়ালছানা যে শিকারের ছন্দ তোলে তার কচি পায়ে, তাও ভবিষ্যৎ অন্নচিন্তার মহড়া মাত্র।[১]

এ-ধরনের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডে দ্বিতীয় লক্ষণীয় তার দর্শক। রবিনসন ক্রুশো দ্বীপে সঙ্গীহীন হয়ে পশুপাখীকেই বাধ্য করেছিল তার নীরব শ্রোতা হতে। আজকের দিনেও আমরা লক্ষ্য করলেই তুল্য পরিস্থিতি সহজেই দেখতে পাব। খুব উন্নতধরনের একটা সুর বাজাতে চাইলেই যে-কোনো যন্ত্রে যেমন তা বাজাতে পারি না আমরা, তেমনি তার যোগ্য সমাদরও পাওয়া যাবে না যে-কোনো রকমের দর্শকের আসরেই। ডঃ বেনেডিক্ট এ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

'The richest musical sensitivity can operate only within the equipment and standards of its tradition. Its achievement remains in proportion to the instruments and musical theory which the culture has provided.'[২]

এই পরিবেশের সৃষ্টি করা সংস্কৃতির একটি শর্ত, সমাজের একটি বিশেষ দায়িত্ব। পরিবেশের দিক থেকে ব্যক্তিগতভাবে শিল্পীকে দেওয়ার এবং সমষ্টিগতভাবে শিল্পীর কাছ থেকে নেওয়ার ক্ষমতা যে-সমাজের যত বেশী, সে-সমাজের সংস্কৃতি তত উন্নত। যেমন উদাহরণ-স্বরূপ চীনা-সংস্কৃতি। চীনে শিল্পকলার এমন উন্নতির একটি বিশেষ কারণ ও-দেশের দর্শক-সমাজ। আমরা যাদের বলি সমজদার। অথচ আফ্রিকায় ব্যক্তিগতভাবে নিগ্রো-শিল্পী জন্মালেও এই সমালোচক-দর্শক তথা উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশের অভাবে নিগ্রোরা কোনো উন্নতধরনের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সমর্থ হয়নি।

১ *Art and Social Life*—G. V. Plekhanov.
২ *Patterns of Culture*—Dr. Ruth Benedict.

'It is for want of a conscious critical sense and the intellectual power of comparison and classification that the Negro has failed to create one of the great cultures of the world, and not from any lack of the creative aesthetic impulse, not from lack of the most exquisite sensibility and the finest taste.' ৩

এই ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে দুটো সত্য লাভ করছি আমরা। প্রথমত, সংস্কৃতি একটা সামাজিক ব্যাপার যা ঐ সমাজের সভ্যদের ওপরেই প্রধানত নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত, সমগ্র সামাজিক চেতনা ভিন্ন সংস্কৃতির স্ফূর্তি অসম্ভব। এই চেতনার পরশপাথর—বুদ্ধিজীবী, বোজার ফ্রাই যাদের ওপর দায়িত্বভার ন্যস্ত করছেন শিল্প-সাহিত্যের, বিচার-বিবেচনা এবং তুলনা-আলোচনার। এই বিচার-বিবেচনা, তুলনা-আলোচনা সমগ্র সমাজের হয়ে যে বিশেষ কয়জন অগ্রসর সমাজে গ্রহণ করে থাকেন, তাঁরাই বুদ্ধিজীবী। সাদা কথায় বলা যায় সমালোচক। এঁরা সমাজের এমন এক বিশেষ সম্প্রদায় যাঁরা সমাজের অবশিষ্টাংশের মতো চল্‌তি সামাজিক ন্যায় এবং ভূগোলের শাসনে বাস করেও তার বহিঃচারী এক বিশেষ ধরনের বিশেষ মানুষ। সমাজের প্রতি এক বিশেষ ধরনের দায়িত্ববোধ, জগৎ এবং জীবন-সম্পর্কে এক বৃহত্তর মূল্যবোধে উদ্বোধিত হয়ে এঁরাই অবশিষ্ট সমাজকে ধীরে ধীরে তার পুরানো ধ্যান-ধারণার বেড়া ডিঙিয়ে হাত ধরে বাইরে এনে দাঁড় করান। সেই বহির্দ্বারে—শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, সাহিত্যিক, দার্শনিকের নতুন দুনিয়া তখন অপেক্ষা করছে সেখানে। বুদ্ধিজীবীদের শিক্ষায় সমাজ অতঃপর আনন্দে আত্মসমর্পণে রাজী হয়ে থাকে।

এই কর্তব্য বুদ্ধিজীবীদের শ্রেণী-বিভ্রাটের মধ্যেও আজও অবশ্য-পালনীয়। এবং যে স্বাধীনতার বিপর্যয়ে তাঁরা আজ পতিত, সেই

---

৩ *Vision and Design* (p. 90)—Roger Fry

স্বাধীনতাই আজ তাঁদের পরম মিত্রও এ-ব্যাপারে। এমন একটা সময় ছিল যখন শিল্প-সাহিত্যের মর্যাদা বেশি থাকলেও, সাধারণ্যে খুব কমই অস্তিত্ব ছিল তার। পৃথিবীর শিল্পকলার ইতিহাসে কয়েকটি পুরো অধ্যায়-ই এই দাস-শিল্পের রোজনামচা! হার্বার্ট রীড লিখেছেন:

'In certain ages art has made the artist an exponent of the moral and ideal emotions of the super-ego, and art has thus become the handmaid of religion or morality or social ideology In that further process art, as art has always suffered.' [৪]

কেননা এর ফলে বক্তব্যটা যেমন প্রাধান্য পেয়েছে অন্যান্য বিষয় তেমন পায়নি। শিল্পের অন্যান্য পাওনাগুলো যেমন তাতে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, তেমনি ঘোরতর সম্ভাবনা শিল্পের সৌন্দর্যহানির এবং শিল্পীর শিল্পী-মেজাজের অভাব ঘটার।

শিল্পীর স্বাধীনতা এই অত্যাচারের একমাত্র মুক্তিপথ। সমালোচক তথা বুদ্ধিজীবীর স্বাধীনতাও তাই। এই স্বাধীনতাটুকু ছিল বলেই ইয়োরোপে পিকাসোকে বয়কট করার প্রশ্ন ওঠেনি। ওঠেনি আমাদের দেশে যামিনী রায় কিংবা অন্যান্যদের একঘরে করার কথা। ইয়োরোপে এমন অনেক শিল্প-আন্দোলন হয়েছে এবং হচ্ছে, যা আজ সামাজিক সমর্থন লাভ করে বিশেষ-বিশেষ সমাজের সংস্কৃতির পরিচায়ক হয়ে উঠেছে। মাইনে-করা বুদ্ধিজীবী, কিংবা দরবার-নির্ভর সংস্কৃতিতে তা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এখনও নেই। বিপর্যয়ের মধ্যেও শিল্পী বা বুদ্ধিজীবীর স্বাধীনতায় তাই স্বাধীন বিশ্ব আনন্দিত।

সংস্কৃতিকে বদ্ধজলায় পরিণত না করতে হলে এই স্বাধীনতা অপরিহার্য। আগের আলোচনাতেই তা অনেকটা স্পষ্ট করে বলা হয়ে গেছে। কিভাবে সংস্কৃতির স্বাধীনতা তাকে ক্রমে বিচিত্র এবং সুস্থতর করে তোলে, সে-কথাই বলা যাক এবার।

---

৪ *Art and Social Life* (p. 95)—Herbert Read

গথিক শিল্পের আদি চিন্তা ছিল—উচ্চতা এবং আলো (altitude and light)। এই দুটোকে রাখতে গিয়ে স্থাপত্যে সেদিন যে রীতি জন্মগ্রহণ করেছিল, তা সম্পূর্ণত ঐ বিশেষ কর্মের ফল হলেও ক্রমে দেখা গেল, ত্রয়োদশ শতকের ইয়োরোপে এটা একটা নব্য শিল্প-ধারণায় পরিণত হয়ে গেছে। ক্রমে স্থানীয় রীতি গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে এটা আরও অনেক দূর এসে গড়াল। এবং শেষ পর্যন্ত 'What was at first no more than a slight bias in local forms and techniques expressed itself more and more forcibly, integrated itself in more and more definite standards, and eventuated in Gothic Art' ৫ এই পরিবর্তন-পরিবর্জন এবং সংস্কার ইত্যাদির কাজ সংস্কৃতির কাজ। এ কাজের দায়িত্ব সংস্কৃতিবানের দায়িত্ব।

এ দায়িত্ব পালনে একটা আদর্শের প্রশ্ন ইদানীং স্পষ্টভাবে উত্থিত হয়েছে। এ দায়িত্বের মূল লক্ষ্য হবে কি, কি হবে এই গ্রহণ-বর্জনের বিচার-পদ্ধতি।

স্পষ্টভাবেই এর দুটো উত্তর দিতে পারি আমরা। অবশ্য, উত্তর দুটো পরস্পর-বিরোধী। সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও-দেশের বাইরেও বহু লোকের কাছে একটা নতুন সভ্যতা বলে স্বীকৃত। রাশিয়ায় যে একটা নতুন সভ্যতার বিকাশ চলেছে, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই বিরুদ্ধপক্ষেরও। তাঁরা তাঁদের দেশে সংস্কৃতি-কর্মীদের কর্তব্যের নির্দেশ দিয়েছেন—সমাজতন্ত্রের সেবা। সাহিত্য-চারুকলা-দর্শন-বিজ্ঞান একযোগে এ কাজেই নিযুক্ত হয়েছে সেখানে। যদিও এটা একটা বিশেষ জীবন-মূল্যমানের উপর নির্ভরশীল আস্থা, তবুও ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় বহু শিল্পী ও কর্মী যোগ দিয়েছেন এ যজ্ঞে।

৫ *Patterns of Culture*—Dr. Ruth Benedict

শিল্পীর সামাজিক কর্তব্যকে স্বীকার করেই একটা বিশেষ অবস্থার বা মতবাদের এই দাসত্বকে অস্বীকার করবো আমরা। তবে কি এই অস্বীকার করাটাই হবে আমাদের মতে স্বাধীন শিল্পী-সাহিত্যিক-সমালোচকের কাজ ? এই নেগেটিভ কর্ম-প্রণালী সৃজনশীল কোনো পন্থা নয়। ফলে, এটা ত্যাজ্য। আমাদের ইচ্ছায় বহুযুগের ধর্মীয়, রাজকীয় তথা দরবারী আমল পেরিয়ে আজ যে স্বাধীন মর্ত্যভূমিতে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন মাটির সন্তান শিল্পীদল, তাঁরা যেন সকলের এই স্বাচ্ছন্দ্য-হাটেই অতঃপর বসেন পসরা সাজিয়ে। তাতে কোনো মতবাদ যদি গ্রহণ করতেই হয় তাঁদের তবে তা হবে সভ্যতর, পূর্ণতর জীবনের মন্ত্র। এই মন্ত্রের মানুষ ক্লাইভ বেল-বর্ণিত সেই সভ্য মানুষ। যাকে পূর্ণ হতে হলে হতে হবে উন্মুক্তদ্বার। রাশিয়া-আমেরিকার মানুষ, আফ্রিকার নিগ্রো, অস্ট্রেলিয়ার বুশম্যান সকলের সমান দাবি থাকবে তাঁর মনের পর্দায় প্রতিফলন করার। ইচ্ছামতো গ্রহণ-বর্জনে সক্ষম থাকবেন তিনি। এবং সে গ্রহণে এমন কোনো নীতিবোধ বা গোঁড়ামি বাধা দিতে পারবে না তাঁকে যা দু'শ বা দু' হাজার বছর আগে ছিল প্রগতির বিপক্ষে।

এককথায়, যেহেতু আমরা স্বীকার করি, পৃথিবীতে বহু দেশ সভ্য দেশ হওয়া সত্ত্বেও সভ্যতা সকলের সাধনা, সেই হেতু সভ্য এবং সংস্কৃতিবান মানুষ হিসাবে নিজের নামে এবং অবশিষ্ট সমাজের জন্য সেই সভ্যতার সাধনাই আজকের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিবানের সাধনা।

সমাজ-জীবনের বিকাশ-সাধনে

ব্যক্তি-মানুষ নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। এবার সমষ্টি-মানুষের কথা। নিজেরই প্রয়োজনে মানুষ শুধু ব্যক্তি-মানুষ হয়ে তৃপ্ত থাকতে পারেনি, সমষ্টির সঙ্গমেই তার অন্যতম সার্থকতা সে উপলব্ধি করেছে। এর মধ্যে স্বার্থপরতা অবশ্যই ছিল—তা হলো নিজের বাঁচবার তাগিদ। কিন্তু এ স্বার্থপরতাটুকু না থাকলে তো মানুষ আজ পৃথিবীতে আধিপত্য করারই সুযোগ পেত না।

আজ এ-কথা প্রমাণিত সত্য যে, মানুষ ধাপে-ধাপে অগ্রসর হয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁচেছে। খুব নীচের দিকে শুরু হয়েছিল আমাদের প্রচেষ্টা[১], আর আজ মহাকাশেও মানুষের কীর্তির বিজয়বৈজয়ন্তী উড়ছে। মানুষের প্রতিটি কীর্তি, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসই এই ক্রমবিকাশের ইতিহাস। সমাজ-জীবনের বিকাশ-সাধনের মধ্যেও এই ধারার পরিচয় মিলবে। আমরা দেখতে পাব, কিভাবে লক্ষ লক্ষ অজ্ঞাতপরিচয় মানুষের পরিশ্রমে গড়ে উঠলো আমাদের সভ্যতা।[২]

প্রাণধারণের তাগিদেই মানুষকে যূথবদ্ধ হতে হয়েছিল। কিন্তু একত্র হওয়ার জন্য একটা সম্পর্কের ভিত্তি প্রয়োজন। নৃতত্ত্ববিদ্ মর্গান দেখিয়েছেন যে, মানুষ প্রথম একত্র হয়েছিল জ্ঞাতিসম্পর্কের ভিত্তিতে :

---

১ Whiteny's *Oriental and Linguistic Studies* দ্রষ্টব্য

২ Dr J. Kaines : *Anthropologia*, Vol. I

'The organization into gentes on the basis of Kin naturally suggests itself as the archaic framework of ancient society.'[৩] এই সম্পর্কের মূল কথা হলো একে অপরের জ্ঞাতি, একই পূর্বপুরুষ থেকে তাদের জন্ম। এমন সম্প্রদায়গুলিকে মর্গান Gens নাম দিয়েছেন। Gens শব্দটি ল্যাটিন। এর গ্রীক ও সংস্কৃত প্রতিশব্দ যথাক্রমে Genos ও গণ। Gens শব্দটি অবশ্য অধুনা চলে না। পরবর্তী বিজ্ঞানীরা Gens-এর পরিবর্তে Clan শব্দটি চালু করেন। কিন্তু জ্ঞাতিসম্পর্কের চেয়েও পুরোনো আর একটা ভিত্তি আছে, তা হলো যৌন সম্পর্কের ভিত্তি এবং মর্গানের মতে 'It seems to contain the germinal principle of the gens.'[৪] মানুষের বন্যদশার গোড়ার দিকে দেখা যায়, স্ত্রী ও পুরুষের পৃথক পৃথক যূথ এবং তাদের ঘিরেই সমাজ-ব্যবস্থার সর্বপ্রথম স্তর। অস্ট্রেলিয়ার এক শ্রেণীর আদিবাসীদের মধ্যে এখনও এই ধারাই প্রচলিত।

প্রত্যেক ক্লান বা গেনসেরই পৃথক-পৃথক নাম থাকত। স্থান বা মানুষের নামানুসারে নয়, জন্তু-জানোয়ার বা গাছ-ফুল ইত্যাদি থেকে নাম নির্বাচিত করা হতো এক-একটি গোষ্ঠীর। কোনো গোষ্ঠীর নাম হতো হাতী দিয়ে, কারো বা হরিণ দিয়ে। যে প্রাণী বা বৃক্ষ বা ফুল অনুসারে কোনো গোষ্ঠীর নাম হতো, সেইটিই হতো সেই গোষ্ঠীর উপাস্য। এই টোটেম-বিশ্বাস আদিম মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। (মনে হয়, এক হিসাবে এই টোটেম-বিশ্বাস আজও মানুষের মনে ক্রিয়াশীল।[৫] না হলে আজও রাশিয়ার প্রতীক ভালুক, অস্ট্রেলিয়ার ক্যাঙ্গারু বা ভারতের প্রতীক হাতী হয় কেন?) কয়েকটি ক্লান

---

৩ L. H. Morgan: *Ancient Society*, Part III, p 47, Indian Edn., 1958

৪ Morgan: *Op. Cit.*

একত্র হয়ে যে বৃহত্তর গোষ্ঠী গঠন করে, তাকে বলা হয়েছে ট্রাইব (Tribe), এবং কতকগুলি ট্রাইবের সংঘকে বলা হয়েছে কনফেডারেসি অফ ট্রাইবস।

এই সময়কার সামাজিক অবস্থার একটি ছবি আঁকবার মতো উপাদান এখন আমাদের হাতে আছে। এক-একটা ট্রাইবে লোক যে খুব বেশী থাকত, তা নয়। আর সেই লোকদের খাদ্য-সংগ্রহের প্রধান উপায় ছিল শিকার ও ফল-মূল সংগ্রহ করা। তখন থেকেই স্ত্রী-পুরুষেব মধ্যে কাজেব ভাগাভাগি চোখে পড়ে। পুরুষের কাজ বাইরে, স্ত্রীর ঘরে। পুরুষ করে শিকাব, যুদ্ধ, আর স্ত্রী করে গৃহস্থালির কাজ। কিন্তু পুরুষরা শিকাব করে বললেই সব বলা হয় না; এ-কথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে, তারা শিকার করতো দল বেঁধে এবং দল বেঁধে যা শিকার করতো তা সকলে মিলে ভাগ করে নিত। এই জিনিসটি থেকেই আমরা ঐ সময়কার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যের সূত্র পাচ্ছি। তখন সব-কিছুর উপরই ছিল সকলের যৌথ অধিকার, যাকে বলা যায় primitive communism অর্থাৎ আদিম সাম্যতন্ত্র। যা-কিছু তৈরি হয় তার সব কিছুই সকলের সম্পত্তি। অর্থাৎ, ব্যক্তিগত সম্পত্তিব যুগ তখনও শুরু হয়নি। ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিয়ে বর্তমানের মারামাবি, লাঠালাঠির দিনে ট্রাইবাল সমাজের এই আদিম সাম্যতন্ত্রকে নিশ্চয় আশীর্বাদস্বরূপ বলেই আমাদেব মনে হবে।

কিন্তু আমাদের আলোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ সমাজের বড় বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, আজ যাকে আমরা সরকার বলি তার উৎসের সন্ধান পাওয়া যায় এই গেনস্ গঠনের সময় থেকেই। এর সূচনা থেকে শুরু করে সভ্য দশার রাজনৈতিক সমাজ পর্যন্ত সময়কে তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করা চলে। প্রথম অধ্যায়ে দেখা যায় একটা

শাসন-পরিষদ্। সেই পরিষদে মোড়লরা নির্বাচিত হতো। মানুষের বর্বরদশার[৫] নিম্ন অবস্থায় বিভিন্ন ট্রাইবের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ে এসে মোড়লদের পরিষদ্ ছাড়া সরকারের মধ্যে আরো একজনকে দেখা গেল: তিনি সামরিক অধিনায়ক। এই অধিনায়কের মধ্যেই পরবর্তী কালের রাজা, সম্রাট ও প্রেসিডেন্টের সূচনা। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরু হয় বলতে গেলে বর্বরদশার শুরুতেই—কিন্তু নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে বর্বরদশার মাঝামাঝি সময়ে এসে। আর তৃতীয় অধ্যায়ে দেখতে পাচ্ছি তৃতীয় আর একটি জিনিসের আবির্ভাব: তা হলো গণপরিষদ (an assembly of people)। বর্বরদশার শেষভাগে এর উদ্ভব। জনগণের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং সম্পদসৃষ্টিই এর মূল কারণ। কোনো ব্যবস্থা গৃহীত হবে কি হবে না, সে-বিষয়ে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ভার এই গণপরিষদের। মোড়লদের পরিষদ্ কোনো প্রস্তাব এই গণপরিষদের কাছে পেশ করলে, তা গ্রহণ বা বর্জনের শেষ ভার এই গণপরিষদের। এই মোড়লদের পরিষদ এবং গণপরিষদই ক্রম-বিবর্তনের পথে বর্তমান পার্লামেন্টের উচ্চতর সভা ও নিম্নসভার (যেমন হাউস অফ লর্ডস বা রাজ্যসভা এবং হাউস অফ কমন্স বা লোকসভা) রূপ নিয়েছে।[৬]

এখানে অত্যন্ত সংক্ষেপে এই ইতিহাসকে বিবৃত করা হলো বলে ধারণা হতে পারে যে, এ-সবই খুব অল্প সময়ের মধ্যে এবং যেন পূর্বনির্দিষ্ট গতিতে ঘটে গেছে। বস্তুত কিন্তু তা নয়। এই তিনটি অধ্যায়ের মধ্যে বহু সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে।

আগে যে ট্রাইবাল সমাজের আদিম সাম্যতন্ত্রের কথা বলেছি,

---

৫ বলে রাখা ভালো যে, মানুষের ইতিহাসের ধারায় বন্যদশা, বর্বরদশা ও সভ্যতা—এই তিনটি ক্রমিক অধ্যায়কে আমরা আলোচনার ভিত্তি বলে ধরে নিয়েছি। *Cf.* Gordon Childe : ***What Happened in History.***

৬ Morgan : ***Op. Cit.***

তার অবসানের সূচনা হয়েছে চাষবাস ও পশুপালন করতে মানুষ যখন শিখেছে তখন থেকে। মানুষকে যখন দল বেঁধে খাদ্য সংগ্রহ করতে হতো, তখন ছিল আমরা যাকে দিন-আনা-দিন-খাওয়া বলি সেই অবস্থা। কিন্তু পশুপালন আর কৃষির আবিষ্কারের পর থেকে এ-ক্ষেত্রে যেন বিপ্লব এসে গেল। এটাকে বিপ্লব বলা হচ্ছে কারণ, এই সময় মানুষের হাতে এল উদ্‌বৃত্ত খাদ্য। আর শুধু পশুপালন বা কৃষি নয়, কাপড় বোনা, ধাতু-বিদ্যার আদিপর্ব প্রভৃতি অনেক কিছুরই আবিষ্কার এই সময়ে (বর্বরদশার মধ্যভাগে) হয়েছে। এই অবস্থাকে বিপ্লব বলার আরো কয়েকটি কারণ আছে (যদিও দেখা যায় যে, সব কারণগুলিই পরস্পর সম্পৃক্ত)। সেগুলো হলো, এই সময়ে মানুষের যাযাবর দশার অবসান, ব্যক্তিগত সম্পত্তির সূচনা এবং দাস-প্রথার আরম্ভ। এই সময় সমাজে এমন এক শ্রেণী দেখা দিল, যারা খাওয়া-পরার জন্য নিজেরা পরিশ্রম না করেও অন্যের পরিশ্রমের ফলভোগ করে নিশ্চিন্তে দিন কাটাতে পারে।[৭] তখনই হলো শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের সূচনা। দেখা দিল দুটি শ্রেণী : একদল শোষণ করে এবং অপর দল শোষিত হয়।

আর আদিম সাম্যতন্ত্রের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে যেমন দেখা গেল ব্যক্তিগত মালিকানা, তেমনই ক্লানের অবসানও ঘনিয়ে এলো। দেখা দিল পরিবার।

মানুষের পারিবারিক জীবন-যাত্রার আরম্ভ অবশ্য বিবাহ-ব্যবস্থার মাধ্যমে। বিবাহ এমন একটা সামাজিক রীতি, যাকে ভিত্তি করে মানুষ সুদীর্ঘ কাল ধরে তার যৌন, জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক সকল তাগিদের একটা সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা করে আসছে। প্রগতিশীল বিবর্তনধারায় নরনারীর প্রেমের একটা সুষ্ঠু পরিণতি এই

৭ অমিত সেন—ইতিহাসের ধারা

বিবাহ, যদিও অনেক ক্ষেত্রে বিবাহের পর থেকেই বিবাহিত নরনারীর মধ্যে পারস্পরিক প্রেমের সূত্রপাত ঘটে থাকে। একবিবাহ প্রথায় এসে পৌঁছুবার পূর্বে এই বিবাহ-পদ্ধতিকে অনেকগুলো স্তর পেরিয়ে আসতে হয়েছে এবং এরূপ মনে করার কোনোই কারণ নেই যে, বিবাহ-অনুষ্ঠান তথাকথিত সভ্য জগতের একটি আবিষ্কার এবং সভ্য মানুষদের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ। স্নেহ-প্রেম, সৌন্দর্য-প্রীতি এবং দুঃখ-বেদনা প্রভৃতি মৌলিক আবেগ ও বৃত্তিনিচয় অসভ্য-আদিম মানুষদের মধ্যেও সমভাবেই বিদ্যমান এবং অনুষ্ঠানগত পার্থক্য থাকলেও বিবাহ-প্রথা আদিম সমাজেও বহু প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত। বস্তুতপক্ষে আদিবাসীরা অন্যান্য ক্ষেত্রে যত পশ্চাদ্‌পদই হোক না কেন, দাম্পত্যনিষ্ঠায় তারা সভ্য জগতের কাছে আদর্শস্বরূপ বলে আদিম জাতি-বিশেষজ্ঞ ভেরিয়ার এলুইন যে মন্তব্য করেছেন, তা মোটেই বাড়িয়ে-বলা কথা নয়। তিনি বলেছেন,

'Domestic fidelity is another virtue in which the real primitives might stand as an object lesson to the whole world.

মোটামুটি সমগ্রভাবে ভারতের সকল শ্রেণীর আদিম অধিবাসীদের সম্পর্কে এ-কথা প্রযোজ্য হলেও, তাঁর এই বক্তব্যের সমর্থনে তিনি একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন,

'When I recently conducted a survey of domestic life among the Murias of Baster State, I found that out of 2000 marriages examined, all but 43 husbands were living with their own original wives. Adultery was almost unknown and divorce exceptional.'

আর এটা যে শুধু ভারতীয় আদিবাসীদের বেলাতেই সত্য তাও নয়, অন্যান্য দেশের আদিম অধিবাসীদের দাম্পত্য জীবনেও অনুরূপ প্রেমনিষ্ঠার সন্ধান পাওয়া যায়। এখানে নিউ সাউথ ওয়েলস্-এর

৮ Varrier Elwin : *Aboriginals* Oxford University Press

দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। সে দেশের আদিবাসী স্বামীরা যেন ধরাবাঁধা নিয়মানুসারেই পত্নী-প্রাণ এবং তাদের স্ত্রীরাও স্বামীদের একান্ত অনুগত ও প্রেমানুরক্ত।[১]

এ থেকেই দেখা যাচ্ছে, বিবাহ-ব্যবস্থা ও শান্তিপূর্ণ পারিবারিক জীবন শুধুমাত্র সভ্য জগতের মানুষেরই একচেটিয়া নয়, তথাকথিত আদিম অসভ্যদের মধ্যেও এ প্রথা দৃঢ়মূল এবং এ থেকে এ প্রমাণও পাওয়া যায় যে, বিভিন্ন দেশের আদিবাসী সমাজের মধ্যেও একটা সুপ্ত সাংস্কৃতিক চেতনা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাদের প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

'বিবাহ ও পরিবারের ক্রম-বিকাশ' সম্বন্ধে এক দীর্ঘ ও যুক্তিসহ আলোচনায় বিদগ্ধ মনীষী অনিলচন্দ্র রায় দেখিয়েছেন যে, 'দাম্পত্য প্রেম অসভ্য আদিমদের জীবনেও আছে' এবং সুপ্রাচীন গ্রীস, রোম, চীন প্রভৃতি দেশের পারিবারিক জীবনের ভিত্তিও এই দাম্পত্য প্রেম। জীবনে এবং সাহিত্যে প্রেমের ক্ষেত্রে নানা বিকৃতির পরিচয় পাওয়া গেলেও, তা দেখিয়ে সমাজে দাম্পত্য প্রেমের অভাব প্রমাণ করতে যাওয়া বাতুলতা বলে শ্রীরায় যে মন্তব্য করেছেন, তা খুবই যুক্তিযুক্ত। বাস্তবিকই সারা পৃথিবী জুড়ে বিবাহ-বন্ধনের এই যে একটি সামাজিক রীতি যুগ-যুগান্ত ধরে চলে আসছে, মানুষের সমন্বিত সাংস্কৃতিক চিন্তার এ একটা বড় পরিচয়।

পরিবার বলতে আমরা এখন অবশ্য একটি পুরুষের সঙ্গে একটি স্ত্রীর বিয়ের সম্পর্ককেই বুঝি। দীর্ঘদিন আমরা এই ধারণা পোষণ করে এসেছি যে, স্ত্রী-পুরুষের এই এক-বিবাহ সম্পর্কই যেন আদিম ও চিরন্তন। আসলে কিন্তু যে তা নয়, বিজ্ঞানীদের আধুনিক গবেষণায় তা প্রমাণিত হয়েছে। দেখা গেছে যে এই এক-বিবাহের

১ Hill & Thornton : *Aborigines of New South Wales*

সম্পর্ক (monogamian) বিবাহধারার বিকাশের সর্বশেষ পর্যায় এবং এর শুরু বর্বরদশার দ্বিতীয় ভাগে। আর একটি ভুল ধারণাও হয়তো থাকা সম্ভব। তা হচ্ছে এই যে, এই পরিবার যেন চিরকালই পিতৃকেন্দ্রিক ছিল। প্রকৃতপক্ষে এই পর্যায়েরও শুরু বর্বরদশার শেষভাগে। এই এক-বিবাহ ও পিতৃকেন্দ্রিক পরিবার একান্তভাবেই আধুনিক।

নরনারীর সম্পর্কের ধারাকে নৃবিজ্ঞানী মর্গান[১০] পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। তার প্রথমটির নাম দেওয়া হয়েছে Consanguine family—এই অবস্থায় যূথবদ্ধভাবে ভাইদের সঙ্গে বোনেদের বিবাহ প্রচলিত ছিল। ভাই-বোন বলতে অবশ্যই শুধু নিজের ভাই-বোন নয়, সম্পর্কিত ভাই-বোনও বটে। তার পরে এল Punaluan family মর্গানের ভাষায় :

'It was founded upon the inter-marriage of several sisters, own and collateral, with each other's husbands in a group. Also, on the intermarriage of several brothers, own and collateral, with each other's wives, in a group...'

অবশ্য, উভয় ক্ষেত্রেই এমন কোনো কথা নেই যে, স্বামীদের বা স্ত্রীদের পরস্পরের জ্ঞাতি হতেই হবে। তৃতীয় পর্যায়ে এসে আমরা নরনারীর আধুনিক সম্পর্কের সূচনা দেখতে পাই। তখন থেকে কোনো কোনো পুরুষ ও মেয়ে পৃথকভাবে জোড় বাঁধতে আরম্ভ করে। কিন্তু তখনও সহবাসের exclusive অধিকার চালু হয়নি। কোনো পক্ষেরই কোনো রকম বাধ্যবাধকতা থাকত না। এই পরিবারকে বলা হয়েছে Syndyasmian বা Pairing family। এর পরের অধ্যায়ে এসে পাচ্ছি পিতৃকেন্দ্রিক পরিবার বা Patriarchal family। এই অবস্থায় একটি পুরুষের সঙ্গে বহু নারীর বিবাহ হতো। আর Monogamian

১০ *Op. Cit.*, pp. 393 ff

family বা এক-বিবাহকেন্দ্রিক পরিবার হলো বিবাহ-ধারাবিবর্তনের সর্বশেষ অধ্যায়। এই অধ্যায়ে এসে একটি পুরুষের সঙ্গে একটি নারীর বিবাহই শুধু নয়, সহবাসের exclusive অধিকারও পাওয়া গেল।

এখানে বিবাহের যে পাঁচটি পর্যায়ের কথা উল্লেখ করা হলো, তার প্রথম তিনটির মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য ছিল তার উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই তৃতীয় পর্যায় পর্যন্ত দেখা যায় যে, বংশ-পরিচয় হচ্ছে মায়ের দিক থেকে। যদি ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকত, তাহলে পিতার সম্পত্তিও ছেলে পাবার অধিকারী ছিল না। মাতার দিক থেকে বংশ-পরিচয় হবার ফলে সম্পত্তিব উত্তরাধিকারে দেখা যায় মাতার দিকের প্রাধান্য। জীবনযাত্রার পদ্ধতিকে কেন্দ্র করেই এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। ব্যক্তিগত মালিকানা প্রবর্তিত হবার আগে পর্যন্ত জীবনযাত্রার অনেক অপরিহার্য কাজের ভার থাকত মেয়েদের হাতে, তার ফলেই দেখা দিয়েছিল মেয়েদের প্রাধান্য। ইংরাজিতে এই অবস্থা বোঝাতে 'মাদার-রাইট' শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নরনারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রেও রীতিমতো বিপ্লব ঘটে গেল বলা চলে। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সব-কিছুই প্রায় তৈরী হচ্ছে পুরুষের হাতে, তার ক্ষমতা হয়েছে অপ্রতিহত, আর নারীর প্রাধান্য খর্বিত। তখন থেকেই দেখা দিল পিতৃকেন্দ্রিক পরিবার।

সমাজ-বিকাশের ধারায় তাহলে দুটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় দেখা দিল; পরিবার ও ব্যক্তিগত মালিকানা। ক্রমশ দেখা গেল যে, সমাজ-জীবনের বিকাশে ব্যক্তিগত মালিকানা একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে।

মানুষের জীবনধারণের জন্য যে সকল উপকরণ প্রয়োজন, এতদিন

পর্যন্ত তাতে ছিল গোষ্ঠীর সকলের অধিকার। কিন্তু ক্রমশ নগর-ব্যবস্থার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে, এইসব উপকরণ নির্মাণের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা কায়েম হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে, কৃষি ও পশুপালন শুরু হবার পর থেকে মানুষের হাতে উদ্‌বৃত্ত কিছু জমছে। এই উদ্‌বৃত্ত অপর কোনো লোকের পক্ষে দখল করা সহজ হয়ে উঠলো। এর পর থেকেই মানুষের সম্পদ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তার সবই ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে।

ব্যক্তিগত মালিকানার সূত্রেই আরো দুটি জিনিস দেখা দিয়েছিল, যার ফলে রাষ্ট্রের সূত্রপাত। তার প্রথমটি হলো জমি দখলের জন্য লুঠপাট ও মারামারি। স্বভাবতঃই এ-ব্যাপারে গায়ের জোরেই সব-কিছুর মীমাংসা হতো। যার দল ভারী ও জোর বেশি, সে ক্রমশ বেশী জমি ও সম্পত্তি দখল করতে থাকে। পরে যিনি রাজা বলে পরিচিত হলেন, তাঁর সূচনা এই ভাবেই। দ্বিতীয়টি হলো এই: ব্যক্তিগত মালিকানার আমলে ব্যবসায়-বাণিজ্য শুরু হয়। এর পূর্ব পর্যন্ত মানুষ যা নির্মাণ করেছে তার দ্বারা সে শুধু নিজের প্রয়োজন মিটিয়েছে। কিন্তু ব্যবসায়-বাণিজ্য শুরু হবার পর মানুষের তৈরী দ্রব্যাদি লেনদেনের পণ্য হয়ে উঠেছে। আজ যে মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠেছে ক্রমশ অধিক পরিমাণে পণ্য উৎপাদন করা, তার সূচনা সেই সময়েই হয়েছে। ধনতান্ত্রিক সমাজও সেই সময় থেকেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পণ্যের মালিকরা ক্রমশ ধনী হতে থাকে এবং যারা পণ্য তৈরী করে তারা ক্রমশঃ বিত্তহীন হতে থাকে।

এই সময়েই রাষ্ট্রের সূচনা। পূর্বোক্ত ব্যবস্থা যাতে অব্যাহত থাকতে পারে, তার জন্য কতকগুলো বিধান তৈরী প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু শুধু বিধান প্রণয়ন করলেই হয় না, সেই বিধান সকলে

মেনে চলছে কি-না, তা দেখাশোনার জন্য একটি সংস্থারও প্রয়োজন। সেই সংস্থার নামই রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্র শুধু বিধানগুলোই প্রয়োগ করবে না, আইন-লঙ্ঘনকারীকে শাস্তিদানের দায়িত্বও তার। আরো একটি দায়িত্বও তার রয়েছে। তা হলো কোনো বিপদ ঘটলে তার মধ্যস্থতা করা।

অর্থাৎ, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রাষ্ট্র সূচনায় খুব বিরাট একটা কিছু ছিল না। কিন্তু ক্রমশ সেই রাষ্ট্রই শক্তিশালী হতে হতে আজ সর্বশক্তিমান হয়েছে—এবং অনেক দেশে সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে।

এই আলোচনা থেকে অন্তত এটুকু স্পষ্ট হবে যে, সমাজ-বিকাশের ধারায় ক্রমাভিব্যক্তির মতবাদকেই আমরা মেনে নিয়েছি। সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের ব্যাখ্যায় ক্রমাভিব্যক্তি ব্যতীত আরো অনেক মতবাদই প্রচলিত আছে এবং সেগুলোর সঙ্গে আমরা অল্প-বিস্তর পরিচিত। স্বর্গীয় অধিকারের (Divine Right) মতবাদ, দণ্ড-শক্তির (Force) মতবাদ, সামাজিক চুক্তির (Social Contract) মতবাদ ইত্যাদি। মতবাদ হিসাবে এগুলো আকর্ষণীয় হতে পারে, কিন্তু এ-সবের ত্রুটি এই যে, এগুলোর মধ্যে কোনোটি একান্তই হাস্যকর (যেমন স্বর্গীয় অধিকারের মতবাদ) এবং অন্যান্যগুলো আলোচনা করলে মনে হবে যে, এইসব মতবাদের সঙ্গে প্রকৃত ঘটনার কোনো যোগাযোগ নেই—মনে হবে যেন এগুলো বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া। নানা দার্শনিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের ধারা সম্পর্কে আরো নানা অভিমত ব্যক্ত করেছেন, সে-সব বিষয়ে বিশদ আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। আমরা ক্রমাভিব্যক্তির মতবাদ মেনে নিয়ে এইটুকুই দেখাতে চেয়েছি যে, মানুষ আদিতে সকলেই গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বাস করেছে এবং পরে জীবনযাত্রার ধারা পরিবর্তিত হওয়ায় পুরাতন গোষ্ঠী ছেড়ে ছোট ছোট পরিবারে বিভক্ত হয়েছে, কিন্তু তবু

সামগ্রিক নিরাপত্তার জন্য এমন এক জায়গায় এসে মিলিত হয়েছে—যেটি হলো রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রগঠনের মধ্য দিয়ে মানুষের যে মনোভাব ফুটে ওঠে, তা হলো সব মানুষে মিলে একসঙ্গে শান্তিতে ও সমৃদ্ধিতে বেঁচে থাকার বাসনা। আর এই বাসনার গোড়ায় আদি থেকেই কাজ করে চলেছে মানুষের মূলগত সমন্বয়মুখী সংস্কৃতিবোধ। সেইজন্যই সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে মানুষের রাষ্ট্রগঠন একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মানব-সংস্কৃতির জয়যাত্রা এমনিভাবেই ধাপে-ধাপে এগিয়ে চলেছে।

গণচেতনার উদ্বোধনে

সমগ্রভাবে মানব-সমাজের বিকাশ-সাধনই সংস্কৃতির অন্তিম লক্ষ্য। 'সমগ্র' কথার ব্যবহারে অর্থটা হয়তো কিছুটা অস্পষ্ট থাকতে পারে; সুতরাং বলা ভালো যে, প্রতিটি মানুষের বিকাশ-সাধনই সংস্কৃতির উদ্দেশ্য। এবং এ-কথাও যোগ করা প্রয়োজন যে, প্রতিটি মানুষের সার্থক বিকাশের মধ্য দিয়েই প্রকৃত সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে।

এখন, মানুষের বিকাশের পথ তো একটা নয়। নানা পথ ধরে তার ব্যক্তিত্বের মুক্তি। সেই নানা পথের মধ্যে রয়েছে বুদ্ধির চর্চা, রস-সম্ভোগ-ক্ষমতার অনুশীলন, জ্ঞানের অন্বেষণ, প্রকাশরীতির পরিশীলন, বিশ্ব-রহস্য উন্মোচনের প্রচেষ্টা। বিকাশের সমগ্রতার জন্য এর প্রত্যেকটিই নিজ নিজ কারণেই প্রয়োজনীয়। কিন্তু এক হিসাবে এ-কথা বলা অসঙ্গত নয় যে, এর সব-কিছুর পিছনেই কাজ করছে মানুষ সম্পর্কে উদগ্র কৌতূহল এবং মানুষের কল্যাণ-সাধনের বাসনা।

পূর্বে সাংস্কৃতিক সমগ্রতা অর্জনের যে সব পথের কথা উল্লেখ করেছি, তার সব কয়টিই ব্যর্থ হতে বাধ্য যদি না প্রতিটি মানুষ সম্পর্কে আত্মীয়তার মনোভাব তাব পিছনে ক্রিয়াশীল থাকে। ' কারণ, অপর মানুষকে না-জানা পর্যন্ত আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হতে পারে না। এই কথা স্বীকার করার মধ্যে এই কথারও স্বীকৃতি আছে যে, প্রতিটি মানুষই স্বতন্ত্র, অসামান্য। একজন মানুষের অভিজ্ঞতা আর অপর একজন মানুষের অভিজ্ঞতা হুবহু এক নয়, এবং স্বতন্ত্র মনোভাবের দরুন মানুষ ঐ অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে যে জীবন-চিন্তা গড়ে তোলে, তাও প্রতিটি ক্ষেত্রে পৃথক। সুতরাং অপর মানুষের সংস্পর্শে, তার

অভিজ্ঞতার, চিন্তার সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে আমাদের সংকীর্ণতা দূরীভূত হয়, আমাদের চিন্তাধারার মধ্যে ব্যাপকতা আসে। আর অপরেব চিন্তাধারা আমরা নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করতে পারি বলেই আমাদের বিকাশলাভের সম্ভাবনারও কোনো সীমা-পরিসীমা থাকে না।

এ-পর্যন্ত আলোচনায় নিশ্চয় এ-কথা অস্পষ্ট নেই যে, এখানে প্রতিটি মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও অসামান্যতার ওপরই আমরা গুরুত্ব আরোপ করেছি। কিন্তু এই কথা বলার মধ্য দিয়ে আমরা সমগ্র মানব-সমাজেব অন্তর্নিহিত ঐক্যের কথাকেও সুস্পষ্ট স্বীকৃতি দেওয়ার চেষ্টা করেছি। প্রতিটি মানুষই স্বতন্ত্র, আকবর বাদশা থেকে শুরু করে হরিপদ কেরানী পর্যন্ত সকলেরই একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে—এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও আমরা স্বীকার করে নিলাম যে, কোনো মানুষই হেয় নয়, প্রত্যেকেই সমান, সমান সম্ভাবনার আকর। প্রতিটি মানুষের স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে এই যে ঐক্যের স্বীকৃতি, একেই আমরা সংস্কৃতিবোধের শ্রেষ্ঠ পরিচয় বলে অভিহিত করবো।

মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয়ের যে প্রয়োজনীয়তার কথা ওপরে উল্লেখ করা হলো, সে প্রয়োজনীয়তা একটা অনিবার্য প্রক্রিয়া, তাকে ওপর থেকে কোনো মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনে তো বটেই, অপ্রয়োজনেও মানুষ মানুষের কাছে এগিয়ে আসে।

প্রয়োজনে মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলামেশার উদাহরণ আমরা পেয়ে আসছি মানবেতিহাসের আদি অধ্যায় থেকেই। তখন মানুষের যূথবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়েছে প্রাণধারণের তাগিদে, আত্ম-রক্ষার গরজে। এ-বিষয়ে বিশদতর আলোচনা পূর্ব অধ্যায়ে করেছি। সভ্যতার বিকাশ, অর্থাৎ মূলত বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নিছক আহার-সংগ্রহের প্রয়োজনে যূথবদ্ধ হওয়ার তাগিদ

ক্রমশ কমে গেছে, যদিও আত্মরক্ষার জন্য মানুষকে আজও গোষ্ঠীবদ্ধ হতে হয়।

কিন্তু এই স্পষ্টত প্রয়োজনাত্মক উদ্দেশ্য ব্যতীতও যে মানুষ মানুষের কাছে এসেছে, সেটাই আপাতত আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় কথা। এই অপ্রয়োজনের—অন্তত আপাতদৃষ্টিতে যাকে অপ্রয়োজন বলেই মনে হয়—আকর্ষণটা কি? খুব সংক্ষেপে বলা চলে যে, এই আকর্ষণটা অপর মানুষ সম্পর্কে জানবার কৌতূহল। এই কৌতূহল সব মানুষের মনেই ক্রিয়াশীল। আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অপর মানুষের সঙ্গে ভাব-ভাবনা বিনিময়ের সুযোগ লাভের ইচ্ছা, অভিজ্ঞতা আদান-প্রদানের বাসনা।

নানা প্রতিষ্ঠানের ছত্রতলেই মানুষ যুগে যুগে মিলিত হয়েছে। আমাদের দেশের পুরোনো চণ্ডীমণ্ডপ থেকে শুরু করে আজকের নানা সংঘ-সমিতি এই কথাই প্রমাণ করে যে, মানুষের অন্যতম পরিচয় এই যে, সে সামাজিক প্রাণী। অবশ্য, এ-কথা অস্বীকার করা অনুচিত যে, অপর মানুষ সম্পর্কে পূর্বোল্লিখিত কৌতূহল অনেক সময়েই পরচর্চার রূপ পরিগ্রহ করেছে। সেটা কৌতূহলের অসুস্থ রূপ, তা সমাজের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর। বলা বাহুল্য, আমরা কৌতূহল কথাটি পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে পৃথক, সুস্থতর অর্থে ব্যবহার করেছি।

মানবেতিহাসের আলোচনায় আমরা দেখতে পাই যে, ধর্মবিশ্বাস[১] মানুষের মিলনের একটা সাধারণ ক্ষেত্র সৃষ্টি করে দিয়েছে। যদিও সমগ্র পৃথিবীকে একটিমাত্র ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ করার চেষ্টা নানারূপ উৎসাহপূর্ণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাস্তব রূপ লাভ করেনি, তবু পৃথিবীর প্রধান

১ ধর্মের উৎপত্তিগত অর্থ, আমরা জানি, যা জীবনকে ধারণ করে থাকে। অর্থাৎ, সমগ্র জীবনে তা ব্যেপে থাকে। ইংরিজি Religion শব্দের অর্থ এত ব্যাপক নয়। এখানে ধর্ম বলতে আমরা Religion-ই মূলত বোঝাচ্ছি।

প্রধান ধর্মগুলি বহু মানুষকেই এক-একটি ধর্ম বিশ্বাসের পতাকাতলে এনে সমবেত করেছে। বৌদ্ধ ধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্মমত ও ইসলাম দেশের সীমারেখা মানেনি, সাগর পার হয়ে গিয়ে বহু মানুষকে আলিঙ্গন করেছে। আর হিন্দু ধর্ম যদিও মূলত একটি দেশের সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থেকেছে, তবু এই ধর্মপন্থীর সংখ্যা পৃথিবীর মোট জন-সমষ্টির এক উল্লেখযোগ্য অংশ।

অভিন্ন ধর্ম-বিশ্বাসের ভিত্তিতে মেলামেশার একটা বিশেষ সুবিধা এই যে, এতে একটা সাধারণ মানসিক আদর্শের ভিত্তি থাকে এবং সেই ভিত্তি থেকে সব-কিছু আলাপ, আলোচনা, অন্বেষণ শুরু হতে পারে। এই আলাপ-আলোচনা-সাধনার পশ্চাতে যদি সত্যই অন্বেষণের মনোভাব থাকে তবেই তাতে মানুষের প্রভূত কল্যাণ; কারণ, যে-কোনো সত্য ধর্মের প্রধান লক্ষ্যই মানুষের মঙ্গলসাধন।

কিন্তু ধর্মের এই পরম উজ্জ্বল সম্ভাবনাও যুগে যুগে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে এই কারণে যে, কোনো ধর্ম-বিশ্বাস যতই পুরাতন ও সুপ্রতিষ্ঠিত হতে থাকে, তাতে ততই আপ্ত-বাক্যের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। জিজ্ঞাসার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, শাস্ত্রোক্ত সত্যকেই বিচার-অবিচারের সম্পূর্ণ উর্ধ্বে বলে মেনে নেওয়া হয়। যে ক্ষান্তিহীন জিজ্ঞাসা মানুষের সভ্যতা-বিকাশের পশ্চাতে মূল কারণ, ধর্মের নামে তাকেই হত্যা করলে মানব-প্রগতির গতিকেই অবরুদ্ধ করা হয়। আর শুধু তাই নয়, এই বিচাববুদ্ধি ও জিজ্ঞাসাকে রুদ্ধ করার সুযোগে ধর্মক্ষেত্রে যারা উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত তারা খেয়ালখুশিমতো কাজ এবং মানুষের ওপর অত্যাচার করারও সুযোগ পায়।

এ-কথা কখনই আমাদের বলার উদ্দেশ্য হতে পারে না যে, বিশিষ্ট ও প্রাচীন ধর্ম-বিশ্বাসগুলোর মধ্যে সততাপূর্ণ ও সত্যকার মহৎ কিছু ছিল না। নচেৎ তারা এত বিপুলসংখ্যক লোককে আকর্ষণ

করবেই বা কি করে? রোমান যুগে খ্রীষ্ট ধর্ম যে এত দ্রুত প্রসারলাভ করেছিল, তার কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে গিবন তাঁর গ্রন্থে[২] বলেছেন যে, আদিতে খ্রীষ্টানদের নৈতিক আদর্শনিষ্ঠা রীতিমতো উল্লেখযোগ্য ছিল। আমাদের দেশেও প্রাচীন যুগের বিখ্যাত-স্বল্পখ্যাত নানা মানুষের মধ্যেই অপূর্ব ও প্রেরণাদায়ক নৈতিক নিষ্ঠার সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। ধর্মের সহজাত আকর্ষণ, অর্থাৎ একটা আস্থাজনক বিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণ-জাত মুক্তির আকর্ষণ ব্যতীত আদি যুগের এই সব মানুষের নীতিনিষ্ঠাও মানুষকে ধর্মের কাছে টেনেছে। তাছাড়া, যে-কোনো ধর্মের ব্যাপক প্রচারের জন্যই প্রয়োজন হয় ব্যাপক সংগঠন-কার্য। যেগুলিকে world religion বা আন্তর্জাতিক ধর্ম বলা হয়, তার সব কয়টির পিছনেই এই সুসংহত সংগঠন ছিল। বিশেষত খ্রীষ্ট ধর্মের প্রসারের পশ্চাতে প্রথমযুগে গীর্জার সংগঠন-কার্য তো রীতিমতই প্রশংসনীয়।

কিন্তু এ-সব প্রসঙ্গ ব্যতীতও মূলত যে কারণে ধর্মকে আমরা সংস্কৃতির অঙ্গ বলেছি, তা হলো এই যে, ধর্ম মানুষের মনের উন্নতি-সাধনে এবং বিকাশ-সাধনে সাহায্য করেছে। নিছক পার্থিবতা ও বৈষয়িকতার মধ্যেই যে মানব-জীবনের চরম সার্থকতা নয়, এ-কথাটা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

তথাপি, ধর্ম-বিশ্বাসের মধ্যে মানব-প্রগতির পক্ষে প্রতিকূল যে সম্ভাবনা উপ্ত ছিল, তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হয়েছে, পূর্বে তার উল্লেখ করেছি। অপরদিকে, নিছক পার্থিবতাই সত্য নয়, এ-কথাটার ওপর জোর দিতে গিয়ে সেখানেও ক্রমশ বিকৃতি দেখা দিয়েছে, আত্ম-বিকাশের চেয়ে আত্ম-নিগ্রহের ওপর জোর পড়েছে বেশী। এ-পৃথিবী মায়ামাত্র, অতএব মানুষের প্রকৃত আবাসে পৌঁছবার

২ *The Decline and Fall of the Roman Empire*

জন্য এ-পৃথিবীতে শুধু কষ্ট করে যাও—এই কথা প্রচারিত হয়েছে। সাধনার পক্ষে ত্যাগ ও তিতিক্ষা অবশ্য প্রয়োজন, কিন্তু এই কথাকে মূলধন করে ধর্মের নামে একদল লোক জন-সমাজের বৃহৎ এক অংশকে বঞ্চিত করে এসেছে, রুদ্ধ হয়েছে তাদের বিকাশের পথ।

এই প্রসঙ্গেই আর একটি কথা আসে, তা হলো সংস্কার ও সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্যের কথা। পার্থক্যটা হয়তো স্বতঃপ্রতীয়মান, তবু উল্লেখ করা প্রয়োজন। অধিকাংশ সংস্কারেরই জন্ম অন্ধ ধর্ম-বিশ্বাস থেকে, এবং তার পেছনে থাকে তথাকথিত শাস্ত্রের সমর্থন।

যেমন আমাদের দেশে ছিল সতীদাহের প্রথা। কোন্ কালে এই প্রথাব উদ্ভব তা জানি না, তবে একবার যখন প্রচলিত হয়েছে তখন যুগে-যুগে লোকে তা মেনে এসেছে, প্রশ্ন করেনি। কিন্তু জীবন্ত একটা মানুষকে হাত-পা বেঁধে দগ্ধ করাই যে নারীর সতীত্ব বজায় রাখার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা নয়, এটা কারুর চোখে পড়েনি। এর মধ্য দিয়ে এ-কথাই প্রমাণিত হয় যে, আমরা সেকালে ব্যক্তিকে মূল্য দিইনি, বিকৃত শাস্ত্রের অন্ধ নির্দেশের কাছে বলি দিয়েছি হাজার হাজার নারীকে। কিন্তু মুক্তবুদ্ধি রামমোহনের কাছে—যদিও তিনি ভারতীয়ই ছিলেন—এ-কথা মনে না হয়ে পারেনি যে, এই প্রথা ধর্মের নামে বর্ববতা ভিন্ন কিছু নয়। সতীদাহের বিরুদ্ধে তাঁর যে আন্দোলন তাকে আমরা সংস্কৃতিবোধজাতই বলবো; কারণ, এর পেছনে কাজ করেছে মুক্ত বিচারবুদ্ধি এবং ব্যক্তির মূল্যের স্বীকৃতি। ঈশ্বরচন্দ্রের বিধবা-বিবাহ চালু করার পেছনেও এই একই বোধ কাজ করেছিল।

মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের ফলে এই সব কুসংস্কার ক্রমশ বিদায় নিচ্ছে। কিন্তু দীর্ঘদিন এ-সব বজায় ছিল; কারণ, ধর্মবিশ্বাসের নামে বিচারবুদ্ধিকে রুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। এখনও গোটা পৃথিবী সম্পূর্ণভাবে এই সব কুসংস্কারমুক্ত হয়নি। তাছাড়া, অনেকে সংস্কৃতি

বলতে বহুকাল ধরে কোনো দেশে যা চলে আসছে, অর্থাৎ নানা সংস্কারকে (সুবিধামতো ঐতিহ্য আখ্যা দিয়ে) সংস্কৃতি বলে চালাতে চান। কিন্তু যা মানুষের মঙ্গল সাধন করে না, মানুষকে মূল্য দেয় না, তা যত দীর্ঘদিনই চলুক না কেন, তা সংস্কৃতি বলে অভিহিত হতে পারে না।

তবে চিরকাল ধর্মের নামে অন্ধতাকে মানুষ আঁকড়ে থাকতে বাধ্য থাকে না। সে তা থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা করবেই। যখনই মানুষ অন্ধতা ও গতানুগতিকতা থেকে সৃষ্টিশীলতা, স্বাধীনতা ও মুক্তবুদ্ধির মধ্যে মুক্তি চেয়েছে, তখনই সেই সময়কে আমরা নব-জাগরণের কাল বলে আখ্যা দিয়েছি। মধ্যযুগের আঁধারের পর ইয়োরোপের নবজাগরণের কথা সুপরিচিত, তা দিয়েই আমাদের বক্তব্য সুপরিস্ফুট করা যেতে পারে।

ঐতিহাসিক সন-তারিখের বিচারে অটোমান তুর্কীরা যেদিন কন্‌স্ট্যান্টিনোপল দখল করে, তখন থেকেই রেনেশাঁস বা নবজাগরণের কালের শুরু বলে ধরতে পারি। অর্থাৎ, ১৪৫৩ সাল। তুর্কীরা কন্‌স্ট্যান্টিনোপল দখল করার পর কন্‌স্ট্যান্টিনোপল-বাসী গ্রীক অধ্যাপক ও পণ্ডিতরা সব ইয়োরোপে চলে আসতে থাকেন। এঁদের এই ইয়োরোপ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন যুগেরও আগমন হলো। শুরু হলো গ্রীক সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা, আলোচনা। এর ফলে পুনরাবিষ্কৃত হলো গ্রীক সংস্কৃতির যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ : ব্যক্তির বিকাশের মূল্য ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা। এর পূর্ব-যুগে ধর্মান্ধতার ফলে জ্ঞানচর্চার যে পথ প্রায় রুদ্ধ হতে বসেছিল তা পুনরুন্মুক্ত হলো, চার্চের আওতা ছাড়িয়েও মানুষ জ্ঞানচর্চার সুযোগ পেল।

অবশ্য, এক হিসাবে ধরতে গেলে, ১৭ শতকের মাঝামাঝি থেকেই রেনেশাঁসের শুরু এবং আরো পিছিয়ে গিয়ে বলা চলে এর বীজ

উপ্ত হয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীরই মধ্যভাগে, যখন চার্চের প্রতিপত্তি আঘাতের সম্মুখীন হয়েছিল। তবু রেনেশাঁস বলতে আমরা পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে সতেরো শতকের শুরু পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ইয়োরোপে মানব-জীবনের বিভিন্ন বিভাগে যে নতুন উন্মেষ দেখা দিয়েছিল, তাকেই বোঝাব।

এই রেনেশাঁসের ইতিহাস দীর্ঘ, কীর্তিও নানামুখী। তার বিশদ আলোচনার স্থানাভাব। তবে এর মূল সুরটি সংক্ষেপে বিবৃত করা চলে। তা হলো এই যে, এই কাল মানবতাবাদ, যুক্তিবাদ ও প্রগতিবাদকেই প্রধান ধর্ম বলে স্বীকার করলে। চিন্তাধারা প্রবাহিত হলো পারলৌকিক দিক থেকে প্রধানত ইহলৌকিক খাতে। আত্ম-নিগ্রহের বদলে আত্ম-বিকাশই হয়ে দাঁড়াল মানুষের লক্ষ্য।

রেনেশাঁসের যুগে যে বৈশিষ্ট্যটি সবচেয়ে বড় হয়ে আমাদের চোখে পড়ে, তা হলো মানুষ সম্পর্কে তৎকালীন বিখ্যাত মানুষদের কৌতূহল। তখন সাহিত্য, চিত্রকলা, বিজ্ঞান সব-কিছুর মধ্যেই তার চিহ্ন সুপরিস্ফুট। শেক্সপীয়রের নাটকে, দ্য ভিঞ্চির শিল্পে, শারীর-বিজ্ঞানের চর্চার সূচনায় এ-প্রমাণ ছড়িয়ে আছে।

কিন্তু এই সময় আর একটি যে বড় ঘটনা ঘটেছিল, তা এই রেনেশাঁসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তা হলো মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার ও ছাপাব কাগজের প্রচলন। পূর্বে জ্ঞানের বিষয়বস্তু আবদ্ধ ছিল পুঁথির পাতায়। তা আর ক'জনের কাছে পৌঁছত? তার ওপব আবার চার্চের সঙ্গে যুক্ত না হলে, জ্ঞানার্জনের সুযোগ পাওয়া যেত না। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র উদ্ভাবনের পর পুস্তক-মুদ্রণ শুরু হওয়ায় সেই অসুবিধা দূরীভূত হলো। শুধু যে অধিকসংখ্যক লোক বিদ্যাচর্চার সুযোগ পেল তাই নয়, মনীষীদের প্রাগ্রসর চিন্তা সাধারণ মানুষের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ফলে, দূর হতে

লাগল নানা সংস্কার, প্রসার হলো মুক্তবুদ্ধির। এইভাবে ইয়োরোপে গণচেতনার প্রথম মহা উদ্বোধন ঘটলো। এখানে বিদেশী ঐতিহাসিক W. H. Mcneil-এর অভিমত উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

'The importance of printing and paper making was very great... The gap between intellectual leaders and the population at large could be narrowed and the rate of diffusion of new ideas and teachings could be correspondingly increased.'[৩]

বস্তুত, মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার ব্যতীত মানুষের আজকের সভ্যতাই সম্ভব হতো না। পুস্তক-পাঠের এই সুলভ পন্থা উদ্ভাবিত হওয়ার ফলে কত বৈপ্লবিক চিন্তাই না মানুষের মধ্যে ছড়িয়েছে! প্রথমে তা হয়তো দারুণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, আলোচনার ঝড় উঠেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা গৃহীতও হয়েছে। উদাহরণত, চার্লস্ ডারউইনের *Origin of Species* গ্রন্থের উল্লেখ করা যায়। মানুষের উদ্ভব নিয়ে তাঁর তত্ত্ব রীতিমতই বৈপ্লবিক, এবং যথারীতি তা আলোড়নেরও সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এই গ্রন্থ-প্রকাশের একশ বছরের মধ্যেই নির্দ্বিধায় তা গৃহীত হয়েছে, বাতিল হয়ে গেছে মানুষের উদ্ভব সম্পর্কে হাজার-হাজার বছর ধরে লালিত পৌরাণিক কাহিনী। অস্বীকার করা যায় না যে, এই একটি বই যে মানুষের সমস্ত চিন্তাধারাকে এত দ্রুত পাল্টে দিল, তার পিছনে রয়েছে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্য। একজন মনীষীর চিন্তা সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে কিভাবে প্রভাবিত করে, এইটি তারও এক উজ্জ্বল উদাহরণ। এমনই আরো নানা গ্রন্থই রয়েছে; তার মধ্যে কার্ল মার্কসের 'দাস ক্যাপিটাল'-ও অন্যতম।

যা হোক, আমরা রেনেশাঁসের কথায় ফিরে আসি। ইয়োরোপ ছেড়ে আমরা নিজেদের দেশের দিকে তাকালেও দেখতে পাই যে,

৩ *History : Handbook of Western Civilization*

এখানেও অশিক্ষা, দারিদ্র্য, কুসংস্কার, সমাজ ও শাসন-ব্যবস্থায় কায়েমী স্বার্থের আধিপত্য, বাদশাহ-নবাবের স্বেচ্ছাচার, পুরোহিত-মৌলবীর নির্দেশ-নির্ভর জীবন যখন চরম আকার ধারণ করলো, তখন তার অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় তার বিরুদ্ধে ক্রমশ সাড়া জাগতে আরম্ভ করলো। আর তখনই ঘটলো ইয়োরোপের নবসমৃদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়। যে ইংরেজের হাতে এল আমাদের পরাধীনতা, প্রধানত তাদের মাধ্যমেই আমরা ইয়োরোপকে চিনলাম। আর তার সাহায্যেই নতুন করে আবিষ্কার করা গেল নিজের দেশের ঐতিহ্যকেও।

ইয়োরোপের মতো বাঙলার নবজাগরণ স্বাভাবিক কারণেই এত ব্যাপক নয়। তবু সেদিন বাঙলার চিন্তা, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান সব-কিছুতেই যে নতুন ধারার সৃষ্টি হয়েছিল, এ-কথা আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য। তার ফলে দূর হয়েছে নানা কুসংস্কার, বিচারবুদ্ধির প্রসারও ঘটেছে ক্রমে।

বাঙলার এই নবজাগরণ যে বৃহত্তর জন-সমাজের মধ্যে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেনি, তার কারণ আমাদের তৎকালীন পরাধীনতা। তার ফলে শিক্ষার প্রসারও যথেষ্ট দ্রুত ঘটতে পারেনি, আর অবসান হয়নি দারিদ্র্যের। শুধু প্রাণধারণের সংগ্রামে বিপর্যস্ত অধিকাংশ মানুষ অন্যদিকে নজর দেবার তেমন সুযোগ পায়নি।

এখন, বৃহত্তর জন-সমাজের মধ্যে এই শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার বলতে আমরা কি বোঝাতে চাইছি, তারই আলোচনা করা যাক। শিল্পের ক্ষেত্রে যেমন কলাকৈবল্যবাদ প্রচলিত, তেমনই জ্ঞানার্জনের জন্যই জ্ঞানার্জন এমন ধারণাও কোথাও কোথাও রয়েছে। বলা বাহুল্য, শুধু বিদ্যার্জনের জন্যই বিদ্যার্জন এ-নীতিতে আমরা উৎসাহিত বোধ করি না। আমাদের মতে, বিদ্যার্জনের ও সংস্কৃতির প্রসারের মূল

উদ্দেশ্য হলো মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ, কুসংস্কার থেকে তার মুক্তির পথ প্রশস্ত করা, তার রস-সম্ভোগ-ক্ষমতার সূক্ষ্মতা-সাধন এবং প্রতিটি মানুষের স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে সমগ্র মানব-সমাজের ঐক্যের কথা উপলব্ধি করা। পূর্বে এ সবের কিছু কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। তার সঙ্গে এ-ও যোগ করা প্রয়োজন যে, প্রকৃত সংস্কৃতিবোধ মানুষকে নিজ অধিকার এবং ফলত নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। সংস্কৃতিবোধের প্রসারের মাধ্যমে গণচেতনার বিকাশের এইটি হলো অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফল। নিজের প্রকৃত অধিকার রক্ষার দায়িত্ব যেমন প্রতিটি মানুষের নিজের, তেমনই তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার কর্তব্য। সেই কর্তব্য তার রাষ্ট্রের প্রতি, তার সমাজের প্রতি, অপর মানুষের প্রতি। এবং এইভাবে সমগ্র বিশ্বের সাধারণ মনুষ্যত্বের প্রতি।

শিক্ষা-সংস্কৃতির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মানুষ নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছে। এর প্রধান প্রকাশ দেখা যাচ্ছে, দীর্ঘদিন অবহেলিত শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে। নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতাই তাদের অন্যায়ের প্রতিকারে সংঘবদ্ধ করেছে। অবশ্য, এই সংঘবদ্ধ শক্তির অপব্যবহার কোথাও ঘটছে না, এমন কথা ঠিক নয় ; তবু এই সংঘবদ্ধ শক্তি মূলত কল্যাণকর এবং বৃহৎ মানবগোষ্ঠীর উপকার সাধন করছে। এই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন অবশ্য একদিনেই এ-অবস্থায় এসে পৌছয়নি, তার পেছনে রয়েছে দীর্ঘকালের ইতিহাস। সে ইতিহাস প্রায় দু'শ বছরের তো বটেই। ইংলণ্ডের শ্রমিক-শ্রেণীর জাগরণের ইতিকথা আলোচনা করলেই এ-কথা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেখানে আমরা দেখি, নানা প্রতিকূলতা, বারংবার ব্যর্থতা ও পরাজয় এবং তার মধ্যেই ছোটখাটো সাফল্যের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে শ্রমিক মানুষের অধিকার ও আন্দোলন আজ বর্তমান রূপ নিয়েছে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারের ফলে কুসংস্কার দূরীভূত হওয়ার কথা আগে বলা হয়েছে। কুসংস্কার বলতে আমাদের অবশ্য প্রধানত ধর্মীয় কুসংস্কারের কথাই মনে আসে। ধর্মীয় কুসংস্কারে তো সব দেশের মানুষের মনই ভরে আছে, কিন্তু তাছাড়াও আছে নানা ধরনের কুসংস্কার। তার সবগুলিই ধর্মীয় নয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা বর্ণবিদ্বেষের, অর্থাৎ কালো চামড়ার মানুষের প্রতি একশ্রেণীর সাদা চামড়ার মানুষের ঘৃণার মনোভাব উল্লেখ করতে পারি। এটা কুসংস্কার; কারণ, এই বিদ্বেষ অহেতুক, কালো মানুষ যে সাদা মানুষের চেয়ে নিকৃষ্ট এমন কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই, তবু এই বিদ্বেষ পাশ্চাত্যের সাদা মানুষদের এক বৃহৎ অংশের মনে বাসা বেঁধেছে। এই মনোভাব সংস্কৃতিবান মানুষের নয়; কারণ, এর পেছনে রয়েছে মানুষের অন্তর্নিহিত মূল্যের অস্বীকৃতি। শিক্ষা ও সংস্কৃতিবোধ তখনই যথার্থ হয়ে ওঠে, যখন এই ধরনের কুসংস্কারকেও মানুষ কাটিয়ে উঠতে পারে।

প্রকৃত সংস্কৃতির আর একটি পরিপন্থী শক্তি হচ্ছে ইংরিজিতে যাকে বলা হয় Chauvinism। জাতি, ভাষা, ধর্ম—এর যে-কোনো কিছুকেই কেন্দ্র করে এই অত্যুৎসাহিতা ও স্বাজাত্যভিমান দেখা দিতে পারে। নিজের জাতি, ভাষা, ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান সকল মানুষই, কিন্তু সেই শ্রদ্ধা যখন শ্রেয়মন্যতার রূপ নেয় এবং অপর সব-কিছুকে নিকৃষ্ট ভাবতে শুরু করে, তখন তা অকল্যাণের জন্ম দেয়। মানুষের ইতিহাস এই ধরনের উদাহরণে ছেয়ে আছে। আর এর নৃশংস ও আত্মঘাতী রূপ তো আমরা দেখলাম হিটলারের মধ্যে। নাৎসী রক্ত আর ঐতিহ্যের গর্বে ঐ জার্মান একনায়ক লাখে লাখে ইহুদীকে হত্যা করলো, জগতে ছড়াল ধ্বংসের বীজ, সংস্কৃতিকে হত্যা করলো গলা টিপে। এই নৃশংসতার সাম্প্রতিকতম রূপ '৭১ সালেই

আমরা দেখতে পেয়েছি রক্তলোলুপ ভুট্টো-ইয়াহিয়া গোষ্ঠীর মধ্যে, যারা ধর্মের ধুয়া তুলে বাঙলা দেশের মানুষদের এতদিন আফিমের ঘোরে রেখে, শেষে জাগ্রত জনমতকে দাবিয়ে রাখতে চায় বন্দুক-বেয়নেটের পাশবিকতায়।

হিটলারের কথা প্রসঙ্গে যুদ্ধের প্রসঙ্গও এসে যায়। ইতিহাসে দেখা গেছে, কখনো কখনো অকল্যাণ প্রতিরোধে এবং ধর্মরক্ষার জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন হয়েছে; কিন্তু এ-কথাও সত্য যে, শুধু অকল্যাণ প্রতিরোধের সৎ বাসনাই যুদ্ধের পিছনে প্ররোচনা দেয় না। লোভ এবং হিংসাও সমানভাবে ইন্ধন জুগিয়ে চলে। এই যুদ্ধ যে কখনো সংস্কৃতিবান মানুষের কাম্য হতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। কারণ, যুদ্ধের ফলে ধ্বংস হয় মানুষের অমূল্য জীবন, বিনষ্ট হয় সভ্যতার সম্পদ যা মানুষের দীর্ঘ পরিশ্রমের সৃষ্টি।

যুদ্ধের অকল্যাণকরতা সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষ ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠছে। এও শিক্ষা এবং সংস্কৃতির প্রসারে গণচেতনাব উন্মেষের সুফল। সাধারণ মানুষের মধ্যে যুদ্ধের অপ্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটা সচেতনতা তো রয়েছেই, তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে মনীষীদের সতর্কবাণী। ফলে, যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব প্রবল-তর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যুদ্ধ যদি কোনো দিন পৃথিবী থেকে লোপ পায়, তবে এই জাগ্রত গণচেতনার জন্যই পাবে।

জাতীয় পটভূমিকায়

ব্যাপক একটি ধারণা রয়েছে, আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের জন্ম কোনো-না-কোনো সভ্যতা-ভিত্তিক। 'সভ্যতা' শব্দটির যুগপৎ একটি বিশিষ্ট ও বিবিধ অর্থ রয়েছে। পূর্বে তার বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, সভ্যতা একদিক থেকে একটা মস্ত যোগ-অঙ্কের ফলবিশেষ। জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত প্রাচীন কাল থেকে আজকের দিন পর্যন্ত দেশকালনির্বিশেষে সমুদয় মানুষের ঐতিহ্য ও আদর্শের যোগফল আমাদের এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা। সংস্কৃতি, প্রগতি ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত উপপত্তিক ধারণা থেকে শুরু করে সমাজ, রাষ্ট্র, সরকার যাবতীয়ই তার অঙ্গীভূত। বলা বাহুল্য, আমাদের জাতীয়তাবাদের ধারণাও তার বহির্ভূত নয়।

'জাতীয়তাবাদ' তথা 'জাতীয় মনোভাব' থেকেই 'জাতীয় সংস্কৃতি' কথাটির সৃষ্টি। একালের মানুষের মনে 'জাতীয়তাবাদ' নিঃসন্দেহে সবচেয়ে শক্তিশালী ভাব বা আইডিয়া। আজকের দিনে এর প্রকাশ যেমন যে-কোনো দিনের খবরের কাগজে স্পষ্ট, তেমনি অন্যদিকে তা বিশ্লেষণের পক্ষে বোধ হয় ঠিক ততখানিই দুরূহ। আমাদের চোখের সামনেই কত যুদ্ধ-মহাযুদ্ধ সংঘটিত হলো, কত রাজ্য-সাম্রাজ্য তচনচ হয়ে গেল এই জাতীয়তাবাদের উগ্র প্রেরণায় (কিংবা উন্মাদনায়)! ধর্ম বা সংস্কৃতিবোধ, সভ্যতা বা নীতিজ্ঞান জাতীয়তাবাদের সেই উগ্রতাকে কখনো প্রতিনিবৃত্ত বা প্রতিহত করতে পারেনি। ধর্ম এবং সংস্কৃতির মূল নির্দেশকে লঙ্ঘন করেই আজও তার অপ্রতিরোধ্য বেগ বিশ্বপ্রাঙ্গণে বিচরণশীল। কখনো ধর্ম, কখনো বা জাতীয় সংস্কৃতির

দোহাই দিয়ে এক এক দেশের শাসকগোষ্ঠী এক এক সময় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অশান্তির আগুন জ্বালিয়েছে। আসলে ক্ষমতা ও স্বার্থ-বিস্তারের লোভই এ-সবের প্রেরণা এবং এ দুই-ই যে ধর্ম ও সংস্কৃতিবোধের বিরোধী, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশই থাকতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথের 'অত্যুক্তি' প্রবন্ধে বিষয়টি সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। কবি লিখছেন: 'পৃথিবীতে এক-এক সময়ে প্রলয়ের বাতাস হঠাৎ উঠিয়া পড়ে। একসময়ে মধ্য এশিয়ার মোগলগণ ধরণী হইতে লক্ষ্মীশ্রী ঝাঁটাইতে বাহির হইয়াছিল। একসময়ে মুসলমানগণ ধূমকেতুর মতো পৃথিবীর উপর প্রলয়পুচ্ছ সঞ্চালন করিয়া ফিরিয়াছিল। পৃথিবীর মধ্যে যে-কোণে ক্ষুধার বেগ বা ক্ষমতার লালসা ক্রমাগত পোষিত হইতে থাকে, সেই কোণ হইতে জগদ্‌বিনাশী ঝড় উঠিবেই।

'প্রাচীন কালে এই ধ্বংসধ্বজা তুলিয়া গ্রীক-রোমক-পারসীকগণ অনেক রক্ত সেচন কবিয়াছে। ভারতবর্ষ বৌদ্ধ রাজাদের অধীনে বিদেশে আপন ধর্ম প্রেরণ করিয়াছে, আপন স্বার্থ বিস্তার করে নাই। ভারতবর্ষীয় সভ্যতায় বিনাশপ্লাবনের বেগ কোনোকালে ছিল না। ক্ষমতা ও স্বার্থবিস্তার ভারতবর্ষীয় সভ্যতার ভিত্তি নহে।

'ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি তাহাই। তাহা সর্বপ্রযত্নে নানা আকারে নানা দিক হইতে আপনার ক্ষমতাকে ও স্বার্থকেই বলীয়ান করিতে চেষ্টা করিতেছে। স্বার্থ ও ক্ষমতাস্পৃহা কোনো কালেই নিজের অধিকারের মধ্যে নিজেকে রক্ষা করিতে পারে না—এবং অধিকার লঙ্ঘনের পরিণামফল নিঃসংশয় বিপ্লব।...ইহা ধর্মের নিয়ম, ইহা ধ্রুব।' কবিগুরুর এই মন্তব্য সম্বন্ধে দ্বিমত থাকতে পারে না।

জাতীয় মনোভাব থাকা ভালো। জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণবোধও বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যে জাতীয় মনোভাব অন্য জাতিকে

হেয় প্রতিপন্ন করতে সর্বদা সচেষ্ট, অপর জাতির ঐতিহ্যকে সব সময় ছোট বলে প্রচার করতে হৃষ্টচিত্ত, তা আর যাই হোক, সংস্কৃতিসম্পন্ন মনোভাবের পরিচায়ক নয়। সংস্কৃতিবোধ যখন জাতীয়বোধকে পরিশোধনে অক্ষম হয়ে পড়ে, তখনই সে হয়ে ওঠে দুর্দমনীয় এবং তখনই সেই জাতীয়তাবাদ দানবীয় রূপ পরিগ্রহ করে পৃথিবীর কোথাও-না-কোথাও ভয়ঙ্কর লণ্ডভণ্ড কাণ্ড শুরু করে দেয়। কবে এবং কিভাবে চিরতরে এর অবসান ঘটবে, তা আমরা জানি না। কিন্তু কোথা থেকে এবং কি করে এই প্রচণ্ড শক্তির সূচনা হয়েছে, ইতিহাসের তা অজ্ঞাত নয়।

ভারতে এবং প্রাচ্যখণ্ডের অন্যান্য দেশে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে আজও যে 'জাতীয়তাবাদ' ক্রিয়াশীল, তা নিঃসন্দেহে ইয়োরোপের রপ্তানী। আফ্রিকায় সদ্যোজাত সেই জাতীয়তাবোধই পরদেশলোভী ইয়োরোপের বিরুদ্ধে দিকে দিকে আজ উদ্যতমুষ্টি এবং স্বদেশ ও স্বকীয় ঐতিহ্য রক্ষায় সম্পূর্ণভাবে বিদেশী শক্তি বিতাড়নে কৃতসংকল্প। আর ইয়োরোপে সে দানব আজ ফেরারী আসামীর মতো ছদ্মবেশে বিচরণশীল।

চিন্তাশীল সংস্কৃতিবান ইয়োরোপীয়গণের অনেকেই জাতীয়তাবাদের উগ্রতম রূপ দেখে ভাবিত হয়েছেন, কিন্তু তার বিপজ্জনক গতি প্রতিরোধে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। যখন দেখি যে, কঠিন 'আন্তর্জাতিক' ভাববন্ধনে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও হাঙ্গেরিতে এমন বিদ্রোহ ঘটে যা দমন করতে সোভিয়েত রাশিয়াকে চরম পন্থা অবলম্বন করতে হয়, যখন শুনি যে, 'আন্তর্জাতিকতা'র প্রশ্নেই 'আদর্শগত' বিরোধে রাশিয়া ও চীন বিতর্কক্লান্ত এবং যখন পড়ি যে, জার্মানি কিছুতেই দুই দেশ ও দুই জাতি হতে রাজী নয়, তখন স্বভাবতই এ সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, জাতীয়তাবাদ এখনও মানুষকে অনুপ্রাণিত করার পক্ষে প্রবলতম শক্তি।

এই শক্তির উৎপত্তি কোথায়? উত্তরে এককথায় বলা যায়, এর জন্ম খ্রীষ্টতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায়। যদিও ইয়োরোপে এবং খ্রীষ্টপন্থী ইয়োরোপেই এককালে এই জাতীয়তাবাদের সর্বোত্তম বিকাশ সম্ভব হয়েছিল, তবুও এ-কথা বলতেই হবে যে, জাতীয়তাবাদ তথা জাতীয়তাবোধ ইয়োরোপের একেবারে নিজস্ব বস্তু নয়। কেননা, যদি তাই হতো, তাহলে খান দুই পুঁথির মাধ্যমে প্রাচ্যখণ্ডে তা পৌছানোমাত্রই ভারত বা জাপান বা চীন রাতারাতি জাতীয়তাবাদী হয়ে উঠতে পারত না। আসল কথা, হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম বা ইসলাম ধর্ম-পোষিত দেশগুলোতে আধুনিক জাতীয়তাবাদের জমি অংশত প্রস্তুতই ছিল, রাজনৈতিক শৃঙ্খলার সুযোগে আধুনিক জাতীয়তার সংবাদ সে-সব দেশে পৌছুতেই সেখানকার লোকরা খুব সহজেই এবং বেশ তাড়াতাড়ি জাতীয়তাবাদের নতুন ভাবে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে উঠলো। অন্তত আমাদের দেশে এই নতুন জাতীয়তাবাদের প্রসারে তাব সূচনাপর্বে গীতা, খিলাফৎ আন্দোলন, রাখীবন্ধন বা শিবাজী-উৎসবেব প্রভাব বড় কম ছিল না। ধর্মীয় গবাক্ষ দিয়েই যে আমরা আমাদের মনোরাজ্যে জাতীয়তাকে বিগ্রহরূপে প্রত্যক্ষ করেছিলাম, সে তথ্যটা একেবারে বিস্মৃত হলে চলবে না।

তবে এ-কথা স্বীকার করতেই হবে, প্রাচ্যখণ্ডে এই বিশেষ ভাবাদর্শ প্রধানত পশ্চিম থেকেই আমদানী। এশিয়া এবং আজকের আফ্রিকার জাতীয়তাবাদিগণ মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার কবে আসছেন সে-কথা।[১]

এখন প্রশ্ন, ইয়োরোপই বা এই চমৎকাবিণী মোহিনী-শক্তিকে পেল কোথায়? তার ইতিহাস রীতিমতো জটিল। প্রাচীন গ্রীস ও মধ্যযুগীয় ইতালি যেমনি ছিল উচুস্তরের সংস্কৃতির অধিকারী, তেমনি

১. *Swadeshi and Swaraj : A New Patriotism*—Bepin Chandra Pal

ছিল তাদের 'জাতীয়তাবোধ'। জনসাধারণ সেখানে নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত থাকলেও, তাদের ছোট ছোট 'প্রজাতন্ত্রী' রাষ্ট্রের মধ্যে একই সাধারণ ভাষা ও সমাজ-পদ্ধতি চালু ছিল এবং বিদেশ ও বিদেশীদের সম্পর্কে সাধারণ স্বার্থঘটিত ঐক্যবোধেরও অভাব ছিল না। কিন্তু সেদিনের গ্রীস বা ইতালিতে অন্য কতকগুলো বিষয়ের অভাব ছিল। তখনকার গ্রীক বা ইতালীয়দের সেই উচ্চ রাজনৈতিক চেতনা ছিল না, যাতে তারা নিজেদের একই গ্রীস রাষ্ট্র বা ইতালি রাষ্ট্রের নাগরিক বলে ভাবতে পারত। তখন তাদের মধ্যে এমন জাতীয়তার উন্মেষ ঘটেনি, যা তাদের পরস্পর হানাহানি থেকে বিরত রাখতে পারত। এককথায় জাতীয়তাবাদের ব্যাপক ভিত্তিই তখনো ঐ দুই দেশের মনোলোকে স্থাপিত হয়নি। 'জাতি' বলতে তখনো সেখানকার মানুষ এক-একটা অঞ্চলবাসী জনসমষ্টিকে মাত্র বুঝত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়েই ঐসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিবেশী 'জাতি'সমূহের মধ্যে চলতো ক্রমাগত সংঘর্ষ।

অত্যন্ত উন্নত স্তরের সভ্যতা এবং বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও, রোমের ক্ষেত্রে এই দুর্বলতা আরও বেশী স্পষ্ট। রোমের সেই গৌরবময় যুগেও সেখানে না ছিল প্রজাসাধারণের স্বাধীনতা, না ছিল সুনিবিড় প্রজা-ঐক্য। গ্রীসের মতো রোমও সেদিন ভাবত, যারা যুদ্ধ করে (দেশের জন্য হলেও) তারা নীচুস্তরের মানুষ। তাই যুদ্ধের দায়িত্বও ছেড়ে দেওয়া হতো 'বর্বর'দের হাতে। কিন্তু আধুনিক জাতীয়তার নায়করা যুদ্ধের দায়িত্ব নিজেদের হাতে রেখেই আনন্দ ও গৌরবানুভব করে থাকেন। সুতরাং এ-সব থেকেই এ-বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, সেকালের গ্রীস বা ইতালির উন্নত গোষ্ঠী-জীবন এবং একালের রাষ্ট্র-পরিবেশে স্ফূর্ত জাতীয় জীবন (National life) দুই জিনিস। এই দুয়ের মধ্যে ব্যবধান অনেক।

আজকের যে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে আমরা পরিচিত, তার জন্মকাল ঊনবিংশ শতক। তবে এ প্রসঙ্গে তার পূর্ববর্তী দুটি শতকও বিশেষভাবে আলোচ্য। বিশেষত মানব-সংস্কৃতির সমন্বিত রূপ ও তার অখণ্ডতার দিকে দৃষ্টিপাত ও দৃষ্টি আকর্ষণই যখন এ আলোচনার মূল লক্ষ্য, তখন অষ্টাদশ শতক সম্বন্ধে একটু সবিস্তার উল্লেখ একান্তই প্রয়োজন। কারণ, অষ্টাদশ শতকের ইয়োরোপীয় জীবন-দর্শনে সংস্কৃতির মূল সত্যের কিঞ্চিৎ ছায়াপাত ঘটেছিল। 'Philosophy of Enlightenment' ছিল সে-যুগের ইয়োরোপের জনপ্রিয় দর্শন। এই মতবাদ অনুযায়ী বিশ্ব এক সুষম এবং সর্বব্যাপ্ত প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। এবং এই বিশ্বাসের ফলেই সাধারণের মনে তখন এমন ধারণা জন্মাতেও দেরী হয়নি যে, প্রাকৃতিক জগতের মতো মনুষ্যলোকেরও একই ধরনের বিধি-বিধানে পরিচালিত হওয়া দরকার। অবশ্য, তখনো পর্যন্ত এ-কথা তাদের মনে আসেনি যে, পৃথিবীর সব মানুষই এক। তখনকার অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই যা মনে করতেন তা হচ্ছে, সব মানুষের মধ্যেই অনেক রকমের মিল রয়েছে এবং সে মিল মানুষে-মানুষে যে পার্থক্য বর্তমান তার চেয়ে বেশী গুরুত্ব দাবি করতে পারে। এই মতবাদীরাই প্রচার করলেন, মানুষের জন্ম ঘটে একভাবে, জন্মে সবাই স্বাধীন হয়ে এবং তারা সকলেই 'Pain and Pleasure' অর্থাৎ সুখ এবং দুঃখের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যেহেতু সমস্ত মানুষেরই এই সুখ-দুঃখের বোধ রয়েছে, সেজন্য তাদের কর্তব্য সমবেতভাবে Pain বা যন্ত্রণা হ্রাসে এবং Pleasure বা সুখের পরিমাণ বৃদ্ধির ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া—এই হলো এঁদের মূল বক্তব্য। রাষ্ট্র ও প্রজাপুঞ্জ উভয়পক্ষই এই লক্ষ্যকে সম্মুখে রেখে কাজ করে যাবে, তেমন আশাই এই দর্শনপন্থীদল পোষণ করেন। তাঁদের মতে,

'The State is a collection of individuals who live together to better to secure their own welfare, and it is the duty of

the rulers so to rule as to bring about the greatest welfare of inhabitants of their territory.' ২

বিভিন্ন দেশে অনেক মানুষের মনে আগে থেকেই বিশ্ববোধের চেতনা অঙ্কুরিত হয়ে থাকলেও, জাতীয় ভাবের শক্তির ক্রম-প্রসারে সেই শুভ চেতনার ব্যাপক বিকাশ বহু শতাব্দীর মধ্যেও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। 'রাজকর্তব্য' বা 'রাষ্ট্রকর্তব্য' নিয়ে সারা ইয়োরোপ জুড়ে আলোচনার আলোড়ন চলে আসছে সেই অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে। কঠোর রাজতন্ত্রের প্রতিভূ প্রুশিয়ার বজ্রদৃঢ় সম্রাট ফ্রেডারিক দি গ্রেট স্বয়ং এ-বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। আধুনিক জাতীয়তা-বাদের ধারণা সেখানে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। স্বদেশপ্রেম সম্বন্ধে সম্রাট ফ্রেডারিকের সেই আলোচনা চিঠিপত্রের আকারে প্রকাশিত। সেখানে এক পত্রলেখক Anapistemon এবং অন্যজন Philo-patros—আলোচনায় একজন আর-একজনকে লিখছেন, যেহেতু পৃথিবী এক এবং অখণ্ড সেইজন্য বিজ্ঞ মানুষের উচিত নিজেকে বিশ্ব-নাগরিক বলে বিবেচনা করা। এ-কথার উত্তরে বলা হচ্ছে, সত্য বটে মানুষ ভাই-ভাই এবং সব মানুষেরই উচিত পরস্পরকে ভালবাসা, তবে তার আগে দরকার আমাদের নিকট-প্রতিবেশী এবং যে দেশের অধিবাসী হিসাবে আমরা পরস্পর বিশেষভাবে সংযুক্ত, সেই দেশের প্রতি আমাদের যথাকর্তব্য পালন করা। ফ্রেডারিক লিখছেন :

'The good of society is yours. Without realising it, you are so strongly tied to your fatherland that you can neither isolate, nor separate yourself from it without feeling the consequence of your mistake.' ৩

মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা এমনিভাবেই ক্রমে ক্রমে দেশের মাটি ও দেশের মানুষের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত হয়ে এসেছে।

২ *Nationalism*—Elie Kedowrie
৩ *Letters on the Love of the Fatherland*

এবং কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে নিবিড়তর হয়ে উঠেছে। 'জাতীয়তা-বাদ'-এর মূল ও মর্মকথা মোটামুটি এ থেকেই ধরে নেওয়া যেতে পারে।

একটি বিশেষ ভূখণ্ডকে 'ফাদারল্যাণ্ড' (বা মাতৃভূমি) বলে অভিহিত করে যুগপৎ নিজের ও প্রতিবেশীদের মিলিত সম্পত্তির অধিকারত্বের ধারণা থেকেই জাতীয়তাবাদের উন্মেষ এবং এমনি এক-একটি খণ্ডলোকই তথাকথিত জাতীয় সংস্কৃতির পশ্চাৎপট ও প্রেরণার ক্ষেত্র। মহৎ সংস্কৃতিবোধের অধিকারী চিন্তাশীল বহু মনীষীই কিন্তু 'ফাদারল্যাণ্ড'-এর এই সঙ্কীর্ণ ধারণাকে মনেপ্রাণে সমর্থন করতে পারেননি। ক্ষমতা-মদমত্ত সঙ্গীতানুরাগী সম্রাট ফ্রেডারিক দি গ্রেট যতই বাঁশী বাজাতে জানুন, যতই সনেট লিখুন, এমনকি মানব-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ জয়ধ্বনি 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা'র অন্যতম উদ্গাতা ভলতায়ারের (১৭৫০-৫৩) সান্নিধ্য তিন বছর ধরে যতই লাভ করুন না কেন, বড়জোর তাঁকে সংস্কৃতিবিলাসী আখ্যা দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু হৃদয়হীনতায় যিনি ছিলেন অদ্বিতীয়, 'মহান' সম্রাট হলেও তাঁকে কখনও সংস্কৃতিবান মানুষ বলা চলে না। এমনকি প্রুশিয়ার নেতৃত্বে জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সমরনায়ক বিসমার্কের মুখে প্রায় শতবর্ষ পরেও 'মহান' ফ্রেডারিকের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তিত হলেও, ফ্রেডারিকের প্রায় সমসাময়িক জার্মানির সুমহান কবি-দার্শনিক জোহান উলফাংগ গ্যয়েটে সম্রাট-বিঘোষিত ও বহুজন-সমর্থিত 'ফাদারল্যাণ্ড'-এর ধারণা সম্পর্কে বলেছিলেন ঃ

'Have we a fatherland? If we can find a place where we can rest with our possessions, a field to sustain us, have we not there a fatherland?'

অর্থাৎ, যেখানে আমাদের ধনসম্পদ নিয়ে নিরাপদে থাকতে পারি এবং যেখানে আমাদের জন্য রয়েছে অন্নদাত্রী ভূমি, তাই কি

আমাদের পিতৃভূমি নয়? কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'দেশে দেশে মোর দেশ আছে' কথাটির মধ্যেও মহাকবি গ্যয়েটের মতোই একই বিশ্ববোধের সুর ধ্বনিত হয়েছে।

সে যাই হোক, ইয়োরোপের চিন্তাজগতে যখন এ ধরনের একটা জাতীয়তাবোধের আলোড়ন চলেছে তখন ইয়োরোপের জমিতে ফরাসী ভূখণ্ডে শুরু হয়েছে মানব-প্রগতির ইতিহাসে অবিস্মরণীয় বিপ্লব। মনে হলো, এই ফরাসী বিপ্লব যেন সেই Philosophy of Enlightenment-কে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগেরই প্রথম উদ্যোগ এবং এই মহাবিপ্লবেই প্রথম প্রমাণিত হলো যে, যদি কোনও রাষ্ট্রের নাগরিকরা মনে করে যে. চলতি শাসনযন্ত্র তাদের স্বার্থের পক্ষে অনুকূল নয়, তাহলে তা পরিবর্তনের অধিকার তাদের রয়েছে। কেননা,

'the principle of sovereignty resides essentially in the nation' [8]

ফরাসী বিপ্লব উপলক্ষেই সর্বপ্রথম শোনা গেল, ভূমি ও জনসমষ্টিরও ঊর্ধ্বে 'নেশন' নামে একটি সার্বভৌম শক্তি বা ধারণার অস্তিত্বের কথা, যা সর্বশক্তিমান রাজা বা সম্রাটের চেয়েও ক্ষমতাবান। রাজা-প্রজানির্বিশেষে সকলেই এই ক্ষমতার অনুগত। সজ্ঞানে 'নেশন'-এর ব্যবহারিক প্রয়োগ এই থেকেই শুরু।

অবশ্য, এর আগে 'নেশন' শব্দটি ইয়োরোপে যে একেবারেই অজ্ঞাত ছিল, তা নয়। সেকালে সাধারণের মধ্যে একটি শব্দ চালু ছিল, তার নাম হলো 'Natio'। প্রথমত, 'Natio' বলতে বুঝাত এমন একটি জনসংখ্যা বা জনসমষ্টি যা পরিবারের চেয়ে বড়, কিন্তু 'Clan' বা গোষ্ঠীর চেয়ে ছোট। মধ্যযুগীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই শব্দটির সবিশেষ প্রচলন ছিল। সেকালের পারী বিশ্ববিদ্যালয়

৪ ফরাসী বিপ্লব উপলক্ষে প্রচারিত *The Declaration of the Rights of Man and the Citizen*

দেশের এক-একটি অঞ্চলের নামে L'honorable nation de France, nation de Picarde ইত্যাদি চারটে 'Natio'তে বিভক্ত ছিল। এই 'Natio' শব্দটি পরে জাতিবিশেষ্যে (Collective noun) পরিণত হলো। ক্রমে এই জাতি-ধারণা আরও প্রসারিত হতে থাকে। তারই ফলে *Encyclopaedia Britannica*-য় D'Alembert-এর ব্যাখ্যায় আমরা দেখতে পাই,

(Nation is) 'a collective word used to denote a considerable quantity of those people who inhabit a certain extent of country defined within certain limits, and obeying the same Government'

ব্যবহারিক দিক থেকেও 'নেশন' শব্দটি অনেকদিন ধরেই চালু ছিল। সেকালের চার্চ-কাউন্সিলগুলোও নিজেদের কয়েকটি 'নেশন' বা শ্রেণী অনুযায়ী ভাগ করে কাজ চালাতেন। তাত্ত্বিক আলোচনায় এবং সাংগঠনিক ক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রত্যক্ষ ব্যবহারে শব্দটি যখন মোটামুটি চালু হয়ে এসেছে, তখনই ফরাসী বিপ্লবের সূচনা এবং সেই বিপ্লবেই 'নেশন'-এর নতুন সংজ্ঞা লাভ ও তদনুযায়ী নতুন আদর্শের ব্যাপ্তি ঘটে।

ফরাসী বিপ্লবের পরেই পরিষ্কারভাবে বুঝা গেল যে, 'নেশন' শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত, এই বিপ্লব থেকে জানা গেল যে, 'নেশন' হচ্ছে সেই জনসমষ্টি যাদের কাছে দেশের সরকার সর্ববিষয়ে দায়ী এবং যারা ইচ্ছা করলে নিজেদের স্বার্থে নিজেরাই সরকার পরিবর্তনে সক্ষম। 'নেশন'-এর এই সংজ্ঞা অনুযায়ী পৃথিবীর যে-কোনো দেশের যে-কোনো জনসমষ্টি ইচ্ছা করলে তাদের সরকার পরিবর্তন করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে নিজ নিজ দেশের লোকদের স্বার্থে সব দেশে যদি একই রকমের সরকার গঠিত হয়, তবে সেগুলোও হবে এক-একটি 'জাতীয়' সরকার।

আদর্শগতভাবে এই সিদ্ধান্ত সত্য হলেও, বাস্তবে তা খুব সহজ-সাধ্য নয় এবং তাই এখনো পর্যন্ত তা সম্ভব হতে পারছে না। কেননা, 'নেশন' বা জাতি 'সরকার' বা গভর্নমেণ্টকে বাদ দিয়ে না হলেও, 'সরকার'ই নেশনের সবটা নয়। তাই যদি হতো, তাহলে সরকার পরিবর্তনের প্রশ্নে একই জাতির মধ্যে গৃহযুদ্ধ হতো না কিংবা 'নেশন'-প্রাধান্যের মোহে দেশে-দেশেও কখনো যুদ্ধের অবতারণা হতো না। আসলে 'নেশন' সম্পর্কে মানুষের ধারণার মধ্যেও যেমন বৈচিত্র্য রয়েছে, তার কার্যকরতার মধ্যেও তেমনি লক্ষ্য করা যায় অনেক বৈপরীত্য। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে প্রচলিত বিভিন্ন মত এবং ইতিহাসের ঘটনাবলীর দিকে তাকিয়ে তার প্রয়োগ দেখেই আমরা তা অনুধাবন করতে পারি।

সাধারণভাবে স্বজাতিপ্রিয়তা, স্বজাতির স্বার্থরক্ষা ও উন্নতি-বিধানের চেষ্টা, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ইত্যাদি মিলিয়েই আমাদের জাতীয়তাবোধ। কিন্তু দেশে দেশে এ-বিষয়ে ধারণা-ভেদ বর্তমান। ইংরেজদের কাছে 'ন্যাশনেলিজম'-এর যে অর্থ, জার্মানদের কাছে তার অর্থ ঠিক তা নয়। 'জাতীয়তা' কথাটি কানে আসামাত্র জার্মানদের মনে হয়, তারা এক মহান দেশের, শক্তিশালী রাষ্ট্রের এবং এক অতি-সুসভ্য জাতির মানুষ। হিটলার জার্মান জাতিতে আর্য রক্তের প্রাধান্য আরোপ করে এবং তা থেকে ইহুদিদের বহির্ভূত করে দিয়ে জার্মান জাতীয়তায় বিশুদ্ধতা এবং তাতে আরও অনেক বেশী আবেগ আমদানি করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সে যাই হোক, বিভিন্ন রাজ-নৈতিক মতবাদগুলো আলোচনা করলেও দেখা যাবে যে, জাতীয়তা সম্বন্ধে পৃথিবীর সকল দেশের মানুষ একই ভাব পোষণ করে না। এমনকি একই দেশের মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্যে এ-বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে।

ইংলণ্ডে রক্ষণশীলরা প্রথমে মনে করেছিলেন, জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্রের বিরুদ্ধ শক্তি। তাঁরা আরও ভেবেছিলেন, জাতীয়তাবাদকে তাঁরা ইচ্ছামতো নিজেদের কাজে লাগাতে পারবেন। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই একদিন তাঁরা সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন জাতীয়তাবাদকে। কিন্তু ক্রমে তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, তাঁদের সে ধারণা ভুল। জাতীয়তাবাদ আসলে রক্ষণশীলতার শত্রু, এ সত্য তাঁদের কাছে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। তাঁরা বেশ বুঝতে পারলেন যে, রক্ষণশীলতা ও প্রগতির মধ্যে যেখানে বিরোধ, জাতীয়তাবাদ সেখানে বিদ্রোহাত্মক—সে সেখানে প্রগতিরই পক্ষভুক্ত। এই যে প্রগতি, এ সেই মূল সংস্কৃতিবোধেরই অনুপ্রেরণার ফল। উদারপন্থীরাও একদিন এই প্রগতির লক্ষণ দেখেই জাতীয়তার পতাকা তুলে ধরেছিলেন দু'হাতে। তাঁদের ধারণা ছিল, জাতীয়তাবাদ স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষে এক আশ্চর্য সহায়ক শক্তি। একমাত্র এই শক্তির বলেই মানুষ পরবশ থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে এবং এই শক্তির ছায়াতেই স্বাধীন মানুষ শান্তিতে বাস করতে পারে। এই শান্তিতে বাস করার কামনাও সংস্কৃতিবোধ থেকে উদ্ভূত। কিন্তু জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রে যখন সংখ্যালঘুরা উৎপীড়িত হতে লাগল এবং জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে যখন এক জাতি আর এক জাতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল, তখন উদারপন্থীদেরও মোহমুক্তি ঘটলো। বুঝতে পারা গেল যে, এ-সব সংঘাত-বিরোধ যে জাতীয়তার নামে সংঘটিত হয়ে চলেছে, তা সংস্কৃতির বিকৃত ধারণা থেকে সম্ভূত এবং সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত—ঐতিহ্যের প্রভাব বর্তমান থাকলেও প্রকৃত সংস্কৃতির সঙ্গে এ-সব সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন। ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সমার্থক নয়, এও মনে রাখা দরকার।

সমাজতন্ত্রীরাও একসময় মনে করেছিলেন যে, জাতীয়তাবাদ

ধনিকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী হাতিয়ার। কিন্তু সে ধারণাও ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। মার্কস্‌বাদীর মতে, মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ তীব্র শ্রেণী-সংগ্রাম। কিন্তু তবু, জাতীয়তার বাঁধন সম্পূর্ণভাবে কাটানো তাঁদের পক্ষেও বোধ হয় সম্ভব নয়। তাই যদি হতো, তাহলে *My motherland is my mother* প্রভৃতি গান সোভিয়েত রাশিয়ায় এত জনপ্রিয় হতে পারত না। মোট কথা, আজকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহও সম্পূর্ণত জাতীয়তাবাদের অপবাদ-মুক্ত, এমন কথা বলা চলে না।

আসলে জাতি এবং জাতীয়তা সম্বন্ধে এক-এক দেশের মানুষ, এক-এক মতবাদের মানুষ এক-এক ধারণা পোষণ করে আসছে এবং কালক্রমে সেই সব ধারণারও পরিবর্তন ঘটছে। এই বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট ধারণা এ পর্যন্ত সৃষ্টি না হবার ফলেই 'জাতীয় সংস্কৃতি' বা 'National Culture' কথাটি দেশে দেশে প্রচলিত হয়ে আসছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভৌগোলিক কারণে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ঐতিহ্যগত পার্থক্য থাকলেও, মানুষের সংস্কৃতিবোধ সর্বত্র এক। এক-এক দেশের 'জাতীয় ঐতিহ্য' জাতিতে জাতিতে বিরোধের ক্ষেত্র প্রস্তুতে সহায়ক হতে পারে, কিন্তু সংস্কৃতি কখনো বিরোধের বীজ বপন করে না—মানুষকে সমন্বয়ের পথে, মিলনের পথে তা এগিয়ে নিয়ে যায়, তাদের কল্যাণ-পথের নির্দেশ দেয়। সভ্যতার গতিপথে সংস্কৃতি প্রেরণা যুগিয়ে চলে। যে জাতি যতটা সভ্য, সংস্কৃতির প্রভাবও তার ওপর ততখানি। কিন্তু তাই বলে এক-একটি জাতি এক-একটি পৃথক পৃথক সংস্কৃতির অধিকারী, এমন মনে করা ঠিক নয়। বিখ্যাত বৃটিশ রাজনীতিবিদ্ ডিজর‍্যালি 'এক একটি সভ্য সমাজকে এক একটি জাতি' বলে অভিহিত করেছেন এবং জাতি কিভাবে গঠিত হয়, তার ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন,

'A nation is gradually created by a variety of influences—the influence of original organisation, of climate, soil, religion, laws, customs, manners, extraordinary accidents and incidents in their history and the individual character of their illustrious citizens. These influences create the nation—these form the national mind, and produce in the course of centuries a high degree of civilisation.'

এই ব্যাখ্যা থেকে অন্তত এই একটি কথা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, বিভিন্ন রকমের প্রভাবে এক-একটি জাতি গড়ে ওঠে, তা থেকেই কালক্রমে এক-এক ধরনের জাতীয় চরিত্র বা জাতীয় মনোভাবের সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং যুগ-যুগ ধরে সেই সব জাতীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটতে থাকে। জাতি প্রসঙ্গ আলোচনায় ডিজর‍্যালি সভ্যতার কথা এনেছেন, কিন্তু সংস্কৃতির কথা তোলেননি। কারণ, মানুষের সাংস্কৃতিক চেতনা সর্বদেশে সর্বকালে এক, কিন্তু জাতীয় চেতনা তা নয়। তা হলে আমরা যে 'ভারত-সংস্কৃতি'র কথা বলি, এ-কথাটি কি ভুল? না, তা নয়। তা ভুল নয় এইজন্য যে, ভারত-সংস্কৃতি চিরকাল বিশ্ববোধ ও বিশ্বমানবতার শিক্ষা দিয়ে আসছে এবং সেই হিসাবে 'ভারত-সংস্কৃতি' বিশ্ব-সংস্কৃতি বা মানব-সংস্কৃতিরই নামান্তর। জননী এবং জন্মভূমিকে স্বর্গের চেয়ে বড় জেনেও, ভারতবর্ষের মানুষ কখনও তার বিশ্ববোধ থেকে বিচ্যুত হতে পারে না, সমগ্র পৃথিবীর মানুষকেই সে আত্মীয় বলে জেনেছে—বসুধৈব কুটুম্বকম্, তাই সকল দেশের মানুষের কল্যাণই তার সকল সময়ের কাম্য। এই হলো ভারত-সংস্কৃতি তথা মানব-সংস্কৃতির মূল কথা। 'জাতীয়ভাব' বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ভারত-মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: 'জাতীয়ভাবটি হৃদয়োন্নতি-সোপানের একটি প্রশস্ত ধাপ। (১) নিজের প্রতি অনুরাগ; (২) নিজ পরিবারের প্রতি অনুরাগ; (৩) বন্ধু-বান্ধব-স্বজনের প্রতি অনুরাগ; (৪) স্বগ্রামবাসীর প্রতি অনুরাগ; (৫) নিজ প্রদেশ-

বাসীর প্রতি অনুরাগ। এই পাঁচটি ধাপ ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া উঠিয়া তবে (৬) স্বজাতিবাৎসল্য বা স্বদেশানুরাগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থূল কথায় প্রাচীন গ্রীক এবং রোমীয়দিগের অধিকার এই পর্যন্ত। আবার পর্যায়ক্রমে ইহার উপরে (৭) স্বজাতি হইতে অনধিকার ভিন্ন অপরজাতীয় লোকের প্রতি অনুরাগ—অগস্ট কোম্‌তের মতানুযায়ীদিগের প্রকৃত অধিকার এই পর্যন্ত। (৮) মানবমাত্রের প্রতি অনুরাগ—সরলমনা যিশুর এবং মহাত্মা মহম্মদের দৃষ্টির এই সীমা। (৯) জীবনমাত্রের প্রতি অনুরাগ—বৌদ্ধদিগের এই সীমা। (১০) সজীব নির্জীব সমস্ত প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ—ইহাই আর্যধর্মের সর্বোচ্চ আসন—আর্যেরা তাহারও উপরে, সেই অবাঙ্‌মনসোগোচরে আত্মনিমজ্জন করিতে চাহেন।...ভারতবাসী 'জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়' বলিতেছেন। তিনি সে মহাবাক্য কখনই ভুলিবেন না—পরজাতিবিদ্বেষ এবং পরজাতিপীড়ন তাহার স্বজাতিবাৎসল্যের অঙ্গীভূত হইবে না। প্রত্যুত পৃথিবীর সকল জাতি তাহার নিকটে জ্ঞান এবং প্রীতির ঐ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইবে।'[৫] এই পরিব্যাপ্ত জ্ঞান ও প্রীতির মহামন্ত্র সত্যকারের সংস্কৃতিবোধ থেকে উদ্ভূত এবং এখানে সংস্কৃতির সত্য চিরভাস্বর। প্রকৃত সংস্কৃতিবোধ দ্বারা যে জাতীয়তা পরিশোধিত ও মার্জিত, তাকে ভয় পাবার কোন কারণ নেই। কিন্তু আধুনিক কালের এক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যে ইয়োরোপীয় সমীক্ষায় জাতীয়তাবাদকে

'a consciousness of the distinctive character of different nations, including the one of which the individual is a member, and a desire to increase the strength, liberty and prosperity of nations'[৬]

বলে বিশ্লেষণ করা হয়েছে—সেই সমীক্ষা থেকে শান্তিকামী সংস্কৃতিবান

৫ 'সামাজিক প্রবন্ধ'—ভূদেব মুখোপাধ্যায়

৬ *Nationalism*—Report by a Study Group at the Royal Institute of International Affairs, London, 1939

মানুষের মনে ভীতির উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। এবং এই ভীতি যে মোটেই অহেতুক নয়, তা প্রমাণিত হতেও বেশী সময়ের প্রয়োজন হয়নি। উক্ত সমীক্ষার রিপোর্ট প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সারা ইয়োরোপ জুড়ে হিটলারী শক্তিমদমত্ততার দৌরাত্ম্য শুরু হয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি করে তাই বলতে হয়—

'nationalism is a cruel epidemic of evil that is sweeping over the human world of the present age and eating into its moral vitality.' [৭]

এই মনুষ্যত্ব-বিরোধী জাতীয়তাবাদ মোটেই সংস্কৃতির লক্ষণযুক্ত নয়। 'জাতীয় সংস্কৃতি'র শত দোহাই সত্ত্বেও এ-কথা বলতেই হবে, সংস্কৃতির বিকৃতবোধের প্রভাবেই দেশে দেশে এই ধরনের জাতীয়তাবাদ প্রবল হয়ে উঠছে। সংস্কৃতি-বর্জিত জঙ্গী জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সত্যই তাই সর্বদা সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

---

৭ *Nationalism*—Rabindranath Tagore

বিজ্ঞানের জয়যাত্রায়

বিজ্ঞানের বিজয়-অভিযান মানব-সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসের বিশিষ্ট অঙ্গ বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। বিভিন্ন যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা মানুষের সংস্কৃতির অভ্যুদয়ের ইতিহাসে পাথেয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সংস্কৃতিকে যদি মানব-হৃদয়ের সত্য, শিব ও সুন্দরের ধ্যান ও ধারণা বলে অভিহিত করা যায়, তবে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা যেন এই সাধনামার্গের একটি শক্তিসম্পন্ন মন্ত্রস্বরূপ।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-ক্রিয়া কখনও কোনও ধরা-বাঁধা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়নি। বিজ্ঞানের নিয়মে 'দুর্ঘটনা'ই হলো আবিষ্কারের সূত্র। Franklin Adams-এর উক্তি অনুসারে ঃ

'I find that a great part of the information I have, was acquired by looking up for something and finding something else on the way.'

আবার ইতিহাসের বিবর্তনে দেখা যায় যে, অজ্ঞাত-অখ্যাত জাতিসমূহ সাময়িক ঘটনা-সংঘাতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে পাদপ্রদীপের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

বৈজ্ঞানিক সত্যানুসন্ধানের ইতিহাস খুঁজতে গেলে দেখা যায় যে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে এসে মানুষ বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদে প্রথম সত্যকার আকৃষ্ট হয়। এই সময় ইয়োরোপে খ্রীষ্ট ধর্মের আধিপত্য শেষ হয়ে বিজ্ঞানের নবযুগ উপস্থিত হলো। খ্রীষ্টান জগতের Reformation বহু রক্তক্ষয়ের মধ্য দিয়ে মানুষকে ধর্মীয় গোঁড়ামির হাত থেকে মুক্ত করে জ্ঞানালোকের সন্ধান দিল। Copernicus আর Vesalius তাঁদের জীবনব্যাপী সাধনা দিয়ে চরম কষ্ট সহ্য

করেও প্রকৃতির রহস্যভেদে নিযুক্ত ছিলেন। আজ এই বিংশ শতাব্দী যখন বিজ্ঞানের যশোগানে মুখর তখন যদি আমরা পিছু ফিরে তাকাই তাহলে বুঝতে পারব যে, মানুষের সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে ষোড়শ শতাব্দীতে গ্যালিলিও-র লাঞ্ছনাভোগ দুই হাজার বছর আগে আস্তাবলে যীশুখ্রীষ্টের জন্মগ্রহণ করার চেয়ে কম তাৎপর্যময় ঘটনা নয়।

বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের উদ্ভবের ফলে মানুষের চিন্তা-পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন সাধিত হলো। মানুষ অনৈসর্গিক কল্পনাপ্রবণতাকে ত্যাগ করলো। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা অখণ্ডনীয় বাস্তব প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে একটি সাধারণ নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য দার্শনিক যুক্তিবাদের প্রবর্তন করলেন। চিন্তাধারার মধ্যে সামঞ্জস্য আনার জন্য তাঁদের প্রয়াস শুরু হলো, এবং এই প্রয়াস ভবিষ্যৎ ইতিহাসে মানুষের সাংস্কৃতিক বোধকে ঋজু ও সুগঠিত করতে সাহায্য করেছে। এতদিন শুধু আবেগভিত্তিক হয়ে সাংস্কৃতিক বোধ একটা লাগামহীন ঘোড়ার মতো যথেচ্ছ বিচরণ করতো, কিন্তু এখন তা যুক্তি দ্বারা সংযত হয়ে সোজা সড়কে চলতে লাগল।

বিজ্ঞানের আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই বস্তুর ধারাবিন্যাস (order of Things) এবং প্রকৃতির ধারাবিন্যাসকে (order of Nature) স্বীকার করে নিতে হবে। জীবমাত্রেরই আচার-ব্যবহার কতকগুলি সহজাত প্রেরণা বা প্রবৃত্তি-বোধের দ্বারা পরিচালিত। আমরা আমাদের এই সহজাত ইন্দ্রিয়শক্তি দ্বারা বিশ্বসংসারের ঘটনা-প্রবাহকে অনুভব করতে পারি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, একই ঘটনা বিশ্বজগতে দিনের পর দিন ঘটে যাচ্ছে। কিন্তু বস্তুত, বৎসরের পর পর দুটি দিন, বা বিভিন্ন বৎসরের দুটি বসন্ত সূক্ষ্ম-বিচারে এক ও অভিন্ন নয়। প্রতিদিনই সূর্য ওঠে এ-কথা ঠিক, কিন্তু

প্রতিদিনই কি বাতাস দক্ষিণ-সাগর থেকে নীলপদ্মের সুবাস বয়ে নিয়ে আসে ?—আসে না। এইটেকেই মানুষ 'প্রকৃতির খেয়াল' নাম দিয়েছে। আর এই খেয়ালের উৎস-সন্ধানেই মানুষ তার নিত্যকার জীবনযাপন করেও রহস্যভেদে আত্মনিয়োগ করেছে।

আশ্চর্যের বিষয়, অ্যারিস্টটল, আর্কিমিডিস প্রভৃতির ন্যায় ক্লাসিকাল গ্রীক চিন্তানায়করা এবং রোজার বেকন বিশ্বজগতের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সব ঘটনাকেই একটি বৃহত্তর প্রাকৃতিক নিয়মের আওতাভুক্ত বলে জানতেন। পাশ্চাত্যে গ্রীক সভ্যতার পর থেকে মধ্যযুগের অবসানের পূর্ব পর্যন্ত মানুষ যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো নতুন পথে পদক্ষেপ করেনি। ধর্মের প্রভাবে তারা নতুন কোনো গবেষণায় লিপ্ত না থাকায়, ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মানুষ বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ সম্পর্কে আর্কিমিডিসের সময়ের অপেক্ষাও কম জানত। অবশেষে ১৪শ থেকে ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত Renaissance-এর শেষ পর্যায়ে এসে ধর্মীয় ও সামাজিক Reformation-এর মধ্য দিয়ে মানুষ আবার যুক্তির জগতে ফিরে এল।

স্বভাবতই মনে একটা প্রশ্ন আসতে পারে, কি করে হঠাৎ মানুষ মধ্যযুগের শেষে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের প্রতি আকৃষ্ট হলো। গোড়া থেকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করলে বলতে হবে যে, গ্রীক ক্লাসিকাল বিয়োগান্ত নাটকে ভাগ্যকে একটা বিরাট স্থান দেওয়া হয়েছে। মানুষের সকল চাওয়া-পাওয়া এবং কার্যকারণ এক মহাশক্তিশালী নিয়তির নিয়ন্ত্রণে এক চরম পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে—এমন একটা বিশ্বাস তখন প্রবল ছিল। গ্রীক সাহিত্য পাঠ করে নিয়তিরূপ পরাক্রান্ত শক্তিকে জানবার জন্য ষোড়শ শতাব্দীর অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ এবং যুক্তিবাদী দার্শনিকরাও বৈজ্ঞানিক চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

আবার সম্রাট জাস্টিনিয়ানের নামের সহিত সুপরিচিত বাই-জান্টাইন সাম্রাজ্য তৎকালীন ইয়োরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্র ইতালি থেকে গথিক সভ্যতার গ্লানিময় অবশিষ্টাংশ দূর করে সেখানে সংস্কৃতিশীল ব্যক্তিদের জন্য এক নতুন পটভূমি তৈরী করলেন। সাধারণ মানুষ রোমক আইনের আদর্শবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে ন্যায়বিচার ও যুক্তিবাদের প্রতি আকৃষ্ট হলো। তাছাড়া, বিগত ষষ্ঠ শতাব্দীতে সেণ্ট বেনেডিক্ট আর সেণ্ট গ্রেগরি নামে দুই ইতালীয় সন্ন্যাসী গ্রীকদের ন্যায় শুধু পুঁথিগত চেষ্টায় রত না থেকে, মঠের বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য হাতে-কলমে কাজ করে কারিগরী উন্নতির প্রথম বীজ বপন করেন। এই দুই বাস্তববাদী সন্ন্যাসীর কার্যকলাপ এক হাজার বছর পরেও ইতালীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে প্রভাবান্বিত করেছিল।

বিস্ময়ের বিষয়, মধ্যযুগের মানুষ যার দ্বারা বিজ্ঞানের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়, তা হলো প্রকৃতির প্রতি সংস্কৃতিবান মানুষের আকর্ষণ। হৃদয়েব সূক্ষ্মচেতনাবোধ মানুষকে প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট কবলো এবং প্রকৃতির অভিনব চিন্ময়রূপ অনেক কবির লেখনীর জাদুতে বিস্ময়কররূপে প্রকাশিত হলো। কবির লেখনীতে যে প্রকৃতি বাঙ্ময় ও চেতনাসম্পন্ন হয়ে উঠলো, তার প্রাণের স্পন্দনকে জানবার জন্য কোপারনিকাস, গ্যালিলিও আকাশের দিকে চোখ মেলে তাকালেন, আর কলম্বাস, ভাস্কো-ডা-গামা পাল-তোলা জাহাজে অকূল সমুদ্রে পাড়ি জমালেন। সংস্কৃতিবান ব্যক্তিদের রুচিবোধ সভ্যতাকে নতুন পথের ইঙ্গিত দেখাল, আবার পরবর্তী কালে এই বিজ্ঞানই সংস্কৃতির বিকাশে কতোই-না সাহায্য করেছে।

এই প্রসঙ্গে ইতালির অমব শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির 'কথা

না বললে বিবরণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই শারীর-তত্ত্ববিৎ বৈজ্ঞানিক শিল্পী প্রকৃতির কাছ থেকে শিল্পের পাঠ গ্রহণ করার সঙ্গে বিজ্ঞানের পাঠও গ্রহণ করেছিলেন। পাখির মতো উড়ে যাবার বাসনা তাঁর চিত্তকে আকুল করে তুলত এবং তিনি এই পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য একটি জ্যামিতিক নক্সাও অঙ্কন কবেছিলেন। মানুষের দেহ-সৌন্দর্যের অপরূপ কান্তিকে ইজেলের গায়ে ফুটিয়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি রক্তমাংসের শরীরের অনেক আভ্যন্তরীণ গূঢ়তত্ত্বও ভবিষ্যতের জন্য লিপিবদ্ধ করে রেখে যান।

অঙ্কশাস্ত্র, মানুষের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার অন্যতম বিকাশপথ। ঘটমান জগতের বিক্ষিপ্ত ঘটনারাশির মধ্যে অঙ্কশাস্ত্র এক যৌক্তিক সম্বন্ধ স্থাপনে সমর্থ হয়েছে। আজকের দিনের অঙ্কশাস্ত্রবিৎদের চিন্তায় যে সকল ধারণার স্ফুরণ ঘটছে তা হয়ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনা দ্বারা বর্তমানে প্রমাণ করা সম্ভব নয়, কিন্তু কারিগরী বিদ্যার অগ্রগমনের সঙ্গে এই সকল ধারণা সহজেই প্রতিপাদ্য হয়ে উঠবে। আইনস্টাইন তাঁর যুক্তির সাহায্যে নিউটনের মতবাদ খণ্ডন করতে সমর্থ হয়েছিলেন এই বলে যে, আলোকের গতিরেখা সকল সময়ই সরলরেখায় অগ্রসর না হয়ে অবস্থাবিশেষে বেঁকে যায়। কিন্তু তিনি বাস্তবে তাঁর মতবাদ প্রমাণে সমর্থ হননি। এইমাত্র কয়েক বছর আগে পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় লণ্ডনের 'রয়াল সোসাইটি' বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের জন্য সূর্যের আলোকচিত্র গ্রহণকালে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেন যে, বিভিন্ন তারকা থেকে আগত আলোকরশ্মি সূর্যের কাছ দিয়ে যাবার সময় সত্যিই খানিকটা বেঁকে যাচ্ছে। এই আবিষ্কার থেকে পুনরায় প্রমাণিত হলো—কোনো একটিমাত্র সাধারণ নিয়মের আওতায় প্রকৃতির ঘটনা-রাশিকে আবদ্ধ করা সম্ভব নয়। নিউটন আলোকের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে যে সাধারণ নিয়ম বর্ণনা করেছিলেন তা ভুল প্রমাণিত হলো।

খেয়ালী প্রকৃতির লীলা বিচিত্র, তাকে কি অতো সহজেই ধরা যায়। আবার এই আবিষ্কারের দ্বারা এটাও বোঝা গেল যে, অঙ্কশাস্ত্রের যুক্তিবাদের সাহায্যে মানুষ কয়েক শতাব্দী এগিয়ে যেতেও পারে, যদিও সমসাময়িক অবস্থায় নতুন ধারণা বা আবিষ্কার বাস্তবে প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিকদের চিন্তাধারা প্রধানত তিনটি সূত্র ধরে অগ্রসর হলো: (ক) অঙ্কশাস্ত্রের গবেষণা, (খ) কোনো সাধারণ নিয়মের বশবর্তী না হয়ে প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক ঘটনার কার্য-কারণ-সম্বন্ধ নির্ধারণ করা, এবং (গ) অনৈসর্গিক চিন্তাধারা থেকে মুক্ত হয়ে সর্বসম্মত বাস্তব প্রমাণ দ্বারা প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ। এই শতাব্দীতে যাঁরা বৈজ্ঞানিক সত্যানুসন্ধানের অনলস পরিশ্রম করেছেন তাঁদের সকলের নামোল্লেখ এই স্বল্প-পরিসরে সম্ভব নয়, তবে বেকন, হার্ভে, কেপলার, গ্যালিলিও, ডেকার্টে, পাস্কাল, বয়েল, নিউটন, লক, স্পিনোজা আর লাইবিনৎসের নাম না করলে বিবরণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই শতাব্দীর যুক্তিবাদ দার্শনিক চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন এনে দিল। এতদিন পর্যন্ত একদল দার্শনিক বস্তু ও মনকে সমক্ষমতাশীল শক্তি বলে বর্ণনা করতেন, অপর একদল বস্তুকে মনের ওপর অধিকতর ক্রিয়াশীল এবং তৃতীয় দল মনকে বস্তুর ওপর অধিক ক্রিয়াশীল বলে মনে করতেন। কিন্তু এই শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিকগণ অঙ্কের সাহায্যে বস্তুকে নির্দিষ্ট স্থান ও কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে সক্ষম হলেন, অপরদিকে মনকে যুক্তি-রাজ্যের অন্যতম কেন্দ্র বলে স্বীকার করে চিন্তার ক্ষেত্রে বিপ্লব আনয়ন করলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অগ্রগতির কথা বলতে গিয়ে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে:

'The middle ages were haunted with the desire to rationalise the infinite; the men of the 18th Century rationalised the social life of modern communities and based their sociological theories on an appeal to the facts of nature. The earlier period was the age of faith based upon reason. In the later period, it was the age of reason, based upon faith.' ১

এই শতাব্দীর গতিবিজ্ঞান (dynamics), রসায়ন আর পদার্থ-বিদ্যার সহায়তায় বৈজ্ঞানিক জড়বাদ বিরাট সাফল্যলাভ করলো। বস্তুত, লাভয়সিয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমেই এই শতাব্দীতে রসায়নের জন্ম হয়। তিনি প্রমাণ করলেন যে, রাসায়নিক পরিবর্তনের সময় বস্তুর ধ্বংসপ্রাপ্তি ঘটে না, এবং এই আবিষ্কার আজও বৈজ্ঞানিক সত্য বলে সমাদৃত। নিউটনের *Principia* রচনার একশ' বছর পরে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে Lagrange তাঁর *Mechanique Analytique* পুস্তকে পদার্থবিদ্যার সাহায্যে যুক্তিসর্বস্ব অঙ্কশাস্ত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখিয়ে নতুন যুগের পত্তন করলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিজ্ঞান যখন দ্রুতগতিতে সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন বিজ্ঞানের বাহাদুরি সাধারণ মানুষের চোখ সহজেই ধাঁধিয়ে দিল। ইয়োরোপের লোকরা ধর্মের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ভগবানের অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করলো। কিন্তু হিউম এবং পলি বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন:

'Mechanism presupposes a God who is the author of nature. The God whom you will find will be the sort of God what makes that mechanism.'

এই প্রসঙ্গে তৎকালীন সাহিত্যের ওপর বিজ্ঞান যে প্রভাব বিস্তার

১ *Science and the Modern World*: Alfred North Whitehead

করেছিল, সে-বিষয়ে দু-এক কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সাহিত্য হলো সংস্কৃতির পাদপীঠ ; সুতরাং সমসাময়িক সাহিত্যিকগণ বিজ্ঞানের এই 'কোলাহল'কে কি-ভাবে গ্রহণ করেছিলেন তা উপলব্ধি করতে পারলে সংস্কৃতির সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্বন্ধটি স্পষ্ট হবে। এক কালে ইংরাজি সাহিত্যে মিল্টন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-সাধনাতেই মগ্ন ছিলেন, বিজ্ঞানকে তিনি কবিতায় স্থান দেননি। পরবর্তী কালে ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর কবিতায় আগাগোড়া বিজ্ঞানের বিপক্ষেই সওয়াল করে গেছেন। প্রকৃতির সঙ্গেই ছিল তাঁর একাত্মতা। তিনি বলতেন :

'Ye presence of Nature in the sky and on the earth! Le visions of the hills! And souls of lonely places!' [২]

বিজ্ঞানের বিপক্ষে তাঁর শেষ কথা হলো : 'We murder to dissect.' অপরদিকে শেলী কিন্তু বিজ্ঞানের জয়গান করে গেছেন। তাঁর কাছে বিজ্ঞান শান্তি, আনন্দ ও আলোকের দূতস্বরূপ ছিল। পাহাড় ছিল তাঁর কাছে Chemical laboratory বিশেষ। তিনি *Prometheus Unbound*-এ পৃথিবীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন :

'The vaporous exultation not to be confined.'

অবশ্য এই শেলীই আবার গেয়েছেন :

'The everlasting Universe of things flows through the mind.'

বস্তুত, তাঁর চোখে প্রকৃতির নৈর্ব্যক্তিক প্রাণস্পন্দন এবং জৈবিক রূপরস দুটিই সমভাবে রেখাপাত করেছিল।

কিন্তু রোমান্টিক যুগের শেষ পর্যায়ে টেনিসন বিজ্ঞান ও প্রকৃতির প্রেমের দ্বন্দ্বে কোনো নির্দিষ্ট পথ বেছে নিতে পারলেন না। ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাশীল ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্যই হলো তাঁদের এই মানসিক দ্বন্দ্ব। ম্যাথু আর্নল্ডের কবিতার মধ্যে এই মানসিক দ্বন্দ্ব সুপরিস্ফুট। তিনি বলেছেন :

---

২ *The Prelude*

'And we are here as on a darkling plain,
Swept with confused alarms of struggle and fight
Where ignorant armies clash by night.' ৩

ঊনবিংশ শতাব্দীর মানসিক দ্বন্দ্ব যদিও তৎকালীন চিন্তাশীলদের অস্থিরতা ঘটিয়েছিল, তবু বিজ্ঞান এই দ্বন্দ্বের অবসানের জন্য অপেক্ষা করলো না। ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের ফলে কারিগরী ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দেশগুলি বহুদূর অগ্রসর হলো। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ অথবা রোটারী প্রেসের আবিষ্কারের কথা ছেড়ে দিলে এই শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক অবদান হলো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-পদ্ধতিকে একটা সুসংবদ্ধ যুক্তিবাদ দ্বারা বিশ্লেষণ করার প্রয়াস। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মানুষ বৈজ্ঞানিক ফলাফল নিয়েই বেশি মাথা ঘামিয়েছে, লিউ-এন হক্ আতস-কাচের মধ্য দিয়ে জীবাণু-জগতের সন্ধান পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়েছেন, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষ আতস-কাচের মধ্য দিয়ে আলোকের যে বিশেষ রকমের প্রতিফলন ও প্রতিসরণ ক্রিয়া ঘটে সেই সূত্রটি যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করে তবে ক্ষান্ত হলো। এইটিই এই শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিক পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ স্থান, কাল এবং গতি সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট ধারণা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এতদিন ধারণা ছিল যে, জাহাজ যেমন জলে ভাসে, পাখি যেমন হাওয়ায় ভাসে, পৃথিবীও তেমনি ইথর নামক এক সূক্ষ্ম তরঙ্গে ভাসমান অবস্থায় সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে Michaelson তাঁর আলোকের গতিবেগ সংক্রান্ত পরীক্ষা দ্বারা ইথরের অস্তিত্ব এবং স্থান ও গতি সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত মতবাদের ওপর সন্দেহের আলোকপাত করেন। অতঃপর আইনস্টাইন এই গরমিলের হিসাবকে তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্ব দিয়ে চমকপ্রদভাবে ব্যাখ্যা করলেন। তিনি বললেন,

---

৩ *Dover Beach*

স্থান, কাল এবং গতি কোনো কিছুই নির্দিষ্ট নয়। সব-কিছুই আপেক্ষিক। কোনো দুটি ট্রেন যদি সমান্তরালভাবে একই দিকে ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে পাশাপাশি যায়, তাহলে তাদের আপেক্ষিক গতিবেগ হবে শূন্য এবং দুটি ট্রেনের যাত্রীদের কাছে মনে হবে যে, তারা স্থির হয়ে আছে। আবার ট্রেন দুটি যদি সমান গতিতে বিপরীত দিকে অগ্রসর হয়, তবে তাদের আপেক্ষিক গতিবেগ দাঁড়াবে ঘণ্টায় ৬০ মাইল। এই তত্ত্ব আবিষ্কার করে আইনস্টাইন বললেন, বিশ্বজগতের যে-কোনো স্থান, কাল বা গতি স্থির বা নির্দিষ্টভাবে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। বস্তুত, বিন্যাস অনুসারে স্থান-কাল-গতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিমাপ করতে হবে। এই অভিনব তত্ত্ব চিন্তাজগতে বিপ্লব এনে দিল এবং মানুষের কাছে বিশ্বজগতের রহস্য যেন সুদূর তারকারাশির আলোর মতো এক অস্পষ্ট নতুন দিগন্তের ইঙ্গিতও বয়ে আনলো।

আপেক্ষিক মতবাদের পরই বিংশ শতাব্দীতে সবচেয়ে বড় বিস্ময় আনলো কোয়াণ্টাম থিয়োরি। আপাতদৃষ্টিতে বস্তুর বৃদ্ধি বা বিনাশকে একটি ক্রমিক পদ্ধতি বলে মনে হয়। কিন্তু এই থিয়োরির মতে, সকল জিনিসই সিঁড়ির ধাপের মতো একটা নির্দিষ্ট মানে বৃদ্ধি বা বিনাশ পায়, পাহাড়ী রাস্তার মতো আরোহণ বা অবরোহণ করে না।

বিশ শতকের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির অবশ্য এখানেই শেষ নয়। পরমাণু রাজ্যের খবর পেয়ে বিজ্ঞানীরা পরমাণুকে বিভাজিত করে অফুরন্ত শক্তি উৎপাদনে সমর্থ হয়েছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই পরমাণু শক্তিকে ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল। পরবর্তী কালে বিজ্ঞানীরা পরমাণু শক্তি দিয়ে হাইড্রোজেন বোমা ও নানা-প্রকার ক্ষেপণাস্ত্র তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু মানুষের সাংস্কৃতিক সুসভ্য মন তাকে আত্ম-শাসন ও সংযম শিক্ষা দিয়েছে।

তাই বিজ্ঞানীরা এখন পরমাণু থেকে আহরিত শক্তিকে কল্যাণময় গঠনমূলক কাজে নিয়োগ করার জন্য ব্রতী হয়েছেন।

কিন্তু বিশ শতকের আরো চমকপ্রদ ঘটনা হলো এই যে, বিজ্ঞানীর দৃষ্টি পৃথিবী ছাড়িয়ে গ্রহান্তরে ধাবিত হয়েছে। রাশিয়া ও আমেরিকা উভয়েই মহাকাশে নকল গ্রহ-উপগ্রহ প্রেরণে সক্ষম হয়েছে এবং রুশ রকেট সত্যসত্যই ঘুমন্ত চাঁদের দরজায় গিয়ে মেরেছে ধাক্কা। চাঁদের বুকে আমেরিকার মানুষের তৈরী যানও গিয়ে নেমেছে।

বিজ্ঞান-চিন্তা মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের সংযোগ-সাধনকে অভাবনীয়রূপে সহজ করে তুলেছে। 'দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই'—এই মহৎ চিন্তা-ভাবনায় বিজ্ঞানের দান তুচ্ছ নয়। আর এখন পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে গ্রহান্তরের যোগাযোগও বিজ্ঞানবলে এক প্রকার স্থিরনিশ্চয় হয়ে উঠেছে। মানব-সভ্যতার বিকাশে মানুষের সংস্কৃতিবোধ শুরু থেকেই প্রেরণা যুগিয়ে আসছে। যে সুদীর্ঘ প্রয়াসের ফলে পৃথিবীর সঙ্গে আজ গ্রহান্তরের ঘনিষ্ঠতা ঘটতে চলেছে, তারও পশ্চাতে রয়েছে সেই সাংস্কৃতিক প্রেরণা। আর সে সাফল্যের সুফল ভোগ করার সুযোগ পাবে সমস্ত মানুষ। মানব-সংস্কৃতির জয় এমনিভাবে ঘোষিত হয়ে চলেছে যুগে-যুগে। আমাদের এই যুগের কৃতিত্ব সম্বন্ধেও বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক টয়েনবি যথার্থই বলেছেন:

'Our age will be remembered not for its horrifying crimes, nor for its astonishing inventions, but because it is the first generation since the dawn of history in which mankind dared to believe it to make the benefits of civilisation available to whole human race.'

সাহিত্য ও শিল্পকলায়

সাহিত্য ও শিল্পকলার সঙ্গে সংস্কৃতির যোগাযোগ এতই ঘনিষ্ঠ যে, অনেকে 'সংস্কৃতি' বলতে শুধু সাহিত্য ও শিল্পকলাই বুঝে থাকেন। অপর কোনো কিছু থাকুক বা না-থাকুক, সাহিত্য ও শিল্পকলার সঙ্গে সম্যক পরিচয় থাকলেই অনেকে লোককে সংস্কৃতিবান বলে অভিহিত করে থাকেন। এ-যাবৎ আমাদের আলোচনায় নিশ্চয়ই এ-কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, সংস্কৃতি সম্পর্কে এই ধারণা অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ নিশ্চয়ই, তবু এই ধারণা থেকে আরো একটা বিষয়ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হলো সংস্কৃতির সঙ্গে সাহিত্য ও শিল্পকলার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। বস্তুত, সাহিত্য ও শিল্পকলার কথা বাদ দিয়ে সংস্কৃতির কথা কল্পনাও করা যায় না।

'মানুষের সংস্কৃতি' বলতে আমরা সত্য, শিব ও সুন্দরের জন্য মানুষের সাধনা ও অন্বেষণেব ফলকেই বুঝে থাকি। সাহিত্য ও শিল্পের সাধনা যে সুন্দরের সাধনা, তা বিশদভাবে ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। কারণ, শিল্পসৃষ্টির পিছনে আরো যে সকল শক্তিই কাজ করুক না কেন—আমি একটা সুন্দরকে গড়ে তুলব—শিল্পীর এই মনোভাবও সদাই ক্রিয়াশীল; এবং অনেক শিল্পীর কাছে (সব শিল্পীর কাছেই কি নয়?) এই সৌন্দর্যসৃষ্টিই শিল্পীর শেষ লক্ষ্য। কিন্তু সত্য ও শিবকেও শিল্পী উপেক্ষা করতে পারেন না। সৃষ্টিই শিল্পীর প্রধান কাজ, কিন্তু হাওয়া দিয়ে তিনি সৃষ্টির কাজ করতে পারেন না। ভাষা, রঙ, পাথর—যা দিয়েই তিনি সৃষ্টি করুন না কেন, তাঁকে বলতে হবে জীবনের কথা, মানুষের কথা, সমাজের কথা।

এই সব প্রসঙ্গে হিতের কথাও তিনি বলেন।—কার হিত? সমাজের হিত,—মানুষের হিত। 'সাহিত্য' কথাটার এরকম একটা উৎপত্তিগত ব্যাখ্যাও তো অনেকে দিয়েছেন: সহ হিতেন=সহিত+ষ্ণ্য—এই প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়েছে 'সাহিত্য'। অনেকে এর উত্তরে বলে উঠবেন—না, মহৎ সাহিত্যে সমাজ-হিতের কথা বড় হয়ে ওঠে না। বড় হয়ে ওঠে না ঠিকই, কিন্তু মহৎ সাহিত্যিকদের মনের পিছনে সর্বদাই এই হিতের মনোভাব কাজ করে যাচ্ছে। টলস্টয়, গ্যযেটে বা রবীন্দ্রনাথের উদাহরণ থেকেই তা আমরা বুঝতে পারি। আর হিতকথা বড় হয়ে ওঠে না বলেই ত এই সব শিল্প মহৎ শিল্প হয়ে ওঠে। চেস্টারটনের ভাষায়[১] আমরা তাই সোজাসুজি বলতে পারি:

'the bad fable has a moral and the good fable is a moral.'

হিতকথা সেখানে শিল্প থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে না, হিতকথাও সেখানে সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

কিন্তু সৌন্দর্যের সাধনা মানেই স্বপ্নবিলাসিতা নয়। সাহিত্য-সাধক বা শিল্পীরা স্বপ্নবিলাসী—এমন একটা ধারণা বিরল নয়। কিন্তু প্রকৃতই যে শিল্প স্বপ্নবিলাসী মনের অবকাশের ফসল তা নয়। শিল্প সদাজাগ্রত মনের অতন্দ্র স্বাক্ষরে চিহ্নিত। জীবনকে সার্থকভাবে, সহৃদয়চিত্তে অনুধাবনই শিল্পীর কাজ। সাহিত্যিকের তৃতীয় নয়ন যে-ভাবে জীবনকে দেখে, সাধারণ মানুষ জীবনের সেই গভীর প্রদেশের সন্ধান রাখে না। আর রাখলেও সাধারণ মানুষের হাতে প্রকাশের বাহন নেই। শিল্পী তাঁর ভাষা দিয়ে, রঙ দিয়ে, পাথর কুঁদে, মাটি দিয়ে অন্তরের কথাকে 'রূপ' দেন। শিল্পীর এই দৃষ্টি আসে সহানুভূতি থেকে। জীবনের জন্য, মানুষের জন্য, সমাজের জন্য এই সহানুভূতির টানে শিল্পী কখনো দুঃখে, কখনো আনন্দে জীবনের চিত্র রচনা করেন।

১ *Tolstoy and the Cult of Simplicity*

জীবনের সব দেখা জিনিস, প্রতিটি চেনা ঘটনা সাহিত্যিক তাঁর ব্যক্তিত্বের নিকষে যাচাই করে অনুভূতির রঙে রঙিন করে শিল্পে রূপায়িত করেন। এই রূপায়ণের পিছনে তাঁর মূল লক্ষ্য সত্যকে রূপায়িত করা—সেই সত্য, যা তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছে। ধর্মগুরুর আদিষ্ট সত্য নয়, রাজনৈতিক নেতা-কথিত সত্য নয়, সেই সত্য, যাকে তিনি জীবন দিয়ে সত্য বলে জেনেছেন। এই সত্য শিল্পীকে প্রকাশ করতেই হবে, কারণ না-করে উপায় নেই। এই সত্য লোকসমক্ষে প্রমাণ করা যায় না, তবু এই সত্যকথনের জন্য লাঞ্ছনাবরণেও শিল্পী পিছপা নন। যে-সময়-চলতি স্রোতে নৌকো ভাসালে ঐহিক উন্নতি হতে পারত, হয়ত ক্ষমতাসীন দলে নাম লেখালে পুরস্কার মিলত, তখনও প্রকৃত শিল্পী এ-সব কথা না-ভেবে নিজের উপলব্ধ সত্যকে সৌন্দর্যে রূপ দিয়ে যাবেন। এতে পুরস্কার মেলে ভালো কথা, না-মেলে, শিল্পী তাতেও বিচলিত বা বিক্ষুব্ধ নন।

তা হলে আমরা দেখছি, সত্য, শিব ও সুন্দরের সুষ্ঠু সমন্বয়েই সাহিত্য ও শিল্পের পরাকাষ্ঠা। আর এই সত্য, শিব ও সুন্দরের সাধনাকেই আমরা সংস্কৃতির কুললক্ষণ বলে মেনে নিয়েছি। অতএব দেখা যাচ্ছে, সাহিত্য ও শিল্পের মধ্যেই যেন সংস্কৃতির পূর্ণ রূপ ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ, গোড়ার কথাতেই ফিরে আসা যাচ্ছে—সাহিত্য ও শিল্পকলা সংস্কৃতির বিশিষ্টতম অঙ্গ।

এক মানুষের সঙ্গে আর এক মানুষের, এক জাতির সঙ্গে আর এক জাতির যোগাযোগ-সাধন প্রকৃত সংস্কৃতির অন্যতম লক্ষণ। এ-ক্ষেত্রে সাহিত্য ও শিল্পকলার অবদান বিশদভাবে উল্লেখ করা বাহুল্য বলেই মনে হয়। শিল্পের প্রধান কথাই হলো প্রকাশ। এই প্রকাশ কিসের জন্য? স্পষ্টতই অপর মনের কাছে আমার কথাটি পৌঁছে দেবার জন্য। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ-কথাটা খুব স্পষ্টগ্রাহ্য।

সাহিত্যকে যদি সহৃদয় হৃদয়-সংবাদ বলি, তবে এর সাহায্যেই এক মনের সঙ্গে অপর মনের 'সহিতত্ব' জন্মায়। তাই এর নাম সাহিত্য। আমি এই কথা ভেবেছি, এই বেদনা পেয়েছি, এই আনন্দ উপভোগ করেছি, এই ছবি দেখেছি—তুমিও দেখ, তুমিও পাও, তুমিও উপভোগ করো,—এই কথা সাহিত্যিক বলতে চান। অন্যান্য শিল্পীরও এই একই কথা।

এক জাতির সঙ্গে আর এক জাতির মানসিক মিলনের ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার ঘটে। সাহিত্য ও শিল্পকলার মাধ্যমে এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের যেমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে, তেমন আর অপর কোনো কিছুর মাধ্যমে নয়। কারণ, এখানে যে পরিচয় ঘটছে মানুষের সঙ্গে মানুষের—যে-মানুষের মধ্যে বিশ্বের সর্বত্রই একটা আত্মীয়তা রয়েছে। এখানে রাজনীতির উগ্রতা নেই, ধর্মের উন্মত্ততা নেই, এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন ঘটে বলেই এ-মিলন আন্তরিক। একটা জাতির কি আশা, কি আকাঙ্ক্ষা, কি বেদনা, কি ঐশ্বর্য—তার সবই প্রকট হয় তার সাহিত্যে, তার শিল্পকলায়। তাই সেখানে যে আমরা একটা জাতিকে চিনি সেখানে আর কোনো ফাঁকি থাকে না।

সাহিত্য দুই জাতির মধ্যে যে মানসিক সেতু বেঁধে দেয়, তার একটি বিচিত্র দিক আছে। তা এখানে উল্লেখযোগ্য বলে মনে করি। কোনো দুটি জাতির মধ্যে হয়ত অন্য কোনো দিক দিয়ে বিবাদ থাকতে পারে, তবু সেই 'শত্রু' জাতির সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রতি অপর জাতি বিরূপ হয় না। একটি পরিচিত দৃষ্টান্তই এখানে উল্লেখ করা চলে। বৃটিশরা আমাদের দেশে দু'শ বছর রাজত্ব করে শোষণ ও অত্যাচার চালিয়ে গেছে। তাদের প্রতি আমাদের বিরূপতার সীমা ছিল না। কিন্তু সেই বৃটিশ রাজত্বকালেও আমরা ইংরেজের

সাহিত্যকে ভালো না-বেসে পারিনি। স্বীকার করতেই হবে যে, অনেকেই ভালো চাকরি পাবার জন্য ইংরিজি শিখেছিল, কিন্তু শুধু ইংরিজি সাহিত্যকে ভালবেসেই যারা জীবনব্যাপী তার সাধনা করেছে, তাদের সংখ্যাও নগণ্য নয়। বলা বাহুল্য, ইংরিজি সাহিত্যের উৎকর্ষই এর কারণ। আর ইংরিজি সাহিত্যের কাছে বাংলা দেশের ঋণই সবচেয়ে বেশি। শুধু ইংরেজ প্রথম বাঙলা দেশে এসেছিল বলেই এই ঋণ আমাদের বেশী তা নয়। অন্যান্য প্রদেশও ইংরেজ-জীবনের নানা দিক থেকে ঋণ নিয়ে নিজেদের সমৃদ্ধ করেছে, কিন্তু সাহিত্যটাকে বাঙালীর মতো কেউ নেয়নি। এবং বাংলা সাহিত্যের ওপর ইংরিজি সাহিত্যের প্রভাব এতই পরিচিত যে, তা বিশদ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না।

এখন প্রশ্ন উঠবে, শিল্পের ধর্ম কি ? বাগ্‌বিস্তার না-করে প্রথমেই বলা ভালো যে, শিল্পের ধর্ম হলো জীবনকে প্রকাশ করা। এ-জীবন কোনো খণ্ডজীবন নয়, এ-জীবন বিশ্বজীবন। কিন্তু এই বিশ্বজীবনকে জানার আগে চাই নিজেকে জানা। তবে 'আত্মানং বিদ্ধি'—নিজেকে জানো, এ-বাণী পুরোনো কালের। বর্তমানে এর সঙ্গে আর একটি নতুন কথা যোগ হয়েছে।—পরিবেশ ও প্রতিবেশীকে জানো। ব্যক্তির সঙ্গে এই বিশ্বমানবের যোগ যে-শিল্পে যত গভীর, সে-শিল্প তত সার্থক। জীবনের অখণ্ড রূপই শিল্পেব বিষয়বস্তু।

প্রত্যেক শিল্পসৃষ্টির জন্য চাই গভীর অধ্যবসায় ও নীরব প্রস্তুতি। লোকচক্ষুর অন্তরালে বিন্দুমাত্র খ্যাতির প্রত্যাশা না রেখে মহৎ শিল্পের সৃষ্টির জন্য এই নেপথ্য প্রস্তুতির সময়ই শিল্পী জীবনকে দেখেন, ভালবাসেন। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই শিল্পীর জীবন-পিপাসা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শিল্প তাই জীবনকে আলিঙ্গন করে, তাকে গ্রহণ করে তাতে নিজের বক্তব্য ফুটিয়ে তোলে। জীবন সম্পর্কে অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গিই

শিল্পকে সমসামিয়িকতার ঊর্ধ্বে, তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে চিরকালের বিষয়বস্তু করে তোলে। শিল্পে নেতি-বাদ অচল। প্রত্যয়ই শিল্পকে জীবনের সহযোগীরূপে বাঁচিয়ে রাখে। কেবল অস্বীকার, অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা দ্বারা জীবনকে জানা যায় না, বুঝা যায় না, মহৎ সাহিত্য বা শিল্পও সৃষ্টি করা যায় না। হুইটম্যানের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি মনে পড়ে:

'I am not the poet of goodness only,
I do not decline to be the poet of wickedness also.'

শুভ ও অশুভ, সুন্দর ও অসুন্দর, উভয়ের মধ্য থেকে এক মহত্তর কল্যাণকে বের করে আনাই মহৎ শিল্পীর কাজ, এটাই শিল্পের দায়িত্ব। শিল্পে শুধু শুদ্ধাচার কিংবা নীতিবাগীশদের প্রভুত্ব চলতে দিলে তাকে শেষ পর্যন্ত নিস্প্রাণ রসহীনতায় পর্যবসিত করা হবে। সেই সঙ্গে এ-কথাও মনে রাখা দরকার, শিল্প শুধু পর্নোগ্রাফি বা ফোটোগ্রাফি নয়। Art lies in concealment—কোনো শিল্পীর পক্ষেই এ-কথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। শিল্প আনন্দের সৃষ্টি, বেদনারও। জীবনের সপ্তবর্ণ রামধনুর রঙ থাকা চাই শিল্পে। তাকে একদেশদর্শী হলে চলবে না। সমগ্র জীবন, জীবনের অন্তর্বেদনা, তার আকাশচারী মন—সব-কিছুই আজ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী সাহিত্য ও শিল্পকলার শ্রেণীবাদের কথা বলেছেন। তাঁদের মতে, সাহিত্য ও শিল্পের কারবার হলো ব্যক্তিকে নিয়ে নয়, সমষ্টিকে নিয়ে। তাঁদের কাছে শিল্প হলো সমাজ-বিপ্লবের হাতিয়ার। তাঁরা বলেন, যে-যুগে যে-শ্রেণী প্রতাপশালী হয়ে উঠেছে, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে, সে-যুগে সেই শ্রেণীই সাহিত্যে ও শিল্পে প্রাধান্য পেয়েছে। সে-যুগে তারাই হয়েছে সাহিত্য ও শিল্পের কুশীলব। এ-যুগে ইতিহাসের যখন মোড় ফিরেছে, ইতিহাসের পালে লেগেছে নতুন যুগের হাওয়া, তখন এ-যুগে সাহিত্যের ও শিল্পের ভিত্তিভূমিরও পরিবর্তন ঘটবে। বুর্জোয়া শিল্পের ও সাহিত্যের

পরিবর্তে এ-যুগে রচিত হবে গণশিল্প, গণসাহিত্য। সে-শিল্পে সর্বহারা কিষাণ-মজুরদেরই প্রাধান্য থাকবে। শুধু প্রাধান্যই থাকবে না, এ-যুগের সাহিত্য ও শিল্প কিষাণ মজুরদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখেই রচিত হবে।

সবিনয়ে নিবেদন করবো, শিল্পে এই ধরনের শ্রেণীবাদ যুক্তিসহ নয়। সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য (এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও) হলো বিশ্বমানবের সম্পদ। সেখানে কোনো বিশেষ শ্রেণীর একচেটিয়া অধিকার নেই। শিল্পের ক্ষেত্রে এইরূপ একটি সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে সত্যি-কারের শিল্প-রচনা সম্ভব নয়। আমাদের রামায়ণ-মহাভারত কোন্ যুগের সৃষ্টি? কিংবা অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্? এ-দেশের কিষাণ-মজুররা কি এ-সব গ্রন্থ পাঠে আনন্দ পাবে না?

তা ছাড়া সামাজিক ক্ষেত্রে, রাজনীতির ক্ষেত্রে মানুষকে যত সহজে পৃথক করা সম্ভব, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা তত সহজ ব্যাপার নয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে অস্পৃশ্য বলে কোনো কথা নেই। সাহিত্যের ক্ষেত্র হলো তীর্থক্ষেত্রের মতো। সেখানে সবার অবাধ প্রবেশাধিকার।

বস্তুত, মানুষে মানুষে যেমন স্বাতন্ত্র্য আছে, মানুষে মানুষে মিলও বড় একটা কম নেই। স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা, আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি প্রভৃতি অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের সঙ্গে মানুষের একটা স্বাভাবিক মিল আছে। এই মানবিক আবেদনকে অবলম্বন করে যে-শিল্প রচিত হবে তা কি চাষী-মজুর, কি শিল্পপতি, কি বুর্জোয়া-গোষ্ঠী—সবার কাছেই সমান সমাদর পাবে। কাজেই শিল্পের ক্ষেত্রে গণশিল্প বা সর্বহারা সংস্কৃতি বলে কিছু কথা নেই, এর সকল কিছুর ওপরই সকল মানুষের অবাধ অধিকার। ট্রটস্কির কথায়ঃ

'There is no workers' Culture and that there will never be any, and in fact there is no reason to regret this. The worker acquires power for the purpose of doing away forever

with class-Culture and to make way to human Culture ; we frequently seem to forget it ?' [২]

বিনা প্রয়োজনের যে আনন্দ রবীন্দ্রনাথ তাকেই শিল্প ও সৌন্দর্যের স্বরূপ বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলেন : 'সৌন্দর্য যে কেবলমাত্র প্রয়োজনবিহীন তাহা নহে, এক হিসাবে তাহা সত্যবিহীন ও ভালোমন্দমর্যাদাবিহীনও বটে।…সৌন্দর্যের সহিত আনন্দ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, অথচ এ-আনন্দ সাধারণ প্রয়োজনসিদ্ধির আনন্দ নয়। এ-আনন্দের মধ্যে চাওয়ার তৃপ্তি নাই, কেবল পাওয়ার তৃপ্তি আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও বলিতে হয় যে, সৌন্দর্যের সহিত চাওয়াও জড়িত আছে, আমরা সুন্দর গান শুনিতে চাই, সুন্দর কবিতা শুনিতে চাই, সুন্দর ফুল দেখিতে চাই, সুন্দর ছবি দেখিতে চাই, কিন্তু এখানে চাওয়াটা অন্তরঙ্গ নয়, বহিরঙ্গ। আগে সৌন্দর্যের তৃপ্তি, তারপর সেই তৃপ্তিকে আরও দীর্ঘকাল পাইবার জন্য চাওয়া। সৌন্দর্যের তৃপ্তি চাওয়ার পরিপূরক নহে।' রবীন্দ্রনাথ এই কথাই একটি কবিতায় বলেছেন :

'আমি চেয়ে আছি বিস্ময় মানি
রহস্যে নিমগন।
এ যে সঙ্গীত, কোথা হতে উঠে,
এ যে লাবণ্য, কোথা হতে ফুটে,
এ যে ক্রন্দন, কোথা হতে টুটে
অন্তর বিদারণ!
নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়,
নূতন বেদনা বেজে উঠে তায়
নূতন রাগিণী ভরে।'

২ *Literature and Revolution*

জাগ্রত স্ফুট-মনের সঙ্গে অভ্যন্তরস্থ অস্ফুট মনের যে দ্বন্দ্ব কাব্যসৃষ্টির সময়ে হয়, তা এই কবিতাটিতে প্রকাশ পেয়েছে। জাগ্রত মনের বুদ্ধি-জ্ঞান ও ভাষার সম্পদে আপনার মধ্যে প্রতিভাত অস্ফুট মূর্তিকে স্ফুট করার চেষ্টাই শিল্পসৃষ্টির প্রধান রহস্য। মোট কথা, অন্তরের প্রেরণাই সৌন্দর্যসৃষ্টির মূল উৎস। রবার্ট ব্রাউনিং এক জায়গায় এই কথাই বলেছেন:

'All is as God overrules
Besides incentives come from the soul's self,
The rest avail not.'

অথচ মূল উৎস-প্রেরণার সাক্ষাৎ পেয়েও অনেকেই পরিপূর্ণভাবে তাকে প্রকাশ করতে পারে না। সুন্দর বলে যা গৃহীত হয় তাকে অনেক সময় দু'দিক থেকে বিশ্লেষণ করা হয়। যেমন, বিষয়বস্তু বা content এবং প্রকাশভঙ্গি বা form। অনেকের মতে, বিষয়বস্তুর ওপর সৌন্দর্য নির্ভর করে, কেউ বলেন প্রকাশভঙ্গির ওপর। আবার কেউ কেউ বলেন, উভয়ের সম্মিলনের ওপর। ক্রোচের (Croce) মতে 'প্রকাশভঙ্গিই সৌন্দর্যের প্রাণ'।

সৌন্দর্য-সমালোচনায় রাস্কিন অনেক উচ্চাঙ্গের ভাবের অবতারণা করেছেন। তাঁর চিন্তাধারার পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য আমাদের চিত্তকে স্পর্শ করে ও পূত করে। রাস্কিন, টলস্টয়-এর মতো 'যা সকল চিত্তের মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে তাকেই আর্ট বলা যায়'—এই নিয়মের অনুসরণ করেননি। আবার 'যা সকলের উপকারে আসে তাকেই আর্ট বলে'—এ নিয়মও গ্রহণ করেননি। পরন্তু প্রয়োজনের অতীত ও প্রয়োজন-নিরপেক্ষ বলেই তিনি আর্টকে নির্দেশ করেছেন। আর্টের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য, নীতি ও ধর্ম শিক্ষা দেওয়া—এ-কথাও তিনি বলেননি। তিনি বলেছেন, একমাত্র বাহ্যবস্তুই সৌন্দর্যের আধার।

যে পরিমাণে আমাদের দর্শন বিশুদ্ধ ও মুক্ত সেই পরিমাণে আর্টও সৌন্দর্য-সার্থক। সৌন্দর্যের স্থান কেবলমাত্র দৃশ্যজগতের মধ্যে। এই জগতের মধ্যে রেখাবিন্যাস বা বর্ণবিন্যাস প্রভৃতি বিভিন্ন উপায় আমাদের অন্তরস্থিত নানা রূপকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। কিংবা তার নানা গুণের প্রতীকস্বরূপ হয়েও দাঁ গতে পারে। অথবা জীব-জগতে প্রাণেব আনন্দ প্রকাশস্বরূপ প্রতিভাত হতে পারে। অথবা এমনও হতে পারে যে, এই জীবজগতে প্রাণীকে ঈশ্বর যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন সেই কাজের পূর্ণতায় সৌন্দর্যেব বিকাশ হতে পারে। এই চার রকম উপায়ে সৌন্দর্য আমাদের স্পর্শ করতে পাবে। আর্টের সম্বন্ধে চরম কথা হলো, এই চাব রকমের অবস্থিতি শ্রীভগবানেবই অবস্থিতি। সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কবতে গিয়ে জনৈক প্রসিদ্ধ সমালোচক এই কথাই বলেছেন যে,

'We have seen that this subject matter is referable to four general heads. It is either the record of conscience written in things external, or it is symbolising the Divine attributes in matter, or it is the felicity of living things or the perfect fulfilment of their duties and functions In all cases it is something Divine, either the approving voice of God, the glorious symbol of Him, the evidence of His kind presence or the obedience to His will by Him induced and supported.'

এ যাবৎ আমরা মূলত সৃষ্টিকার্য হিসাবে শিল্পেব আলোচনা কবেছি। কিন্তু শিল্প উপভোগের কথাও আমাদের আলোচনা করা বিধেয়।

বস্তুত, শিল্প উপভোগ করেননি এমন ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সাহিত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত—কোনো-না-কোনো শিল্প উপভোগ প্রত্যেকেই করেছেন। আমাদের মধ্যে অনেকের শিল্প-সম্ভোগের পরিমাণ বেশী, কারো বা আবার অল্প। কিন্তু শিল্প-সান্নিধ্যলাভ সকলেরই ঘটেছে।

সাধারণের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বলতে হবে, এই শিল্প-সম্ভোগের নীট ফল আনন্দলাভ। অবশ্য, বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই আনন্দের রকমফের ঘটে। কিন্তু আনন্দলাভটাই সম্ভবত শিল্প-সম্ভোগের মূল কথা।

কিন্তু অনেক মানুষের ক্ষেত্রেই শিল্প শুধু সাময়িক আনন্দের উৎস নয়, তাদের জীবনের একটা অঙ্গ। তাই সে-ক্ষেত্রে শিল্পের প্রভাব গভীরতর। জে. সি. পাওঈস (Powys) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে[৩] সাহিত্য প্রসঙ্গে যা বলেছেন, সমগ্র শিল্পকলার ক্ষেত্রেই তা প্রণিধান-যোগ্য:

'A person certainly does not realize all in a moment the influence that literature exerts over human minds. It is only when we have saturated ourselves in these things, only after we have read these books over and over again that the charm begins properly to work. But delayed though it may be the moment will come at last when we find ourselves better able to cope with our misadventures because of what we have caught, let us suppose, from the heroic fantasies of the author of *Don Quixote*, or from the sly humours of the author of *Tristram Shandy*.'

পাওঈস এখানে যে প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন তা অনেক গভীর দেশে বিস্তৃত।

এই প্রভাব জীবন সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করে, জীবনকে চিনতে শেখায় এবং শেষ পর্যন্ত বাঁচতে উদ্‌বুদ্ধ করে। কিন্তু কবিতার গভীরতম প্রভাব সম্পর্কে পাওঈস যা বলেছেন, সমগ্র শিল্পের প্রভাব সম্পর্কে তাই সম্ভবত শেষ কথা:

'The profoundest gift of the spirit of poetry to a person's secret culture is the gift of peace. Poetry can reconcile a man or a woman to the simplest and barest worldly situation.'

৩ *The Meaning of Culture*

ধর্ম ও দর্শনচর্চায়

মানুষ যেদিন প্রথম তার স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে এই পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়াবার উদ্যোগ করেছিল, সেদিন না ছিল তার কোনো সহায়, না ছিল কোনো বন্ধু। শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে কিংবা গুহার অন্ধ কোটরে অতিক্রান্ত হতো তার প্রতিটি শঙ্কিত মুহূর্ত। অরণ্যচারী ভয়ঙ্কর পশুর দলই শুধু সেদিন তার শত্রু ছিল না, প্রকৃতির নির্দয় আঘাতও তখন তাকে সইতে হতো প্রতিনিয়ত। ভূমিকম্প, বন্যা, দাবানল, আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্রোত বারংবার দারুণ আঘাতে ধ্বংস করে দিত তার সব-কিছু, আর ঊর্ধ্বাকাশে দৃষ্টি মেলে অসহায় মানুষ তখন কেবলি জানতে চাইত কোন্ অজ্ঞাত শক্তির অন্ধ আক্রোশে বার বার এমনি করে ভেঙে যায় তার সংসার—তার সুখের নীড়। শেষে সর্বশক্তিমান ঐ অজ্ঞাত শক্তিকেই সে একদিন 'ভগবান' বলে ডাকতে শুরু করলো।

তাই বলা চলে, মানুষ যখন প্রথম ভগবানের শরণার্থী হয়েছিল তখন সে তা ভক্তিতে বা শ্রদ্ধায় হয়নি, হয়েছিল ভীতিবিহ্বলতায়। ভগবানকে সে প্রথম জেনেছিল নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর বলে, মানুষের ক্ষতি এবং সর্বনাশেই যার অপার আনন্দ! মানুষ তাই জানতে চেয়েছিল কোন্ মন্ত্রবলে ভগবানের এই ক্রুদ্ধ আক্রোশের সর্বনাশা আক্রমণ থেকে সে নিজেকে এবং তার প্রিয়জনদের রক্ষা করতে পারে।

ভীত-ত্রস্ত মানুষের এই দিশেহারা দুশ্চিন্তার সুযোগে সামনে এগিয়ে এল একদল চতুর লোক যারা তাদের আয়ত্তগত বিশেষ কতকগুলি চাতুর্য এবং জাদু দেখিয়ে আর-সকলকে বোঝাল যে,

তারাই ঈশ্বর-প্রেরিত এবং ভগবানের ইচ্ছার খবরাখবর শুধু তারাই পেতে পারে তাদের ঐশী শক্তির জোরে। সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করলো সে-কথা এবং যা তারা করতে বললো তাই করে যেতে লাগল নিজ নিজ ও প্রিয়জনদের কল্যাণ-কামনায়। এমনি করেই এল ধর্ম ও ধর্মের অবধায়ক পুরোহিত সমাজ। আর এই পুরোহিত-সেবিত এক-এক দেবতার মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে লাগল এক-একটি জনপদ। কল্যাণ-চেতনা থেকেই ধর্মবোধের উন্মেষ এবং সংস্কৃতির বীজও প্রথম অঙ্কুরিত হয় এই কল্যাণ-চিন্তা থেকেই। জনপদ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম ও সংস্কৃতিবোধের প্রসারের সূচনা। তারই জন্য ধর্ম ও সংস্কৃতির সম্পর্ক এত নিগূঢ় এবং এত নিবিড়।

মানব-সভ্যতার সেই আদি যুগে সারাদিনের কাজের শেষে প্রায় সবাই এসে জমা হতো এক-একটি মন্দির-প্রাঙ্গণে, আর পুরোহিতদের সঙ্গে নানা বৈষয়িক প্রসঙ্গ আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইত জীবন ও সৃষ্টির নানা রহস্য ও নানা সমস্যার সমাধান। এমনিভাবেই মানুষ ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করলো যে, শুধুমাত্র দিনগত পাপক্ষয়ের উদ্দেশ্যেই তার এ জগতে আসা নয় এবং ভগবানের এ রাজ্য শুধু পাপের পঙ্কিল আবর্তও নয়। বুঝতে শুরু করলো সে, এই বিশ্ব-সৃষ্টির পশ্চাতে রয়েছে কোনো মহতী ইচ্ছা। ধর্ম-অনুপ্রাণিত মানুষের এই ঈশ্বরের উপলব্ধিই দর্শন-চর্চার গোড়ার কথা।

বাঁচার প্রয়োজনে অরণ্যচারী পশুর মতোই মানুষও একদিন ছিল নৃশংস ও ভয়ঙ্কর। কিন্তু সাংস্কৃতিক চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে সেই নৃশংসতা ও আরণ্যক বৃত্তিগুলি মানুষ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করলো। সীমাহীন জ্ঞানতৃষ্ণা সহস্র সহস্র জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুললো তার মনে। জৈবিক ক্ষুধা তৃপ্তির সহজ উপায় হাতের কাছে থাকা সত্ত্বেও নিত্য নতুন জ্ঞান-ক্ষুধার আবিষ্কারে সে মেতে উঠলো তার চিন্তায়, তার

মননে। কেন সে এসেছে এই জগতে; এই বিশ্ব এত সুন্দর, কেন তবু এত ভয়ঙ্কর; কোন্ মঙ্গলময়ের ইচ্ছার প্রতিফলন এই মহাবিশ্ব; কেন তিনি সময় সময় এত ভীষণ ও ভয়ঙ্কর এবং কেন তাঁর আবির্ভাব এত রহস্যময়?—এমনি সব প্রশ্নে আলোড়িত হতে থাকল মানুষ। মন্দির-দেবতাকে শুধু চোখ দিয়ে দেখেই সে আর তৃপ্ত থাকতে পারল না, সে দেখতে চাইল মন দিয়ে, চিন্তা দিয়ে। এই মন ও চিন্তার দেখাই দর্শন। মানুষ জানতে চাইল নিজেকে, জানতে চাইল নিজের মধ্যে দিয়ে বিশ্বকে। রাসেলের কথায় বলা চলে,

'All acquisition of knowledge is an enlargement of the self.' ১

কিন্তু এই নিজেকে জানাই এ সংসারে সবচেয়ে কঠিন কাজ, যে জানার জন্য নিজেকেই গৌণ করতে হয় সবার আগে। আমি যা জেনেছি তাই সত্য, তার বিপরীত ও বিরুদ্ধ যা-কিছু তা সবই মিথ্যা—এ অহঙ্কার যার মনে বাসা বাঁধার সুযোগ পেল তার দর্শনের দৃষ্টি গেল চিরকালের জন্য ঝাপসা হয়ে। এ বিশ্ব হবে আমার অনুগামী, জগতের সব-কিছু নিয়ন্ত্রিত হবে আমার শাসনে—এমন অসম্ভব দাবি স্থূলদৃষ্টি রাজনৈতিকের মনে স্থান পেতে পারে, দার্শনিকের মনে নিশ্চয়ই নয়। এ প্রসঙ্গ আলোচনায় রাসেল পরিষ্কারভাবেই বলছেন,

'Philosophy is to be studied not for any definite answer to its questions, since no definite answers can, as a rule, be known to be true, but rather for the sake of the questions themselves, because these questions enlarge our conception of what is possible, enrich our intellectual imagination and diminish the dogmatic assurance which closes the mind against speculation, but above all because, through the greatness of the universe which philosophy contemplates, the mind

১ *Problem of Philosophy* : Bertrand Russel

is also rendered great, and becomes capable of that union with the universe which constitutes its highest good.' [২]

মনের গুরুত্ব আমরা অনেক সময়ই ভুলে থাকি এবং অনেক সময় আবার মনকে আমাদের দেহের এক বিরুদ্ধ শক্তি বলে ধারণা করে থাকি।

'Perhaps we treat body and mind as opposite in kind, when in fact each is one face of a single two-faced reality.' [৩]

মন আর দেহ যে অভিন্ন, তারা যে একই সত্তার দুই ভিন্ন প্রকাশ, এ-কথা ভুলে যাই আমরা যখন দেহের প্রয়োজনকে বড় করে দেখি। দেহকেই সব বলে মেনে নিয়ে মনকে হত্যা করি দেহের দাবি মেটাতে। তাইতো দেখি ঐশ্বর্যমত্ত ধনীর কানে কাঙালের কান্না পৌছায় না, রক্তলোলুপ ঘাতকের হিংস্র দৃষ্টিকে অসহায়ের অশ্রুর চেয়েও বেশি আকৃষ্ট করে অসির উজ্জ্বলতা। কোনো সংস্কৃতিবান মানুষই তার সাংস্কৃতিক চেতনাকে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন না দিয়ে আপন মনকে এভাবে বিধ্বস্ত হতে দিতে পারে না। আর মনের এরূপ পরাজয়ে মানুষ কিন্তু কখনো জেতে না। কারণ এমনি অবস্থায় সে হারিয়ে ফেলে তার মনুষ্যত্ব। এমন পরাজয় এবং এমন গ্লানির সম্মুখীন কোনদিন কোনো দার্শনিককে হতে হয় না। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তাই দার্শনিক বলতে পারেন—'জীবন সঁপিয়া জীবনেশ্বর পেতে হবে তব পরিচয়, তোমার ডঙ্কা হবে তো বাজাতে সকল শঙ্কা করি জয়।' তারই জন্য মৃত্যুকে হার মানতে হয়েছে সক্রেটিস ও যীশুর কাছে, হার মানতে হয়েছে লিংকন ও গান্ধীর কাছে।—কিন্তু জয়ী হয়েছে সে চেঙ্গিজ ও এটিলার কাছে, হিটলার ও মুসোলিনীর কাছে। মানব-সভ্যতার শুরু থেকে আজ অবধি এ ইতিহাসের

---

২ *Problem of Philosophy* : Bertrand Russel

৩ *The Science of Life, Book B.* : H. G. Wells, Julian Huxley and G. P. Wells

কোনো ব্যতিক্রম নেই। সমগ্র জীবনকেই যাঁরা ধর্মীয় অভিযাত্রা বলে গ্রহণ করেছেন, দেহকে জেনেছেন মনের পবিত্র আধার বলে, তাঁদের মনকে কখনো কলুষিত করতে পারেনি দেহের পাপ। বৌদ্ধ দর্শনে মনকে নিষ্কলুষ রাখাটাই সবচেয়ে বড় কথা, ধর্মের চেয়েও মন বৌদ্ধদের কাছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। 'মন আগে ধর্ম পিছে, ধর্মের জনম হলো মনে।' কাজেই তেমন নিষ্পাপ মনের অধিকারী যাঁরা, তাঁরা মৃত্যুর কঠিন আঘাতে যে আরও পবিত্র, আরও উজ্জ্বল এবং জ্যোতির্ময় হয়ে উঠবেন, মৃত্যুর গরল অমৃত হয়ে যে অমরত্ব দান করবে তাঁদের নবজীবনকে, তাতে আর সন্দেহ কি!

হিংসায় উন্মত্ত যখন সারা ভারতবর্ষ, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্ররোচনায় রক্তস্রোত বইছে যখন মন্দিরে মন্দিরে, মর্ত্যের ধূলিতে আবির্ভূত হলেন তখন গৌতম বুদ্ধ। অন্তর্বিপ্লব ও রাষ্ট্রদ্রোহে যখন মহাচীন ক্ষত-বিক্ষত, সেই সময় সেই দেশের পবিত্রাতারূপে দেখা দিলেন লাওৎসে, কনফুসিয়াস। ঠিক এমনিভাবেই প্রায় দু'হাজার বছর আগে রোম সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলিত মানুষকে মুক্তির পথ দেখাতে এসেছিলেন যীশু-খ্রীষ্ট এবং তার কয়েক শতাব্দী পরে আরবের ঊষর মরুতে প্রেমের বারিধারা-সিঞ্চনে ও ঐক্যের বাণী প্রচার করতে হজরৎ মহম্মদ। এমনি করেই যুগে-যুগে আবির্ভাব ঘটেছে এক-একজন যুগপুরুষের, —পথ-হারানো মানুষকে পথের নিশানা দিতে।

কি সেই পথের নিশানা? মহাপুরুষদের সকলেরই মূল কথা প্রায় একই রকমের—ক্ষমা করো, সকলকে ভালবাস প্রাণভরে। জগতে আসা শুধু নিজেদের জন্য নয়, নিজের স্বার্থের খোলসের অন্ধকারে শামুকের মতো গুটিয়ে থাকতে নয়। জগতের সব আলোই তোমার জন্য, স্বার্থের প্রাচীরবেষ্টনে আত্মগোপন করে ঐ আলো থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখো না। নিজেকে নিঃশেষে উজাড় করে

দাও, শতগুণে ফিরে পাবে প্রতিদান এবং তার মধ্য দিয়েই ঘটবে ঈশ্বরোপলব্ধি। মহাপুরুষদের এই সব বাণীই তো সংস্কৃতির আসল শিক্ষা।

আত্মকেন্দ্রিকতাই মানুষের আদিম পাপ, এ মন্তব্য করেছেন বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি। তাঁর মতে, এই আত্ম-কেন্দ্রিকতা হচ্ছে মানুষের স্বভাবের এক চিরন্তন দুর্বলতা যা থেকে মুক্ত হতে না পারলে মানুষেব মনে যথার্থ ঈশ্বরবোধের উন্মেষ কখনো ঘটতে পারে না। অথচ 'Man's goal is to seek communion with the presence behind the phenomena, and to seek it with the aim of bringing his self into harmony with this absolute spiritual reality.'[৪]

বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরালবর্তী সত্য বা শক্তির সঙ্গে অর্থাৎ বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনই মানুষের চরম লক্ষ্য এবং আত্মস্বার্থবোধই সে-পথে সবচেয়ে বড় বাধা। চর্মচক্ষে সে শক্তিকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়, তার জন্য দরকার দিব্যদৃষ্টির। আমরা যা-কিছু দেখছি বা যা-কিছু ভোগ করছি তাই সত্য, এ ধারণা ভুল। তার বাইরেও সত্য আছে, দর্শনশাস্ত্র আমাদের সেই শিক্ষা দেয়। আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনা দর্শনশাস্ত্রের সেই গূঢ় তাৎপর্য অনুধাবনে আমাদের সাহায্য করে।

'The problem or aim of philosophy is often represented as the ascertainment of the essence of things a phrase which only means that things instead of being left in their immediacy must be shown to be mediated by, or based upon, something else. The immediate Being of things is thus conceived

৪ *An Historian's Approach to Religion*: Arnold J. Toynbee

under the image of a rind or curtain behind which the Essence lies hidden'[৫]

বস্তুর সেই স্বরূপ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তার অব্যবহিত যে অস্তিত্বকে আমরা প্রত্যক্ষ করি, তা সেই বস্তুর আবরণ বা খোসা মাত্র। এই আবরণের অন্তরালে রয়েছে প্রকৃত বস্তুস্বরূপ বা বস্তুসার। ব্যবহিতভাবে বা অন্য কোনো ভিত্তির ওপর উপস্থাপন করে তবেই সেই স্বরূপকে যথার্থ উপলব্ধি করা যাবে। তবুও তা সহজ নয়। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'আমি কিরূপ, কত বড়ো তা আমার নিজের কাছেই স্পষ্ট নয়' তবে 'অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ। অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥'[৬] অর্থাৎ, ঈশ্বর প্রাণীমাত্রের মধ্যেই আত্মারূপে অবস্থিত এবং বাইরেও তিনিই তাদের আচ্ছাদন করে আছেন। সমস্ত শ্রেণীব জীবগণের তিনি আদি, মধ্য ও অন্ত অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও শেষগতি। এই সর্বব্যাপক ঈশ্বরবোধকে কেন্দ্র করেই ভারত-ধর্মের বিকাশ।

ভারত-ধর্মের এই রূপকে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে। তাতে কবি আমাদের 'ধর্ম' এবং ইউরোপীয় 'রিলিজিয়ন'-এর পার্থক্যটিও তাঁর অতুলনীয় ভঙ্গিতে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "য়ুরোপে রিলিজন বলিয়া যে শব্দ আছে, ভারতবর্ষীয় ভাষায় তার অনুবাদ অসম্ভব— কারণ ভারতবর্ষ ধর্মের মধ্যে মানসিক বিচ্ছেদ ঘটিতে বাধা দিয়াছে— আমাদের বুদ্ধি বিশ্বাস আচরণ, আমাদের ইহকাল পরকাল, সমস্ত জড়াইয়াই ধর্ম। ভারতবর্ষ তাহাকে খণ্ডিত করিয়া কোনোটাকে পোশাকি কোনোটাকে আটপৌরে করিয়া রাখে নাই। হাতের

৫ *Hegel's Logic, 2nd Ed.*, p. 208

৬ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, দশম অধ্যায়, বিংশতি শ্লোক

জীবন, পায়ের জীবন, মাথার জীবন, উদরের জীবন যেমন আলাদা নয়, বিশ্বাসের ধর্ম, আচরণের ধর্ম, রবিবারের ধর্ম, অপর ছয়দিনের ধর্ম, গির্জার ধর্ম এবং গৃহের ধর্মে ভারতবর্ষ ভেদ ঘটাইয়া দেয় নাই। ভারতবর্ষের ধম সমাজের ধর্ম—তাহার মূল মাটির ভিতরে এবং মাথা আকাশের মধ্যে—তাহার মূলকে স্বতন্ত্র এবং মাথাকে স্বতন্ত্র করিয়া ভারতবর্ষ দেখে নাই—ধর্মকে ভারতবর্ষ দ্যুলোক-ভূলোকব্যাপী, মানবের সমস্ত জীবনব্যাপী একটি বৃহৎ বনস্পতিরূপে দেখিয়াছে।" আমাদের দেশেরই আর এক যুগপুরুষের কথা, 'যত্র জীব, তত্র শিব।' সকল প্রাণীকেই ঈশ্বরাংশরূপে মনে করতে হবে, যুগ-যুগান্তর থেকে ভারতীয় ধর্মাচার্যগণ এই উদার মানবতারই শিক্ষা দিয়ে আসছেন।

সব দেশ, সব জাতির ধর্মগুরুদেরই আবেদন মানুষের মনের কাছে—সকলেরই নির্দেশের মূল কথা মনের সংস্কার। আর এই মনের সংস্কারই হলো সংস্কৃতি, তাই ধর্মেরও আসল কথা সংস্কৃতি। সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে ধর্মাচরণ হয় না, আবার ধর্মবর্জিত সংস্কৃতিও অন্তঃসারশূন্য হতে বাধ্য। যে ধর্ম মানুষের মনকে অস্বীকার করে অনুষ্ঠান-আড়ম্বরকে বড় করতে চেয়েছে, সে ধর্ম মানুষের মনে স্থান পায়নি এবং যে সভ্যতা ধর্মকে তুচ্ছ জ্ঞান করে বাহ্যাড়ম্বরকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে, সে সভ্যতাও অচিরেই ধূলায় লুণ্ঠিত হয়েছে। ইতিহাসের এ যেন এক অলঙ্ঘ্য লিখন। গ্রীস ও রোমের গৌরব-রবি যেকালে মধ্যাকাশে তখন তারা ধর্মাশ্রিত, ধ্বংস তাদের শুরু হলো সেইদিন থেকে যেদিন তারা ধর্মকে বিস্মৃত হলো ঐশ্বর্য ও বিলাসের মত্ততায়। প্রাচীন ভারত, প্রাচীন মিশর প্রভৃতির অধঃপতনের ইতিহাসও এ ছাড়া অন্য কোনো স্বতন্ত্র কাহিনী বহন করে না। ঋষির সামমন্ত্রের ধ্বনি যেদিন স্তব্ধ হয়েছে ভারত-অরণ্যে, সেইদিন থেকেই শত্রুর অসিঝঙ্কারের অনুরণন সচকিত করে তুলেছে ভারতবাসীকে। প্রথমে

আমরা হেরেছি মনে, পরে জাতি-দেহের শৃঙ্খলে সে পরাজয়ের সাক্ষ্য আমাদের বহন করে চলতে হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে।

আরব মরুর যাযাবররা একদিন ছিল ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর; যুদ্ধ এবং রক্তপাত ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী। সেই দারুণ হিংসার যুগে তাদের মধ্যে ঈশ্বর-দূতরূপে এলেন হজরৎ মহম্মদ. বিবাদ-জর্জর যুদ্ধ-ক্লিষ্ট প্রতিবেশীদের মধ্যে তিনি প্রেম ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করে চললেন। দু'একদিনের চেষ্টাতেই তিনি সকলের সমর্থন অর্জনে সমর্থ হননি, কিন্তু যখন তা সম্ভব হলো তখন অভূতপূর্ব দ্রুততায় সেই হিংস্র যাযাবর শ্রেণীর মধ্যে একটা ব্যাপক সাংস্কৃতিক বোধের বিস্তার ঘটে গেল। রক্তলোলুপ আরব শুধু আত্মস্থই হলো না, তারা গড়ে তুলল এক নতুন সভ্যতা। কাব্য, সাহিত্য, শিল্প সব-কিছুই অপূর্ব ও মনোরম হয়ে উঠতে লাগল ইসলামের পবিত্র স্পর্শে।

দিগ্বিজয়ী আরব এসে উপস্থিত হলো ভারতে। দুর্ধর্ষ তার রূপ। সংঘর্ষ শুরু হলো আরব আর প্রাচ্যে। অস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হার মানল প্রাচ্য, কিন্তু সংস্কৃতিব ক্ষেত্রে সম্মান অক্ষুন্ন রইলো উভয়-পক্ষেরই। সংস্কৃতির দুই ধারার মিলনে বিপুল উচ্ছ্বাস দেখা দিল মহাসমুদ্রে। প্রাচ্য স্বীকার কবে নিল ইসলামের শ্রী আর ইসলাম মেনে নিল প্রাচ্যের ধী। এই মহামিলনের প্রতীক আকবর,—পরিণতি মোগল সভ্যতা। ঔরঙ্গজেব অস্বীকার করতে গেলেন সেই মহান সত্যকে, ভেঙে খানখান হয়ে গেল মোগল সাম্রাজ্য!

ধর্ম মানুষকে মহৎ চিন্তার অনুপ্রেরণা দিয়েছে, সেই মহৎ চিন্তা সৃষ্টি করেছে মহৎ সাহিত্য, কালজয়ী শিল্প, বিশ্বজনীন সংস্কৃতি। তারপর সংস্কৃতির এক ধারার সঙ্গে আর-এক ধারার মিলনের ফলে দূর নিকট বন্ধু হয়েছে এবং পর হয়েছে ভাই। এমনিভাবেই বিভিন্ন

জাতির মিলনে গড়ে উঠেছে মহাজাতি। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানের মিলনক্ষেত্র ভারতের অধিবাসীরা আজ রাষ্ট্রনীতির সংজ্ঞানুসারে 'সেকুলর' হলেও মনের বিচারে তারা সর্বধর্মী। সর্বধর্মের প্রভাবে গড়ে উঠেছে তার সমাজ-মন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সংস্কৃতি এবং সভ্যতাও। 'সার্বভৌম ধর্ম' নামে একটি কথার সঙ্গে আমরা পরিচিত। হিন্দুধর্ম তথা ভারত-ধর্মের মতো পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মমাত্রই এক-একটি সার্বভৌম ধর্ম। কিন্তু 'I am the light of the world: he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.' বলে যে যীশুখ্রীষ্ট প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বে এই ঘোষণা করেছিলেন, সেই খ্রীষ্ট-ভক্তগণই সেই দীপশিখা-নির্দেশিত পথ পরিত্যাগ করে অন্ধকারের পথে চলেছে কেন, আজকের দিনে তাই বড়ো প্রশ্ন। বিশ্ববিখ্যাত বৃটিশ বৈজ্ঞানিক স্যার রবার্ট ওয়াটসন ওয়াট একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'Eight ounces of a substance I know can wipe out all life on earth, including animal life.'[৭]

বিজ্ঞানের শক্তি অতুলনীয় এবং বিজ্ঞান মানুষের পরম বন্ধুও বটে। কিন্তু ধর্মবর্জিত হলে এই শক্তিসাধনার ফল কিরূপ বিপজ্জনক হতে পারে, বৃটিশ রাডার আবিষ্কারক স্যার রবার্ট ওয়াটসন ওয়াট সেই কথাই এখানে বলতে চেয়েছেন। শুধু তিনিই নন, তারও আগে অনেকেই পাশ্চাত্য জগতের সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করে গভীর আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। নোবেল-পুরস্কারপ্রাপ্ত আঠারোজন বিশ্ব-বৈজ্ঞানিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দশ বছর অতিবাহিত হতে না হতেই আবার দিকে দিকে যুদ্ধায়োজন লক্ষ্য করে বিভিন্ন রাষ্ট্রের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন,

৭ *Montreal Speech*, January, 1959

'We saw with horror that scieice is giving mankind the means with which it can destroy itself.' ৮

ধর্মভাবের অভাবহেতু পৃথিবী আজ এমন একটা অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, সংস্কৃতিবান লোকমাত্রই মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আতঙ্কগ্রস্ত না হয়ে পারে না। কিন্তু এ অবস্থা কি একদিনেই হয়েছে? তা নয়। ধর্মবোধের অভাব ঘটলে নৈতিক অবনতি ঘটবেই এবং নীতিজ্ঞানহীন মানুষের কাছে হৃদয়হীনতা ভাববার মতো কোনো বিষয়ই নয়। দীর্ঘকাল পূর্বেই এই নৈতিক অধঃপতন পাশ্চাত্য জাতিগুলির মধ্যে ঘটতে শুরু হয়েছে এবং সেই অধঃপতন যে কতদূর ভয়ঙ্কর ও কদর্য হতে পারে, এক-একটা মহাযুদ্ধে আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি। তদানীন্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ তাই একবার ইংরেজ নর-নারীদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন,

'The one thing England needs is notmaterial things which we are bound to fight for. No, what England needs is a spiritual awakening. It is needed now more than ever.'

এবার দর্শনের কথায় আসা যাক। শুরুতেই যে কথা বলেছি, চিন্তা ও মন দিয়ে দেখাই হলো 'দর্শন'। শুধু চোখের দেখাতেই মানুষ যেদিন থেকে আর তৃপ্ত থাকতে পারলো না, যাবতীয় নৈসর্গিক সৃষ্টির আভ্যন্তরীণ সত্যকে সে উদ্ঘাটন করতে ব্যাকুল হয়ে উঠলো, দর্শনের আত্মপ্রকাশ ঘটলো সেইদিন। জীব, জগৎ ও পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে এই অনুসন্ধিৎসা বলতে গেলে মানুষের চিরসাথী। স্থান ও কালভেদে এই অনুসন্ধানের রূপ, প্রকৃতি ও পরিণতি অনেকক্ষেত্রে পৃথক রূপ নিয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখানো যেতে পারে যে, পাশ্চাত্য দার্শনিকদের চিন্তাধারার মূল প্রেরণা যেমন প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের বিস্ময়ানুভূতি

---

৮ *Statement by Eighteen Nobel-Laureates*, 15th July, 1955

ও প্রাকৃত জ্ঞানানুসন্ধিৎসা, ভারতীয় তথা প্রাচ্য দার্শনিকদের বেলায় সে-কথা প্রযোজ্য নয়—তাঁরা প্রেরণা পেয়ে আসছেন প্রাচীন ঋষিদের দুঃখানুভূতি ও অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা থেকে। পাশ্চাত্য দার্শনিক মুগ্ধ হয়েছেন প্রকৃতির সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যে এবং সেজন্যে তারই কারণ ও ব্যাখ্যা নির্ণয়ে তাঁরা মনোনিবেশ করেছেন। তারপর এই বাহ্যপ্রকৃতির জ্ঞানলাভের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে সংযুক্ত হয়েছে মানব-প্রকৃতি, সামাজিক রীতিনীতি এবং অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাবলী। কিন্তু ভারতীয় দার্শনিকের দৃষ্টিতে ইহজীবনের যাবতীয় সুখের ক্ষণস্থায়িত্বটুকুই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই জীবনের চেয়ে জীবনের পরিণতির প্রশ্নই বড়ো জিজ্ঞাসা হয়ে উঠেছে তাঁর মনে। এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীই ভারতীয় দর্শনের মৌল সত্য।

আপাতদৃষ্টিতে মানুষের দেহ-মন বড়ো হয়ে দেখা দিলেও, তার প্রকৃত পরিচয় তার চৈতন্যময় আত্মায়। কারণ তার দেহ ক্ষণস্থায়ী ও মরণশীল, কিন্তু তার আত্মা অজর অমর। বিশ্বপ্রকৃতিকেও ভারতীয় দার্শনিক ঠিক এই একই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করেছেন। তাঁদের মতে, মানবদেহের মতোই বিশ্বপ্রকৃতিরও বাহ্যিক অস্তিত্ব খণ্ডকাল-স্থায়ী এবং আধ্যাত্মিক সত্তায়ই তার নিত্য-সত্যতা। তার যাবতীয় সৃষ্টিই এক সর্বব্যাপী আধ্যাত্মিক ও নৈতিক নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। তাই জীবজগতের দুঃখভোগও তাঁদের কাছে এই নৈতিক অনুশাসনের অবিচ্ছেদ্য ও অনিবার্য অঙ্গ বলে মনে হয়েছে। তাঁরা বলেছেন, জন্ম এবং দুঃখভোগ ও মৃত্যুর মধ্য দিয়েই জীবজগৎ এগিয়ে চলেছে চরম উৎকর্ষের দিকে।

পাশ্চাত্য দর্শনের বিচার মূলত প্রাকৃত বলে তার সিদ্ধান্তও প্রধানত বিজ্ঞানভিত্তিক। অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিকের মতে, যা বিজ্ঞানসিদ্ধ নয় তা সত্য নয়, অতএব দর্শনের আলোচ্য বিষয়ও তা

েতে পারে না। কারণ তাঁরা মনে করেন, দর্শন বিজ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত। পাশ্চাত্য দর্শন বাস্তবিক পক্ষে দৃশ্যমান জগতের জ্ঞানে সীমাবদ্ধ এবং জীবের ঐহিক কল্যাণসাধনই তার আদর্শ ও চরম লক্ষ্য। সুতরাং পাশ্চাত্য ও ভারতীয় বা প্রাচ্য দর্শনেব তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে পারি যে, পাশ্চাত্য দর্শনের প্রধান আলোচ্য জীব ও জড়জগতের ঐহিক জীবন, আর ভারতীয় দর্শনের জিজ্ঞাস্য জীবাত্মার বন্ধনমুক্তি বা মোক্ষ। এক কথায়, প্রথমের লক্ষ্য 'প্রেয়' এবং প্রাচ্য দর্শনের লক্ষ্য 'শ্রেয়'।

কিন্তু বাইবে থেকে এই বিরোধ যত বড়ো বলেই মনে হোক, প্রকৃতপক্ষে এই দুই দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গীতে আসলে কোনো বিরোধিতা নেই। এ সত্য আমরা উপলব্ধি করতে পারি, যদি জীবনকে খণ্ড খণ্ড করে না দেখে তার আদি ও অন্তকে আমরা এক অবিচ্ছেদ্য অখণ্ড সম্পূর্ণতায় দেখবার চেষ্টা করি। ইহজীবন অনিত্য হলেও উপেক্ষণীয় নয় এবং পরজীবন অজ্ঞাত হলেও অসত্য নয়—এ উপলব্ধি আজ প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয় দর্শনেই মোটামুটি স্বীকৃতিলাভ করেছে। জীবকুল জড়জগতের এক আকস্মিক সৃষ্টি নয়, এই স্বীকৃতির মধ্যেই এ সত্য নিহিত রয়েছে যে, জীবের জাগতিক জীবনের পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তার সার্থকতা শেষ হয়ে যায় না। এই বৈচিত্র্যময় জগতের ভিত্তিই হলো এক আধ্যাত্মিক সত্তা, জড়প্রকৃতির যদৃচ্ছ খেয়াল নয়। সুতরাং অন্তহীন এ জীবনের অবিচ্ছিন্ন বিবর্তনধারায় কোনো অংশই তুচ্ছ বা উপেক্ষণীয় নয়, যদিও কোনো বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার জন্য তার কোনো বিশেষ দিক বড়ো হয়ে দেখা দিতে পারে কোনো বিশেষ দার্শনিকের চোখে। আসল কথা, যে মহাস্রষ্টার মহৎ ইচ্ছার প্রতিফলন এই বিশ্বচরাচর, সেই মহানায়কের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে দিয়ে যদি আমরা যথার্থই বলতে পারি, 'Thy

will be done', 'হৃদে এসে কর প্রভু যা ইচ্ছা তোমারি', তাহলেই ইহজীবন ও পরজীবনের প্রকৃত সার্থকতাকে আমরা উপলব্ধি করতে সমর্থ হবো।

তাইতো যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্মগুরু ও দার্শনিকরা সকলেই বার বার করে প্রায় একই কথা বলে গেছেন পৃথিবীর মানুষের উদ্দেশে এবং আমরা সাধারণ মানুষরা বারংবার ব্যর্থতা সত্ত্বেও তাঁদেরই অনুসরণ করার চেষ্টা করে চলেছি। মনুষ্যত্বের পথে এগিয়ে চলার নির্দেশই হলো তাঁদের নির্দেশ এবং সেই মানুষ হওয়ার সাধনাই সংস্কৃতিরও মূল কথা।

দার্শনিকদের উপদেশে আমরা যে সত্যকে এতকাল যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারিনি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি আমাদের সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ করেছে। আমরা আজ বুঝেছি যে, একক জীবনে মানুষ অসম্পূর্ণ, প্রায় অর্থহীন ; বিশ্বজোড়া মানুষ যতদিন না নিজেদের মধ্যে গড়ে-তোলা সব রকম কৃত্রিম ব্যবধানের বেড়া ভেঙে দিয়ে এক হতে পারবে, ততদিন পর্যন্ত ভগবানের মহৎ ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে যাবে। এই উপলব্ধিই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরলোকগত মহান রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের এক বাণীতে সম্যকভাবে ধ্বনিত হয়েছিল ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি 'জেফারসন দিবস'-এর স্মরণীয় সেই বাণীতে বলেছিলেন,

'If civilisation is to survive, we must cultivate the science of human relationships—the ability of all peoples, of all kinds, to live together and work together in the same world at peace.'

এই মহতী ইচ্ছাকে যদি বাস্তবে রূপায়িত করতে হয়, তবে এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, একেবারে গোড়া থেকেই গড়ার কাজে হাত দিতে হবে। সংস্কৃতি-শিক্ষার মূল কেন্দ্র হতে হবে বিদ্যালয়গুলিকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যান্ত্রিক যুগের প্রয়োজন

মেটাতে পৃথিবী জুড়ে সমস্ত বিদ্যালয়ই আজ প্রায় কারখানায় রূপান্তরিত। যে শিক্ষা মননের, যে শিক্ষা হৃদয়ের যন্ত্রের অন্তহীন ক্ষুধার দাবিতে, তা আজ নিতান্তই উপেক্ষিত। শুধুমাত্র যেসব সামান্য-বুদ্ধি বালক-বালিকার বিজ্ঞান-শিক্ষার যোগ্যতা স্বীকৃত হয় না, তারাই আজকাল নিতান্ত অনিচ্ছায় মানবিক শিক্ষার পাঠ গ্রহণ করে থাকে। ফলে, যাঁদের ওপর সে শিক্ষা বিতরণের দায়িত্ব, তাঁদের নিরুৎসাহিতাও হয়ে ওঠে সীমাহীন। রাষ্ট্রের উপেক্ষায় আজ আর মানবিক শিক্ষার তেমন কোনো স্বীকৃতিই তার দরবারে নেই। ফলে, সে শিক্ষার পরিণতি যে কী দাঁড়াতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আজ এই হলো সবচেয়ে বড় সঙ্কট।

বিখ্যাত বৃটিশ পণ্ডিত অ্যাশলি মণ্টেন বলেছেন, যে শিক্ষা-ব্যবস্থায় মনুষ্যত্ব বিকাশের সুযোগ নেই সে শিক্ষা-ব্যবস্থা শুধু অকেজোই নয়, সাংঘাতিক ক্ষতিকর। তাঁর নিজের কথায়ই বলি,

'The school must be considered as a most important agency in the teaching of the art and science of human relations.'

ডঃ রাধাকৃষ্ণণ-ও আমাদের শিক্ষা-সম্পর্কিত তাঁর রিপোর্টে বলেছেন,

'We are building a civilisation, not a factory or a workshop. The quality of a civilisation depends not on the material equipment or the political machinery but on the character of man. The major task of education is the im provement of character....Nations are not made chiefly by traders and politicians. They are made by artists and thinkers, saints and philosophers.'

এই রিপোর্টেই ডঃ রাধাকৃষ্ণণ বিবেকহীন বিজ্ঞানী ও রুচিহীন যন্ত্রবিদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে রাক্ষসরাজ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সম্পর্কে যে

৯ *On Being Human* : Ashley Moutaign.

১০ *Dr. Radhakrishnan's Report on Education*, p. 47

আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, ভারতের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় সেই আশঙ্কাকে কি খুব অমূলক বলে মনে হবার কারণ আছে ?

শিল্প-সাহিত্য, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র ও ইতিহাস সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত বিবিধ মূল বিষয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই উচিত এইসব বিষয়ে জ্ঞান-সঞ্চয় করা। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রয়োজনে এদেশে ধর্ম-শিক্ষার আবশ্যকতা আজ আর স্বীকৃত নয়, এমনকি অনেকক্ষেত্রে উপেক্ষিত ও উপহসিত। কিন্তু ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, জার্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি পৃথিবীর প্রায় সমস্ত উন্নত দেশেই ধর্মশাস্ত্র অবশ্যপাঠ্য। তাই যন্ত্র-সভ্যতায় এত অগ্রগতি সত্ত্বেও এ-সব শক্তিশালী দেশ তাদের মনের মহত্ত্ব হারায়নি। আর আমাদের আজ অন্তরে-বাইরে সর্বত্রই দৈন্য, সর্বক্ষেত্রেই রিক্ততা। বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ জন্মেছেন যে দেশে, বুদ্ধ শঙ্কর চৈতন্যের মতো ধর্মগুরু ও দার্শনিকের মাতৃভূমি যে দেশ, সে দেশের আদর্শভ্রষ্টতা ও অধঃপতন আজ কল্পনাতীত। এ অবস্থার প্রতিকার শুধুমাত্র যন্ত্র ও যান্ত্রিক শিক্ষায় সম্ভব নয়। এবং তা সাংস্কৃতিক রুচির পরিচায়কও নয়। এর জন্য প্রয়োজন ধর্ম ও দর্শনের আলোয় আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতিবোধকে নতুন করে উদ্ভাসিত করে তোলা। কেবলমাত্র যন্ত্রের জয়ধ্বনি না করে মানুষ যেদিন মুক্তকণ্ঠে মানুষের প্রাণধর্মের জয়গান গাইতে শিখবে, সেইদিনই নিখিল বিশ্ব সুস্থ ও সজীব হয়ে উঠবে।

সংযোগ ও সমন্বয়সাধনে

জীবতত্ত্বের বিচারে মানুষ সংখ্যাতীত জীবকোষের সজীব সমষ্টি। কিন্তু সমাজতত্ত্ব মানুষের এই সংজ্ঞাকে, ভ্রান্ত না হলেও অসম্পূর্ণ বলে মনে করে। তার মতে, মানুষ হলো সমাজবদ্ধ সংখ্যাতীত মনুষ্য-জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কারণ মানুষ যে তার একার অস্তিত্বে সম্পূর্ণ নয়, সমাজতাত্ত্বিক এ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তাব যুগ-যুগান্তের জীবনধারা পর্যালোচনা করে। দেখেছে সে যে, সমাজ ছাড়া মানুষের জীবন অনিশ্চিত, অসম্পূর্ণ, অর্থহীন।

মানুষের এই অখণ্ড, অবিচ্ছেদ্য সমষ্টিজীবনের কথা অতি সুন্দর-ভাবে বর্ণনা করেছেন John Donne তাঁব সপ্তদশ নিবেদনে। বলেছেন তিনি—

'No man is an island, entire of itself, every man is a piece of the continent, a part of the main',...any man's death diminishes me, because I am involved in humanity.'

সমাজবদ্ধ মানুষের এই পারস্পরিক নির্ভরতাকে ফ্রয়েড আর একভাবে বর্ণনা করেছেন তাঁর Psychoanalysis নিবন্ধে। তিনি বলেছেন—

'Adults do not overcome their childhood dependency.'

মানুষ যতই বড় হোক না কেন, তাব অন্যের উপরে নির্ভরতা কোনো অবস্থাতেই শেষ হয় না। শিশুর কাছে মায়ের যে স্থান, মানুষের কাছে সেই স্থান সমাজের, যদিও সে সম্পর্কের নিবিড়তা অতখানি প্রত্যক্ষ নয়।

মানুষের সঙ্গে তার নিজের সম্পর্ক যতখানি সমাজের সম্পর্কও

ঠিক ততখানিই। যে ভালবাসা নিয়ে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, তাই হয় উত্তরকালে সমাজ-জীবনের সঙ্গে তার সংযোগসেতু। বিরুদ্ধ পরিবেশে পড়ে যে শিশুর হৃদয়ের ভালবাসার উৎস শুষ্ক হয়ে যায়, বড় হয়ে সে-ই হয় নিঃসঙ্গ, নিষ্ঠুর ও দলছাড়া। এই কারণে মনুষ্যজীবনের উন্নতি ও বৃদ্ধির সঠিক পথ নির্ধারণ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানী এলফ্রেড এডলার বলেছেন,

'The individual's proper development can only progress if he lives and strives as a part of the whole . . . all our functions are calculated to bind the single individual to the community and not to destroy the fellowship of man with man.'

এই যে আমাদের চোখের দেখা, এ শুধু নেহাতই একটা শারীরিক প্রক্রিয়া নয়। বুদ্ধিলুপ্ত নির্বোধের দেখা না দেখারই সমান। চোখের রেটিনায় যা-কিছু প্রতিবিম্ব পড়ে, তার গ্রহণ ও সঠিক কার্যকরণই হলো দেখার উদ্দেশ্য। এই দেখাই হলো দর্শন। দর্শনেন্দ্রিয়ই প্রমাণ করে যে, সারা সমাজ ধরে চলেছে যে দেওয়া ও নেওয়ার পালা, প্রত্যেক স্বতন্ত্র মানুষ হলো তারই এক-একটি অংশ। মানুষের দেখা, শোনা বা কথা বলা তখনই সার্থক হয়, যখন সে বহির্জগতের স্বার্থ ও সত্তাকে নিজের সঙ্গে একাকার করে দিতে পারে। তার বিচার-বুদ্ধি ও সাধারণ জ্ঞানের লক্ষ্য হলো চিরন্তন সত্য, আর সে লক্ষ্যে এগিয়ে চলার পথে তার বাহন হলো সম্মিলিত সমাজ-জীবন। আমাদের যাবতীয় দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়া তখনই সঠিক, স্বাভাবিক ও সুস্থপথে এগিয়ে চলেছে বলে স্বীকৃত হয় যখন দেখা যায় তারা উদ্‌বুদ্ধ হয়েছে সামাজিক চেতনা দিয়ে এবং মানিয়ে নিয়েছে নিজেদের সমাজের সম্মিলিত জীবনের সঙ্গে।

আজকের পৃথিবীর যে-কোনো সমস্যা বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায় যে, তার মূলে রয়েছে সমাজবদ্ধ মনুষ্যজীবনের এই প্রাথমিক সত্য-

টুকুকে অস্বীকারের প্রয়াস। যখনই কোনো দুর্বুদ্ধিগ্রস্ত নিজ শক্তিকে অজেয় জ্ঞান করে সমাজকে অস্বীকার করতে যায়, তখনই ঘটে সর্বনাশা অনর্থ। সমাজকে তখন রুখে দাঁড়িয়ে তাকে সমঝিয়ে দিতে হয় যে, তুমি যত বড়ই হও, সমাজের চেয়ে বড় নও।

তাই দেখি ইতিহাসের সেই অজ্ঞাত প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মানুষের এই সমাজগঠনের প্রয়াস। দম্ভ, কুসংস্কার, প্রাকৃতিক ব্যবধান বারে বারে দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায় গড়ে তুলতে চেয়েছে মানুষের এই মেলার পথে, কিন্তু কোন বাধাই টেকেনি। মিলনের রথ যুগের পর যুগ ধরে এগিয়ে চলেছে সব ব্যবধান গুঁড়িয়ে দিয়ে। এই মিলন ও সমন্বয়ের ইতিহাসই হলো মানুষের সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাস।

সংস্কৃতির যে কোনো ভৌগোলিক সীমা নেই, বন্ধু যে ছড়িয়ে আছে ত্রিভুবন জুড়ে, এ-কথা মানুষ তার সৃষ্টির শুরুতেই ভাবতে পেরেছিল। আড়াই হাজার বছর আগে যেদিন প্রকৃতি ও রাজনীতির বাধায় গ্রীস শতধা বিভক্ত ছিল, সেদিনও আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্র গড়ে তোলার উৎসাহ তার কম ছিল না। গ্রীসের সব রাষ্ট্রের সকল মানুষ সেদিনও নিজেদের আদি জননী হেলেনের সন্তান বলে মনে করত, পূজা দিতে আসত একই দেবদেবীর মন্দিরে। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সমবেত হতো অলিম্পিকের উৎসবমুখর প্রাঙ্গণে। ছোটখাটো বিরোধ হয়তো অহরহই লেগে থাকত তাদের, কিন্তু বিদেশীর আক্রমণ দুয়ারে হানা দিলেই সারা গ্রীসের মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছে একজন হয়ে। পারশ্য অভিযানের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান গড়ে তুলেছে চিরদিনের প্রতিদ্বন্দ্বী স্পার্টা ও এথেন্সের সৈন্য-বাহিনী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসেও ভূগোলের ব্যবধান অতিক্রম করে মৈত্রী ও সংস্কৃতির সেতুবন্ধনের প্রয়াসের কোনো ব্যতিক্রম দেখি না।

যা সে পেয়েছে তার দীর্ঘসাধনাবলে তা সে কোনো প্রত্যাশা না রেখেই বিলিয়ে দিয়েছে সকলকে।

অন্যূন দু'হাজার বছর ধরে ভারত সংস্কৃতি-ধারায় স্নাত হয়ে আসছে মধ্য-এশিয়ার নানা দেশ। তা নিয়ে সভ্য জগতের ইতিহাসে দীর্ঘকাল কোনো পরিচ্ছেদ রচিত না হলেও গত শতকে কয়েকজন রুশ পণ্ডিত সেই সব প্রাচীন তথ্য আবিষ্কার করে ইতিহাসকে সমৃদ্ধতর করেছেন।

রুশ পণ্ডিতদের আবিষ্কৃত তথ্যাবলীকে ভিত্তি করে শ্রী এ. কে. সুর লিখিত একটি বিস্তৃত প্রবন্ধে[১] বলা হয়েছে যে, খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক পর্যন্ত প্রায় হাজার বছর ধরে ভারতীয় সাধুসন্তের দল ও ব্যবসায়ীরা মধ্য-এশিয়ার দেশে দেশে ভারত-সংস্কৃতির আলোর মশাল নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। সে-সব দেশে সেই থেকেই ভারত-প্রভাবের পরিচয় ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মধ্য-এশিয়া দিয়ে চীনের পথে যাবার প্রথম কেন্দ্র ছিল গান্ধার (বর্তমান আফগানিস্তান)। তখন গান্ধার ছিল ভারত রাষ্ট্রেরই এক অঙ্গরাজ্য এবং ভারত-সংস্কৃতিরই এক পীঠস্থানরূপে সেকালে তার পরিচয় ছিল। গান্ধারের রাজধানী তখন তক্ষশিলা। পুরাণ-বর্ণিত রাজা জন্মেজয়ের পুত্র পরীক্ষিৎ সর্বপ্রথম এ রাজ্য জয় করেন। মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র-মহিষী গান্ধারী ছিলেন তৎকালীন গান্ধাররাজ সুবলের কন্যা। সম্রাট অশোকের সময় তাঁর পুত্র কুণাল ছিলেন গান্ধার প্রদেশের শাসনকর্তা, যিনি বিমাতা দ্বারা অন্ধ হয়ে খোটানে পালিয়ে যেয়ে সেখানে এক নতুন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

এই গান্ধারই হলো মূল কেন্দ্র যেখান থেকে সেকালে ভারতীয়

---

১ *Indian Colonies in Central Asia 2000 Years Ago* by A. K. Sur

সাধু-সন্ন্যাসী ও ব্যবসায়ীর দল মধ্য-এশিয়ার নানা খণ্ডে যাত্রা করতেন। সে উপলক্ষে অনেকে এসে গান্ধারেই বসবাস শুরু করে দিতেন ঐ রাজ্যটিকে খুব ভালো লেগে যেত বলে। এমনিভাবেই মধ্য-এশিয়ার নানা প্রান্তে প্রায় দু'হাজার বছর আগে ভারতীয় সংস্কৃতির এক-একটি কেন্দ্র তথা এক-একটি উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল।

গান্ধার থেকে সমরখন্দ হয়ে মধ্য-এশিয়া তথা চীনে যাবার সেকালের স্থলপথটি আসলে বাণিজ্যিক যোগাযোগের উদ্দেশ্যেই প্রধানত ব্যবহৃত হতো। ভারত-ধর্মপ্রচারকামী সাধু-সন্তের দলও বিশেষভাবে এ পথেরই সাহায্য নেন তাঁদের উদ্দেশ্যসাধনে। বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে এ পথেই বৌদ্ধ শাস্ত্রানুশীলনের জন্য সম্রাট হর্ষবর্ধনের আমলে ভারত সফরে এসেছিলেন।

ভারতবর্ষের বাইরে সেকালে মধ্য-এশিয়ায় ভারত-সংস্কৃতি ধারার প্রথম ও প্রধান পীঠস্থান ছিল কাশঘর। নানাদিক থেকে সে-যুগে নানা পথ এসে মিশেছিল সেখানে। সংস্কৃতির ভারতীয় ধারাকে স্থানীয় অধিবাসীরা সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল এবং এক প্রকারের প্রাচীন ইরাণী ভাষা ও প্রাচীন ভারতীয় ভাষা প্রাকৃতেই তারা কথাবার্তা বলতে অভ্যস্ত ছিল। প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রের বহু পাণ্ডুলিপি কাশঘর অঞ্চল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

এই কাশঘরেরই দক্ষিণ-পশ্চিমে কুনলুন পর্বতশ্রেণী এবং তারই পাদদেশ ধরে ইয়ারখন্দ হয়ে একটি দীর্ঘ-পথ চলে গেছে খোটানের দিকে। এই পথেই কিজিল দরিয়া নামের একটি নদী পেরিয়ে তবে ইয়ারখন্দ। এ নদীর পুরানো নাম সীতা এবং ভারতীয় সাহিত্যে এই সীতা নদীর নাম যেমন বহু স্থানে পাওয়া যায়, চীনা পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ-ও কিজিল দরিয়া নদীটিকে সীতা নদী বলেই জানতেন।

বৌদ্ধ ধর্মের শুরুকালের পরেই ইয়ারখন্দে এই ধর্মের প্রসার ঘটে। এখানকার বৌদ্ধরা ছিল মহাযান সম্প্রদায়ের লোক। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে বিখ্যাত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী কুমারজীব ঐ অঞ্চলে গিয়ে ব্যাপক-ভাবে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন। ইয়ারখন্দের দুই রাজকুমার সূর্যসেন ও সূর্যভদ্রের দ্বারা তা আরো প্রসারিত হয়। তাঁরা উভয়েই গুরু কুমারজীবের কাছে বৌদ্ধ ধর্ম-বিষয়ক বহু গল্প পাঠ করেন। এ-সব কারণেই হুয়েন সাঙের বিবরণে এরূপ আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ অঞ্চলেও বহু প্রাচীন ভারতীয় পুঁথিপত্র আবিষ্কারের সম্ভাবনা রয়েছে।

দু'হাজার বছর আগে মধ্য-এশিয়ায় ভারত-সংস্কৃতি ধারার যে ব্যাপক বিস্তার সম্ভব হয়েছিল, তার মূলে বৌদ্ধদের অবদানই ছিল সর্বাধিক। তবে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর ব্যক্তিগত অনুসন্ধান ও অভিজ্ঞতা থেকে বিস্তারিত আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, 'বিগত দুই হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতের বাহিরে এশিয়া খণ্ডে ও অন্যত্র যেখানেই ভারতের বাণী প্রচারিত হইয়াছে, সেখানেই রামায়ণ এবং মহাভারতের উপাখ্যান ও আদর্শের প্রতিষ্ঠা অথবা প্রচার হইয়াছে।······তবে ব্রাহ্মণ্যের প্রতিষ্ঠার উপরই এই-সব দেশে রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে।' এই আলোচনা প্রসঙ্গেই চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন যে, ব্রহ্ম, শ্যাম, কম্বুজ, চম্পা, মালয়, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ ও লম্বকদ্বীপের এক-একটি জাতির 'সকলেই এককালে ব্রাহ্মণ্য আদর্শে অনুপ্রাণিত ধর্ম ও সমাজ গড়িয়া তুলে, এবং এই ধর্ম ও সমাজকে জীবনে সমৃদ্ধ করিয়া তুলে।······এক বলিদ্বীপ ও আংশিকভাবে লম্বকদ্বীপ ছাড়া, এই সমস্ত দেশে এখন ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম বা ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজ বিদ্যমান নাই ;— ব্রহ্মে, শ্যামে, কম্বুজ দেশে ও চম্পায় লোকে এখন বৌদ্ধধর্ম পালন করে, যদিও তাহারা কিছু

পরিমাণে ধার্মিক ও সামাজিক তৎতদ্‌-দেশের ব্রাহ্মণের নির্দেশ মানিয়া চলে। অন্যত্র—মালয় উপদ্বীপে ও দ্বীপময়-ভারতে, জন-সাধারণ মুসলমান ধর্মই স্বীকার করিয়া লইয়াছে; তথাপি তাহাদের জীবনে অতীতের অবশেষ-স্বরূপ ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ প্রভাব এখনও গভীর-ভাবে কার্য করিতেছে, বিশেষ করিয়া যবদ্বীপে; স্বাধীন ইন্দোনেসিয়া বা দ্বীপময়-ভারত রাষ্ট্রের আমাদের ভারতে প্রেরিত প্রথম রাজদূত শ্রীযুক্ত সুদর্শন (Soedorsono) ভারতবর্ষে অবস্থানকালে এক সভায় বলিয়াছিলেন যে, ইন্দোনেসিয়ার ধার্মিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে, বাহিরে মুসলমান-ধর্ম সকলে মানিলেও, রামায়ণ ও মহাভারতের প্রভাব এখনও বিশেষ প্রবলভাবে বিদ্যমান।'[২] এই উদ্ধৃতির মধ্যে মধ্য-এশিয়ায় সংস্কৃতির নানা ধারার যোগাযোগের একটি স্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠেছে।

তবে ভারতের বাইরে ভারত-ধর্মের প্রসারে বৌদ্ধদের অবদানই যে বেশী, সে-কথা স্বীকার করতেই হবে। সেকালে ইয়ারখন্দের সামান্য উত্তর-পূর্বে অবস্থিত খোটান ছিল বৌদ্ধ ধর্মমত বিস্তারের অন্যতম প্রধান ঘাঁটি। ভারতীয়, চীনা, ইরাণী প্রভৃতি নানা জাতির মিলন-কেন্দ্র হিসাবে খোটান আগে থেকেই বেশ একটা আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করে বসেছিল। এবং ভারত-সংস্কৃতির বাহু বিস্তারে খোটান সেদিক থেকেও একটা সুবিধা এনে দিয়েছিল।

ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মতে, খ্রীষ্টজন্মের তিনশ' বছর আগে থেকেই ভারতীয়গণের বসবাস শুরু হয়েছে খোটানে। সম্রাট অশোকের পুত্র কুণাল সেখানে এক রাজ্যই প্রতিষ্ঠা করে বসেন। খরোষ্ঠী লিপিতে প্রথম খ্রীষ্টীয় শতকের কিছু লেখায় গান্ধার অঞ্চলে

---

২ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত 'সাংস্কৃতিকী'র 'রামায়ণ' অধ্যায় হ'তে উদ্ধৃত।

ব্যবহৃত প্রাকৃতের নিদর্শন খোটানে আবিষ্কৃত হয়েছে। হুয়েন সাঙ-এর সময় স্থানীয় অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক জীবনের চরম বিকাশ ঘটেছিল। বেশভূষায় তারা ছিল সুরুচিসম্পন্ন, নৃত্য-গীতাদির প্রতি তাদের ছিল বিশেষ আকর্ষণ। লোকরা সবাই ছিল বৌদ্ধ এবং গোমতি বিহার ও গোশৃঙ্গ বিহার প্রভৃতি শতাধিক বৌদ্ধ মঠ-মন্দির ছিল সারা খোটান-জুড়ে। নানা সূত্র থেকে জানা যায় যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে খোটানে 'বিজয়' নামে এক রাজবংশের রাজত্ব চালু ছিল এবং সেই রাজারা 'মহানুভব মহারাজা' বলে নিজেদের পরিচয় দিতে গর্বানুভব করতেন। খরোষ্ঠী লিপির পাশাপাশি ব্রাহ্মী লিপিও যে খোটানে প্রচলিত ছিল, তারও প্রমাণ কিছু কিছু পাওয়া গেছে।

সে-যুগে বিদ্যার্জনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র বলে বিবেচিত হতো খোটান। বিশেষ করে গোমতি বিহার অতি উচ্চ পর্যায়ের বৌদ্ধ পণ্ডিতদের সমাবেশস্থল বলে আশপাশের নানা দেশ থেকে সেখানে এসে দলে দলে শিক্ষার্থীরা সমবেত হতো। বিখ্যাত বৌদ্ধ আচার্য বুদ্ধসেনা এই গোমতি বিহারের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর পাদমূলে বসে শিক্ষালাভের সুযোগকে সবাই সৌভাগ্য বলে মনে করতেন। পাঁচ লক্ষ গাথা তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল এবং ধ্যান-বিজ্ঞানে সেকালে তাঁর কোনো জুড়ি ছিল না। এ-সব কারণেই মধ্য-এশিয়ার বৌদ্ধ সঙ্ঘ তাঁকে 'সিংহ' উপাধিতে ভূষিত করেছিল। এমনিভাবেই মধ্য-এশিয়ার নানা দেশের সঙ্গে সমুন্নত ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঘটে আসছে সেই দু'হাজার বছর আগে থেকে।

এই প্রসঙ্গে তুন হুয়াঙ-এর গুহামন্দিরগুলোর কথাও এসে পড়ে। বৌদ্ধ সাধকরা এ-সব গুহায় নির্জনে তপস্যামগ্ন থাকতেন। কিন্তু খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে চীন সাম্রাজ্যের ওপর তুর্কী আক্রমণ শুরু হলে চীনারা যখন বৌদ্ধ ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করলো, সেই থেকে ঐ গুহা-

গুলো মন্দিরে রূপান্তরিত হতে লাগল। এমনিভাবেই তুন হুয়াঙ বৌদ্ধ ধর্মের একটা মস্তবড় কেন্দ্রে পরিণত হলো। সেই থেকেই সারা চীনে ভারতের বৌদ্ধ মতবাদ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। চীনের ধর্মগুরু লাওৎসি-র 'তাও'-বাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটলো ভারতীয় ধর্মমতের। দেখা গেল, সাংস্কৃতিক ভাবনার ক্ষেত্রে পৃথিবীর সব মানুষই মূলত প্রায় একই রকমের চিন্তা করে এসেছে—সে চিন্তা হলো মানব-কল্যাণের চিন্তা, শান্তির চিন্তা।

মানব-জগতের এই ভাবসাম্য সম্বন্ধেই শ্রীসুনীতিকুমার চট্টো-পাধ্যায় লিখছেন 'তাও'-বাদের আলোচনা প্রসঙ্গেঃ 'কেহ-কেহ লাও-ৎসির বইয়ে (তাও-তেঃ-কিঙ) ভারতের উপনিষদের প্রভাব আছে বলিয়া মনে করেন। চীন ও ভারতের প্রাচীন সংযোগের ঐতিহাসিক বিচার করিয়া এ সিদ্ধান্ত আমি গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করি না। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠশতকে আর্যভাষী ভারত এবং চীনের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ঘটে নাই বলিয়াই মনে হয়; বিশেষজ্ঞদের মতে, খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে, অথবা পঞ্চম শতকে, মধ্য-এশিয়া অথবা Yun-nun য়ুন-নান্ বা দক্ষিণ-পূর্ব চীনের পথ দিয়া ভারত ও চীনের মধ্যে বাণিজ্য-সম্পর্কের সূত্রপাত হইয়া থাকিতে পারে মাত্র। আমার মনে হয়, লাও-ৎসির প্রতিপাদিত 'তাও'-বাদ ও আমাদের ব্রহ্মবাদ বা ঋতবাদ, দুইটি বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে স্বাধীনভাবে উদ্ভূত একই প্রকারের চিন্তার ফল। এই এক ধরনের উপলব্ধির দ্বারা বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে ভাবসাম্য প্রকটিত হয়; এবং এই প্রকার ভাবসাম্যের মধ্যে হয়তো আমরা এই উপলব্ধির সত্যতা সম্বন্ধে ইঙ্গিত বা সম্ভাব্যতা দেখিতে আদিষ্ট হইতেছি।'

যাই হোক, সমগ্র মানবজাতির মধ্যে এই ভাবসাম্যের বিধান এবং সংযোগ ও সমন্বয়সাধনই বোধ হয় সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় কাজ।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে ভারতের সঙ্গে জলপথে সংযোগ স্থাপিত হয়েছে ইন্দোচীন ও মালয় উপদ্বীপের। ফরাসী পণ্ডিত পোলিও চৈনিক সাহিত্য থেকে য়ুনান রাজ্যের ইতিহাস উদ্ধার করে বলেছেন, একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন ঐ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। কম্বোডিয়া ও শ্যাম-দেশের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল হিন্দু রাজ্য, আর সে রাজ্য স্থায়ী হয়েছিল প্রায় চারশ' বছর। সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত লিঙ্গরাজ আনামে হিন্দু শাসনের শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর। শেষ পর্যন্ত আনামীদের আক্রমণে সে রাজত্বের অবসান ঘটেছিল, কিন্তু তার অবিনশ্বর কীর্তি আজও অম্লান হয়ে রয়েছে পাণ্ডুরঙ্গ কোঠার, অমরাবতী ও আরও কত স্থানে।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে মেকং নদীর উপকূলে গড়ে উঠেছিল কম্বোজ নামে আরও একটি স্বাধীন হিন্দু রাজ্য। বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে প্রায় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত টিকে ছিল ঐ কম্বোজ রাজ্য। উত্তর চীনের য়ুনান প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল তার আধিপত্য। দ্বাদশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় সূর্যবর্মণের রাজত্বকালে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এঙ্কোরভাটের প্রসিদ্ধ সূর্যমন্দির।

চীনের সঙ্গে ভারতের সংযোগ ঘটেছে আনুমানিক খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় একই সময়ে একজন কুষাণরাজ চীনসম্রাটকে বৌদ্ধ শাস্ত্র সম্পর্কিত কয়েকটি গ্রন্থ উপহার দিয়েছিলেন, তা থেকেই চীনা পণ্ডিতদের মনে সর্বপ্রথম বৌদ্ধ শাস্ত্র সম্পর্কে আগ্রহের সঞ্চার হয়। এর পরেই কাশ্যপমাতঙ্গ ও ধর্মরত্ন নামে দুজন ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু চীনে যান ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে। এই সময়ই চীনে গড়ে ওঠে প্রথম বৌদ্ধ মন্দির।

বৌদ্ধধর্ম তখন ভারতের উদ্যোগে পশ্চিম এশিয়াতেও ছড়িয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ পাই অন্য সূত্রে। ১৪৮ খ্রীষ্টাব্দে চীনে গিয়ে

যে বৌদ্ধ ভিক্ষু বিশ বছরকাল অবস্থান করেন এবং প্রায় দু'শ ধর্মগ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ করেন, তাঁর নাম লোকোত্তম। তিনি ভারতীয় নন, তিনি ছিলেন পারশ্যের আরসিকিতয় রাজবংশের কুমার। প্রধানত তাঁরই প্রচারের ফলে বহু চীনবাসী বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। তারপর ১৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করতে চীনে যান আর এক ভিক্ষু—নাম লেকোক্ষেম। তিনি মধ্য-এশিয়ার তুষারদেশের অধিবাসী। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে ভারত থেকে চীনে যান কুমারজীব। একটানা দশ বছর বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করে ও শতাধিক বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ করে তিনি চীনেই শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। পরবর্তী কালে এই আদর্শ বৌদ্ধ ভিক্ষুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে যাঁরা চীনে যাওয়ার আগে সিংহল ও যবদ্বীপে কিছুকাল বাস করেছিলেন, তাঁদেরই প্রয়াসে যবদ্বীপের রাজবংশ বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

নালন্দার প্রভাকরবর্ধন সপ্তম শতাব্দীতে চীনে যান। তাঁর অন্যতম কীর্তি হলো তুর্কীসম্রাট খানখানানকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষাদান। চীনদেশ থেকেও ঐ সময় এসেছিলেন ফা-হিয়েন, হুয়েন সাঙ্, ই চিঙ্ প্রমুখ পরিব্রাজক ও শিক্ষার্থীর দল, যাঁদের ভ্রমণলিপি থেকে জানতে পারা যায় সারা এশিয়ার পূর্বপ্রান্ত জুড়ে সেদিনের ভারতের সখ্য-প্রসারের অবিরাম প্রয়াসের কাহিনী। ভারত সাম্রাজ্য ধর্ম প্রচার করেছিল দেশে দেশে, দিশে দিশে, কিন্তু কোথাও ছিল না তার দেশ-শাসনের বা ধর্ম-প্রচারের নামে নিষ্ঠুর নির্যাতন। যে সত্য সে নিজে জেনেছিল তার দীর্ঘসাধনাবলে, তাই সে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল তার প্রতিবেশীদের কাছে। মানবধর্মই হলো ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল কথা, আর এই কারণেই সে সভ্যতা আজও অম্লান, মিশর বা গ্রীসের প্রাচীন সভ্যতার মতো সে বিলুপ্ত অস্তিত্ব নয়।

সাংস্কৃতিক সংযোগের কাজ ভারত তার প্রেম-শক্তির জোরেই

দীর্ঘকাল ধরে এশিয়ার নানা খণ্ডে সাফল্যের সঙ্গে করে চলেছিল। মধ্যযুগে আরবের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সেই অহিংস প্রেম-শক্তি ম্লান হয়ে আসে। এশিয়া ও ইয়োরোপের দেশে দেশে তখন দুর্ধর্ষ ইসলামের বিজয় বৈজয়ন্তী। বহু প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষের সঙ্গে আরবের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল। হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর ইসলামের প্রচার ও রাজ্য-জয়ের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর দিকে দিকে আরব জাতি ছড়িয়ে পড়ে। সম্পদশীল ভারত, বিশেষ করে তার মন্দিরে মন্দিরে সঞ্চিত, ধারণাতীত ধনরত্নের সংবাদ আরবকে প্রথম থেকেই প্রলুব্ধ করছিল এই দেশের দিকে হাত বাড়াবার জন্য। অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে আরব সেনাপতি মহম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু-বিজয়ের ফলে ভারতের দ্বার মুসলমানদের কাছে উন্মুক্ত হয়ে যায়। এই বিজয়ের পর সিন্ধুদেশে আরব শাসন মাত্র বিশ বৎসরকাল স্থায়ী হলেও, ইসলামের ইতিহাসে এ ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের দিক থেকেও এর পরোক্ষ ফল হয়েছিল সুদূর-প্রসারী। এর পর থেকে বহু আরবীয় মুসলমান সিন্ধুদেশে স্থায়িভাবে বাস করতে আরম্ভ করে এবং আরবী উলেমা ও মোল্লাদের চেষ্টায় ইসলামের প্রচারও চলতে থাকে। এ সময়েই হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক প্রভাবের ফলে ইসলামী প্রেম ও ভক্তিবাদের শ্রেষ্ঠ ফল সুফী ধর্ম এবং সঙ্গে সঙ্গে আরবী সাহিত্য সিন্ধু এলাকায় বিস্তার লাভ করে। অন্যপক্ষে, বহু সিন্ধীও আরব সাম্রাজ্যের দিকে দিকে ব্যবসায়-বাণিজ্য উপলক্ষে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ফলে, আরব-ভারত বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ ক্রমশই ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে। এবং আরবের মাধ্যমেই ভারতীয় দর্শন, গণিত, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, জ্যোতিষ ও লোকসাহিত্য পশ্চিম এশিয়া ও ইয়োরোপের দেশে দেশে প্রচলিত হতে থাকে।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, সংস্কৃতির দুটি ধারা মুখোমুখি হলেই প্রথমে সংঘাত, তারপরেই সমন্বয়, এ আমরা বারংবার প্রত্যক্ষ করেছি। মহম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু-বিজয়ের পরেও তা ঘটেছে—প্রথমে মন্দির লুণ্ঠন, বিগ্রহ ধ্বংস ইত্যাদি অত্যাচার, পরে হিন্দুদের সঙ্গে একটা বুঝাপড়া এবং আদান-প্রদান; এর প্রায় পৌনে তিনশ' বছর পর গজনীর সুলতান মামুদের ভারত অভিযানের পরের ঘটনা-চিত্রও একইরূপ—পার্থক্য শুধু হিন্দু-বিদ্বেষ ও অত্যাচারের তীব্রতায়।

সুলতান মামুদ সতেরো বার ভারত অভিযান করেছিলেন বলে কথিত আছে। তাঁর এ-সব অভিযান সম্বন্ধে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য তাঁহার যে আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা ছিল, তাহাতে একাধারে ধর্ম-সম্বন্ধে তাঁহার আদর্শ এবং কাফেরের দেশ লুঠপাট করিয়া ধন-সংগ্রহেব সহজ পন্থা, এই উভয়ই তাঁহাকে পরিচালিত করিয়াছিল।......তাঁহার অনুমাত্র সংশয় ছিল না যে, তিনি এবং তাঁহার তুর্কী যোদ্ধৃগণ ঈশ্বরের সমক্ষে উচ্চ আদর্শের মানুষই ছিলেন—তাঁহারা ছিলেন পরমেশ্বর আল্লার নির্বাচিত সেনা; বিধর্মী হিন্দুদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া, তাহাদের ধনে-প্রাণে মারিয়া, লুঠপাট করিয়া ও তাহাদিগকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করিয়া এবং মুসলমানের চক্ষে অত্যন্ত ঘৃণার বস্তু মন্দির ও দেবমূর্তি ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া তাহারা ঈশ্বরেরই প্রত্যাদেশ বা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতেছিল। আল্লার সেই সেবার জন্য তাহারা ভারতবর্ষের বহুযুগের সঞ্চিত ধনরত্ন এবং বিজিত হিন্দুদের মধ্য হইতে সহস্র সহস্র দাসদাসী পাইয়া ইহজগতে পুরস্কৃত হইত, এবং পরজগতে কোরানে বর্ণিত জিন্নৎ বা স্বর্গের সমস্ত সুখ ও আনন্দের অধিকারী হইত।'

ভারত ইতিহাসের সেই তমসাচ্ছন্ন যুগে সংস্কৃতির আলোক-বর্তিকা নিয়ে ভারতে উপস্থিত হয়েছিলেন সুলতান মামুদেরই রাজসভারত্ন ও

জ্যোতিষী অল্ বেরুণী যিনি আগে থেকেই ফারসী, আরবী ও গ্রীক ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং ভারতে এসে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। আরবী ভাষায় তাঁর অনূদিত কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ এবং সংস্কৃত ভাষায় কয়েকখানি আরবী ও গ্রীক গ্রন্থ বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক ভাব-বিনিময়ে অশেষ সহায়ক হয়েছে। বিশেষ করে অল্ বেরুণী রচিত ভারত বিবরণ 'কিতাব-উল-হিন্দ্' জার্মান পণ্ডিত এডোয়ার্ড জাখাউ কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত হওয়ায় ইউরোপীয় দেশগুলির কাছে ভারত-পরিচয় আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অল্ বেরুণী তাঁর 'কিতাব-উল-হিন্দ্' গ্রন্থে ভারতের জ্যোতিষ, দর্শন, অঙ্ক, চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে বহু তথ্য লিপিবদ্ধ করেন এবং আজও এই গ্রন্থ ভারতের ইতিহাস-রচনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাদান বলে গণ্য।

অল্ বেরুণী প্রকৃতপক্ষেই একজন আন্তর্জাতিক দৃষ্টিসম্পন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ফারসী, আরবী ও তুর্কী ভাষায় জ্ঞান আহরণ করেই তিনি ক্ষান্ত হননি এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে পাণ্ডিত্য অর্জনেও তাঁর তৃপ্তি হয়নি; তিনি সিরীয় ও আরবী ভাষার মাধ্যমে প্লেটো, আরিস্তোতল প্রমুখ দার্শনিকদের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এবং প্রাচীন গ্রীক ও রোমীয় সভ্যতা সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। সেজন্যই তিনি তাঁর কালের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধ বলে বিবেচিত এবং ১০৪৮ সালে গজনীতে লোকান্তরিত এই মহামনীষীর সহস্রবার্ষিকী ১৯৪৮ সালে উদ্‌যাপন করে একালের মানুষ গৌরবান্বিত।

অবশ্য, অল্ বেরুণীর অনেক আগেই দেশ-বিদেশের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক সংযোগ সাধিত হয়েছে। এ-বিষয়ে পূর্বের আলোচনার সঙ্গে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের রচনা থেকে একটি উদ্ধৃতি যুক্ত

করা যেতে পারে। তিনি 'অল্ বীরূণী ও সংস্কৃত' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে লিখছেন, 'কমপক্ষে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক হইতে কতকগুলি ভারতীয় পণ্ডিত ও সাধু-সন্ন্যাসী (ইহারা প্রায় সকলেই ভবঘুরে-প্রকৃতির ছিলেন, এবং বিদেশ-যাত্রার অসুবিধা ও বিপদকে ইহারা গ্রাহ্য করিতেন না—এই ধরণের ভ্রমণশীল ভারতীয় পণ্ডিত বা সন্ন্যাসী এখনও ভারতের বাহিরে মাঝে-মাঝে দেখা দেন) পশ্চিমের দেশসমূহে পর্যটন করিতে যাইতেন এবং গ্রীস পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিতেন। ইহারা বিদেশে রসজ্ঞ সমানধর্মা জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলিতেন, এবং আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক ব্যাপারে ইহারা নিজেদের বিচার-ধারা লইয়া আলোচনা করিতেন। এইরূপ অন্তত একজন ভারতীয় দার্শনিক পণ্ডিতের কথা গ্রীক সাহিত্যে আমরা পাই; ইনি খ্রীঃ-পূঃ ৪০০-এর পূর্বে আথেন্স নগরীতে গিয়াছিলেন, এবং গ্রীক দার্শনিক সোক্রাতেস্-এর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজান্দার ভারতবর্ষ হইতে ফিরিবার পথে Kalanos কালানোস্ অর্থাৎ 'কল্যাণ' নামে একজন ভারতীয় পণ্ডিতকে নিজের সঙ্গে লইয়া যান; কিন্তু এই পণ্ডিত বাবিলন পর্যন্ত যান, সেখানে তিনি অগ্নিপ্রবেশ করিয়া আত্মহত্যা করেন। মহারাজ প্রিয়দর্শী অশোক খ্রীঃ-পূঃ তৃতীয় শতকে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ এবং আস্তিক-প্রাচ্যের কতকগুলি বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন—সিরিয়াতে, মাসিডনে, এপিরসে, মিশরে এবং উত্তর আফ্রিকায় কিরেনে বা সাইরিনি দেশে। সম্ভবত এই সকল ব্যক্তি ভারতীয় দার্শনিক বিচার সম্বন্ধে মৌখিক উপদেশ দিতেন, এবং এই উপদেশেরই আধারে গ্রীক ও সিরিয়ান জগতের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুরা ভারতীয় চিন্তা-জগৎ সম্বন্ধে অল্প-কিছু সংবাদ পাইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।'[৩]

---

৩ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত 'সাংস্কৃতিকী' গ্রন্থ হ'তে উদ্ধৃত।

যাই হোক, এমনিভাবেই যুগে-যুগে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের কাজ চলে আসছে। মাঝে মাঝে সংঘাত এসেছে, প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষের সংস্কৃতিবোধ সমন্বয়ের অগ্রগতির পথ থেকে তাকে বিচ্যুত করতে পারেনি। ভারত ইতিহাসেই বার বার এর প্রমাণ মিলে।

ইসলাম ধর্মে চিত্রাঙ্কন নিষিদ্ধ হলেও মুঘল বাদশাহদের অধিকাংশই চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। গ্রন্থ-প্রচ্ছদ ও ঘটনা-চিত্রণের রীতি মুঘল আমলে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বিশেষ করে আকবরের দরবারে গুণীসমাদরের অবধি ছিল না এবং সেখানে কোনো সাম্প্রদায়িক মানদণ্ডও কখনো প্রশ্রয় পেত না। শত চিত্রকর নিযুক্ত ছিলেন আকবরের দরবারে। তাঁদের মধ্যে সতেরোজন ছিলেন সুদক্ষ সেরা শিল্পী, আর এই সেরা শিল্পীদের এগারজনই ছিলেন হিন্দু। শুধু এ ব্যাপারেই নয়, আকবর বাদশাহের উদার সাংস্কৃতিক মনের পরিচয় মিলে তাঁর 'দীন ইলাহী' ধর্মের প্রবর্তনায়। যদিও তিনি শেষ পর্যন্ত তাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, তবুও তাঁর এই উদ্যোগ সর্বধর্ম সমন্বয়ের একটি মহৎ প্রয়াস হিসাবে চিরকালের মতো স্বীকৃত হয়ে আছে।

ইসলামের একান্ত সেবক সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে অবশ্য চিত্রাঙ্কন পাপ বলে ঘোষিত ও নিন্দিত হতে থাকে, যার ফলে, ভারতীয় চিত্রকর-সমাজকে কিছুকাল ধরে অবহেলিত হতে হয়। তবে এই অবহেলার মধ্যেই রাজপুত-রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহচর্যে ভারতীয় চিত্রশিল্পের একটি নতুন ধারার উন্মেষ ঘটে, যা ভবিষ্যতের কাছে এক মূল্যবান ঐতিহ্য বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। শুধু চিত্রাঙ্কনকেই নয়, আওরঙ্গজেব সঙ্গীত এবং ইতিহাস রচনাকেও নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছিলেন ইসলামের নীতি-নির্দেশে। কিন্তু এত করেও তিনি সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের গতিরোধ করতে পারেননি। ইলতুৎমিস,

গিয়াসুদ্দিন বলবন ও আলাউদ্দিন খিলিজি প্রভৃতি সুলতান এবং বাবর, আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহ্‌জাহান প্রভৃতি মুঘল বাদশাহগণের শিল্প-সঙ্গীত ও সাহিত্য-প্রীতির ফলে ভারত-সংস্কৃতির এ-সব শাখার ওপর মুসলমানী প্রভাব চিরকালের মতো বিস্তৃত হয়ে আছে। ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রেও এই সমন্বয়ের কাজ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভারতে মুসলমান অভিযানের প্রথমযুগে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ধর্মীয় সংঘাত-সংঘর্ষ তীব্র হয়ে উঠলেও ক্রমে ক্রমে সমন্বয়বাদী সাধু-সন্ন্যাসী এবং ফকির, দরবেশ ও সুফীসাধকের প্রচারের ফলে ধর্মীয় সহাবস্থানের একটা প্রশস্ত ক্ষেত্র এদেশে প্রস্তুত হয়ে যায়। এদেশের শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করে মুসলমানরা বহু হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করে। মুসলমান সম্রাটদেরও অনেকেই হিন্দু, বিশেষ করে রাজপুত রমণীদের, পাণিগ্রহণ করেন। মুসলমান পরিবারে এভাবে হিন্দু নারীর অবস্থানের ফলে হিন্দু সমাজের অনেক রীতিনীতিই মুসলমান সমাজেও বদ্ধমূল হয়ে যায়। হিন্দুর আচার-ব্যবহার ও জীবনযাত্রা-প্রণালী মধ্যযুগের মুসলমান সমাজকে এতটা প্রভাবিত করেছিল যে, তখনকার মুসলমান রমণীদের মধ্যেও সতীদাহ ও জহরব্রত অনুষ্ঠানের রেওয়াজ দেখা দিয়েছিল। ইবন বতুতার তৎকালীন ভারত-বিবরণীতে তেমনি দৃষ্টান্তের উল্লেখ রয়েছে। এমনি করেই এই মহাভারতে 'শক-হুনদল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন' এবং নানা রকমের 'বিরোধের মাঝে মিলন' সংঘটিত হয়ে আসছে।

ধর্মীয় নীতিভেদ বা মতপার্থক্য যে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের পথকে অবরুদ্ধ করতে পারেনি, তা আমরা আরব-ভারত সংস্কৃতি-সংযোগের প্রথম পথিকৃৎ অল্ বেরুণীর কার্যকলাপ ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যেমন প্রত্যক্ষ করেছি, তেমনি লক্ষ্য করেছি কাঠমোল্লা-মনোভাবাপন্ন সম্রাট আওরঙ্গজেবেরই উদারহৃদয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা সংস্কৃতিবান দারা শিকোহ্-র

জীবন-নীতির মধ্যে। বিরোধ নয়, বিভেদ নয়—মানবধর্মের ঐক্যই সেই জীবন-নীতির মূল কথা। দারা সেই ঐক্যসূত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন আর্য ভারতের উপনিষদের মধ্যে। সেই ঐক্যের বাণী তিনি চেয়েছিলেন সমগ্র আরব জগতে প্রচার করতে; তাঁর সমস্ত ইসলাম ধর্মাবলম্বী ভাইদের হাতে তুলে দিতে। এইভাবে হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়ের পথকে প্রশস্ততর করবার উদ্দেশ্যেই দারা ফারসী ভাষায় গীতা ও উপনিষদের অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর সমন্বয়ী মনোভাবের জন্যই রাজকুমার দারাকে চরম মূল্য দিতে হয়েছিল, কনিষ্ঠ আওরঙ্গজেবের ষড়যন্ত্রের বলি হতে হয়েছিল তাঁকে। তাহলেও তাঁর আত্মদান সার্থক হয়েছে। তাঁর এবং তাঁর মতো আরো অনেকের জীবন-পণ সাধনার ফলেই আমরা আজ অকুণ্ঠ কণ্ঠে 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' কবির ভাষায় আহ্বান জানিয়ে বলতে পারি—'এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান—এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রীষ্টান।'

বাস্তবিকপক্ষে ভারত-ইতিহাসের বৃটিশ যুগে আমরা দেখতে পাই যে, সংস্কৃতির এই সমন্বয়ের কাজ আরো ব্যাপকতর ভিত্তিতে বিস্তার লাভ করে চলেছে। আজ আর এ সত্য মোটেই অস্পষ্ট নয় যে, নিখিল বিশ্ব ছিন্ন-ভিন্ন রাষ্ট্রশক্তি হিসাবে বেঁচে থেকে সুখী হতে পারছে না, সমস্ত রাষ্ট্র এখন যেন এক পরিবারভুক্ত হবার জন্য ক্রমশই আগ্রহাকুল হয়ে উঠছে। আর আমরা গৌরবান্বিত এইজন্য যে, সেই বিশ্ব-পরিবার সংগঠনের কাজে ভারত এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ অংশীদার।

দেখা যাচ্ছে, কয়েক হাজার বছর আগে থেকে মানুষ এইভাবে নিজেদের পরস্পরের কাছে টেনে আনার জন্য যে উদ্যোগী হয়েছিল, আজও তার সে উদ্যোগ বন্ধ হয়নি। কখনও ধর্মের আহ্বানে, কখনও বা শক্তিমান রাষ্ট্রনায়কদের সবল বাহুর বন্ধনে খণ্ড-ছিন্ন পৃথিবীর মানুষ

এগিয়ে এসেছে পরস্পরের কাছে। ইয়োরোপকে যেমন এক করেছে খ্রীষ্ট ধর্ম, তেমনি এক করেছে সীজার, নেপোলিয়ন এবং পরবর্তী কালে আরো অনেকে।

ইংলণ্ড, আমেরিকা, ভারত, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার মানুষ পরস্পরকে দেখেছে, চিনেছে, সমবেত প্রয়াসে নতুন সভ্যতা গড়ে তুলেছে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাঁধনে। সাম্রাজ্যের ভয়ঙ্কর রূপ আজ যুগের দাবিতে অন্তর্হিত হয়েছে, তার স্থান নিয়েছে কমনওয়েলথ। বাঁধন আজ আলগা হয়ে গিয়েছে, তবুও আমরা দূরে সরে গেলাম না। বিচ্ছেদের চেয়ে মৈত্রী বড়, স্বাধীনতার চেয়ে সখ্যের মূল্য কম নয়—এ সত্য আমরা বন্ধনের মধ্য দিয়েই জানতে পারলাম। আরব ও আফ্রিকার সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রগুলিও আজ স্বেচ্ছায় মিলে যাচ্ছে নিজেদের মধ্যে।

ইতিহাসের কাজ আমরা অনেক সময় বুঝতে ভুল করি, তাই ভয় পাই মাঝে মাঝে। আশীর্বাদকে মনে করি অভিশাপ। কিন্তু ভবিষ্যতের মানুষ এ-কথা বলবেই যে, পৃথিবীকে একাত্ম করে তোলার পিছনে বুদ্ধ, সক্রেটিস্, যীশু, মহম্মদের চেয়ে আলেকজাণ্ডার, সীজার বা নেপোলিয়নের দান কিছু কম নয়।

ধর্ম, রাজনীতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে হাত মিলিয়ে আর একটি যে শক্তি পৃথিবীর গণ্ডিকে ছোট করে এনেছে, তা হলো বিজ্ঞান। তারও আবির্ভাব ঘটেছে কখনও বা ভয়ঙ্করের ছদ্মবেশে, কখনও বা প্রকৃত কল্যাণময় রূপে। কী সংহারী রূপ নিয়েই না এসেছিল পরমাণুশক্তি, কিন্তু আজ তাই হয়েছে মানুষের সবচেয়ে শক্তিশালী সেবক ও সুহৃদ্। মুখ্যত, বিজ্ঞানের কল্যাণেই মানুষ আজ দূরকে করেছে নিকট বন্ধু, পরকে করেছে ভাই। বিমানপোতের দ্রুতগতির কাছে আজ শব্দের গতিও পরাস্ত। কোলকাতার মানুষ আজ সান্ধ্যভোজ

কোলকাতায় শেষ করে তার প্রাতরাশ সমাধা করে লণ্ডনে। লণ্ডনে মুদ্রামান হ্রাস হলে তার আঘাত এসে পড়ে জাপানের পল্লীজীবনে। কোরিয়া, হাঙ্গেরি ও কঙ্গোর মানুষের রক্তধারা অন্যত্র অশ্রুধারা বহায়, বুকে আগুন জ্বালায় কোলকাতার মানুষের। বাঙালীর কাছে আজ মারাঠীর চেয়ে কম আত্মীয় নয় আফ্রিকার কালো মানুষ বা লাতিন আমেরিকার লাঞ্ছিত শ্বেতাঙ্গ।

এই যে বিশ্বমন গড়ে উঠেছে, আজ সারা পৃথিবীর মানুষের বিংশ শতাব্দীর শত লাঞ্ছনা ও বিপর্যয়ের মধ্যে বোধ হয় সেইটাই সবচেয়ে বড় আশা ও সান্ত্বনার কথা। বার বার প্রবল আঘাতেও মানুষ ভেঙে পড়েনি বা বিশ্বাস হারায়নি বিশ্বজনীনতায়। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে পৃথিবী-জোড়া ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে নতুন স্বপ্ন ও আশা নিয়ে জেগে উঠেছে সম্মিলিত রাষ্ট্রসঙ্ঘ, এক বিশ্বের সবল প্রতিশ্রুতি নিয়ে। শতরাষ্ট্রের সমাবেশ ঘটেছে আজ রাষ্ট্রসঙ্ঘের আসরে। পাঁচ-মহাদেশের সব ব্যবধান দূর হয়ে গেছে। এই মহামানবের মেলায় এখনও আমন্ত্রণ পায়নি জার্মানি, কোরিয়া, আলজেরিয়া ও আরও কয়েকটি দেশ বা উপনিবেশের মানুষ। কিন্তু এই অনুপস্থিতি যে সাময়িক তা আমরা জানি। ভুল বোঝাবুঝির পালা শেষ হবেই, আমরা না চাইলেও শেষ করতে বাধ্য করবে বিজ্ঞানের ভয়ঙ্কর শাসন ও ইতিহাসের নির্দেশ।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ সংগ্রাম করে চলেছে ক্ষুধা ও রোগের বিরুদ্ধে, একে একে ভেঙে চলেছে বিভেদের ছোট ছোট প্রাচীরগুলি। ইউনেস্কোর তত্ত্বাবধানে চলেছে বিভিন্ন জাতির মধ্যে অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান। এক দেশের মানুষের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে আর সকল দেশের মানুষ, এক প্রদীপ থেকে আলো জ্বলে উঠেছে শত প্রদীপে। মানুষের মনের সব অন্ধকার সে আলোয় ক্রমে ক্রমে দূর

হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ আজ আর শুধু বাঙলা বা ভারতের সম্পদ নন, বা গ্যেটে নন শুধু জার্মানির বা তলস্তয় রাশিয়ার। তাঁরা আজ সারা পৃথিবীর শিক্ষা ও দীক্ষা গুরু।

পরস্পরকে চেনার বা পরস্পরের মনের কথা জানার আগ্রহ যেন অধীর করে তুলেছে সারা পৃথিবীর সকল দেশকে। 'থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে'—এ যেন সারা পৃথিবীর মনের কথা আজ। তাই ভারতের সাংস্কৃতিক দৌত্য ভারতের শুভেচ্ছার ও প্রীতির বাণী নিয়ে চলেছে রাশিয়ায়, আমেরিকায়। রাশিয়া বা আমেরিকা থেকে দলে দলে ভারতে আসছেন শিল্পী ও সাহিত্যিকের দল। ভারত-তত্ত্ব আজ যেমন প্রায় সব দেশের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোর অন্যতম পাঠ্য, ভারতও তেমনি গভীর নিষ্ঠা ও আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইছে পৃথিবীর সকল দেশকে। আমেরিকা, রাশিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানির সব শিক্ষালয়ে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে ভারতীয় শিক্ষার্থী।

ইয়োরোপের ভারত আবিষ্কারের মূল প্রেরণা এসেছে ইংলণ্ডের কাছ থেকে।[৪] ইয়োরোপ খণ্ডে ভারত-ভাষা সংস্কৃত-চর্চায় প্রধান ও প্রথম উদ্যোগী ইংলণ্ড। ফাদার টমাস স্টিফেন্স নামক এক ইংরেজ ধর্মযাজক ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত পর্যটনে আসেন এবং তাঁর উদ্যোগেই সর্বপ্রথম তৎকালীন এক ভারতীয় ভাষার (কঙ্কণী) ব্যাকরণ পর্তুগীজ ভাষায় অনূদিত হয়। তারপর ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে নাথানিয়েল ব্রাসে হ্যালহেড নিজেই একখানা বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন এবং তাঁরই সমসাময়িক সংস্কৃতজ্ঞ ইংরেজ পণ্ডিত স্যার চার্লস উইলকিন্স ইংরেজী ভাষায় সর্বপ্রথম গীতা অনুবাদ করে সমভাবে

৪ *The European Discovery of India, an article* by G. N. Das

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদের অধিকারী হন। তবে সবচেয়ে খ্যাতিমান প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ হলেন স্যার উইলিয়ম জোন্স, যিনি বিশেষ করে ভারত-তত্ত্বানুশীলনকে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটি যাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তিস্তম্ভরূপে সর্বজনস্বীকৃত। এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্ররূপে 'এশিয়াটিক রিসার্সেস' নামীয় গবেষণা পত্রিকাটিও তাঁর আবেক কীর্তি। মহাকবি কালিদাসের 'শকুন্তলা'র এবং মনুসংহিতার প্রথম ইংরেজী অনুবাদক হিসাবেও তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। একদিকে সংস্কৃত ও ফারসী এবং অন্যপক্ষে লাতিন, গ্রীক ও জার্মান প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে সামঞ্জস্য আবিষ্কারের মধ্য দিয়েও স্যার উইলিয়ম জোন্স সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ক্ষেত্রে মূল্যবান কাজ করে গেছেন।

এ ব্যাপারে আরেকজন মিশনারি ইংরেজের দানের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি (১৭৬১—১৮৩৪) বাংলা গদ্যের অন্যতম স্রষ্টা উইলিয়ম কেরী। তাঁরই চেষ্টায় বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয় বাইবেল এবং মারাঠী, পাঞ্জাবী ও বাংলা প্রভৃতি প্রান্তিক ভারতীয় ভাষার ব্যাকরণ, অভিধান ও পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি রচনায়ও তিনিই প্রথম উদ্যোগী। কিন্তু ভারত-সংস্কৃতির ধারাকে পশ্চিমে বিস্তারের কাজে স্যার এডউইন আর্নল্ডের অবদান সবিশেষ উল্লেখ্য। বুদ্ধের জীবনী অবলম্বনে 'দি লাইট অব এশিয়া' কাব্যগাথা রচনা করে এবং কবি জয়দেবের অমর সৃষ্টি 'গীতগোবিন্দ'-এর অনুবাদ 'দি ইণ্ডিয়ান সঙ অব সঙস্' লিখে উক্ত দুই গ্রন্থের অসংখ্য সংস্করণের মাধ্যমে শাশ্বত ভারত-কথার ব্যাপক প্রচারে প্রভূত সাহায্য করেন।

ইয়োরোপ মহাদেশে প্রাচীন ভারতকে তুলে ধরবার কাজে ফ্রান্সের দানও কম নয়। এক্ষেত্রেও দুজন ধর্মযাজকের নামই সর্বাগ্রে

উল্লেখ করতে হয়। তাঁরা হলেন ফাদার কালমেত এবং ফাদার পঁস। তাঁদেরই উদ্যোগে উনবিংশ শতকের প্রথমভাগে সংস্কৃত রচনাবলীর প্রথম সংগ্রহ ফ্রান্সে তথা ইয়োরোপে নীত হয়। প্যারিসের রয়াল লাইব্রেরীতে ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম সংস্কৃত সাহিত্যের গ্রন্থসূচী আনা হয়েছিল। উক্ত গ্রন্থ-সংগ্রহ তারই ফল। পণ্ডিচেরীর যশস্বী পণ্ডিত অগাস্টিন পিল্লাই কৃত 'ভাগবৎ পুরাণ'-এর ফরাসী অনুবাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের বিদ্বজ্জনমহলে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ঐ সময়ে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর ফরাসী ভাষায় একখানি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। পার্শীদের ধর্মগ্রন্থ 'জেন্দ-আবেস্তা'র প্রথম অনুবাদক আঁকোয়েতিল দ্যুপেরোঁ সম্রাট শাহ্‌জাহান-তনয় দারা শুকোহ্‌-র ফারসী অনুবাদের ভিত্তিতে 'উপনিষদ্'-এর ফরাসী অনুবাদ করে পশ্চিমী পণ্ডিতসমাজের সামনে তুলে ধরেন উনবিংশ শতকের একেবারে প্রথম বছরে। ইয়োরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সংস্কৃত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ও সংস্কৃত অধ্যাপক নিয়োগের কৃতিত্বও ফ্রান্সের। প্যারিসের কলেজ দ্য ফ্রান্সে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃতের 'চেয়ার' প্রতিষ্ঠিত হয়। ইয়োরোপে প্রথম প্রাচ্য-তত্ত্বানুশীলন সংস্থাও স্থাপিত হয় রাজধানী প্যারিসেই। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সে সংস্থা 'সোসাইটি এশিয়াটিক' নামে সারা বিশ্বে পরিচিত।

ইয়োরোপের অন্যান্য আরো কয়েকটি দেশের মানুষও ভারত-তত্ত্বানুসন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন। প্রথমযুগের ইয়োরোপীয় প্রাচ্যবিদ্-দের অন্যতম ইতালীয় পণ্ডিত ফিলিপ্পো সাশেত্তি। ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পাঁচ বছরকাল গোয়ায় অবস্থান করে তিনি গভীর অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে সংস্কৃত চর্চা ও সংস্কৃত গ্রন্থাদির অনুবাদে কাল কাটান। পরে তিনি সংস্কৃত ও লাতিন ভাষার নৈকট্য ও সাদৃশ্যের সন্ধানে ব্রতী হন। আব্রাহাম রোজার্স নামের একজন ওলন্দাজ মিশনারি দক্ষিণ

ভারতীয় হিন্দুদের জীবন-চর্যার একখানি পূর্ণ প্রতিচ্ছবি তুলে দেন ইয়োবোপীয়দের হাতে একখানি মূল্যবান গ্রন্থের মাধ্যমে, যার আগে দক্ষিণ ভাবতের হিন্দু জীবনের পরিচয়লাভের কোনো সুযোগই তাদের হয়ে ওঠেনি। আব্রাহাম রোজার্স রচিত সেই গ্রন্থখানির নাম 'ওপেন ডোর টু দি হিডেন হিদেন উইজডম' (Open Door to the Hidden Heathen Wisdom) এবং এই বইখানি আজও অত্যন্ত মূল্যবান বলে বিবেচিত।

তবে রাশিয়ায়, জার্মানিতে ও আমেরিকায় ভারত-চর্চা তথা সাংস্কৃতিক সংযোগ ও সমন্বয়ের কাজ যেরূপ নিষ্ঠা ও দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে এবং ব্যাপকতা লাভ করছে, এখানে তা বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।

কয়েক বছর আগে কোলকাতা শহরে এক প্রদর্শনীব অনুষ্ঠান হয়েছিল সাম্প্রতিক রুশ-সাহিত্যের। সেখানে দেখা গেল, শুধু নীরস বাজনীতিই সে-রাষ্ট্রেব সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য নয়। আবার জার্মানিতে প্রদর্শিত হলো পাঁচ হাজার বছবেব ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন। ভারতের গণমানসের পাঁচ হাজার বছরের সাধনার সঙ্গে পরিচয় হলো জার্মানির। জার্মানিতে অবশ্য ভারত-তত্ত্বের গবেষণা কিছু নতুন নয়। দীর্ঘ দেড়শ' বছব আগেই জার্মানি ঘনিষ্ঠভাবে জানতে চেয়েছে ভারতকে। অগাস্ট উইলহেল্‌ম্ ভন শ্লেগেল জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতেব অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে, যিনি সর্বপ্রথম শেক্‌স্‌পীয়রের রচনাবলী অনুবাদ করেছিলেন জার্মান ভাষায়। তারপর ভারত-তত্ত্ব নিয়ে দীর্ঘ অনলস সাধনা শুধু জার্মানির নয়, সারা ইয়োরোপেব সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিকে। বিদেশী শাসনে ক্লিষ্ট, অবমানিত ভারতের মর্যাদাকে জার্মানি যেভাবে তুলে ধরেছে আধুনিক জগতের সম্মুখে,

তার জন্য ভারত চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবে ঐ মহান দেশের মহান হৃদয়ের মানুষগুলির কাছে। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে মহাপণ্ডিত ফ্রেডারিক ভন শ্লেগেল 'উইস্‌ডম অ্যান্‌ড্‌ কালচার অফ ইন্‌ডিয়ান্‌স্‌' নামে যে বই লেখেন, তাই সর্বপ্রথম সারা পাশ্চাত্য জগতের সশ্রদ্ধ দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে ভারতের দিকে। ঋক্‌ বেদের প্রথম মুদ্রিত সংস্করণের অনুবাদক এবং 'প্রাচ্যের পূত গ্রন্থাবলী'র একান্ন খণ্ডের সম্পাদক জার্মান মনীষী মোক্ষমুলার ভারতে সর্বজনপরিচিত।

রাশিয়ায় ভারত-তত্ত্ব আলোচনার ইতিহাসও খুব সাম্প্রতিক নয়। বিপ্লবের অনেক আগেই লেবেদেফ, মিনায়েফ, ওলডেনবার্গ প্রমুখ পণ্ডিতরা অধ্যয়ন করেছেন সংস্কৃত এবং বৌদ্ধ শাস্ত্র। বিশেষ করে লেবেদেফ ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে একটা স্থায়ী যোগসূত্র স্থাপন করে গেছেন। তিনি বাঙালী কবি ভারতচন্দ্রের রচনাবলীর রুশ অনুবাদ প্রকাশ করেছেন, কলিকাতায় প্রথম স্থায়ী বাংলা নাট্যশালার তিনিই প্রতিষ্ঠাতা এবং সেণ্টপিটার্সবার্গে (বর্তমান লেনিনগ্রাড) সংস্কৃত ভাষার প্রেস স্থাপন এবং প্রথম হিন্দুস্থানী ব্যাকরণ প্রকাশের কৃতিত্বও তাঁরই প্রাপ্য। বিপ্লবোত্তর যুগে এই সব গবেষণার ক্ষেত্র বিস্তৃতিলাভ করেছে প্রায় কল্পনাতীতভাবে। ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ারও প্রায় জাতীয় কবি। রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উৎসবে সোভিয়েট সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মতোই দ্বাদশ খণ্ডে প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্র-রচনাবলীর রুশ অনুবাদ।

ভারত তথা সমগ্র এশিয়া সম্বন্ধে আমেরিকার কৌতূহলও ক্রমে ক্রমে বেড়ে চলেছে। দার্শনিক রালফ ওয়াল্ডো এমার্সন (১৮০৬—১৮৮২) এবং হেনরি ডেভিড থোরো-র অনুসরণে বহু মার্কিন মনীষী ও বুদ্ধিজীবীই প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে

সংস্কৃত-চর্চা আরম্ভ হয় এবং পরবর্তী কালে ধীরে ধীরে American Academy of Asian Studies, American Council of Learned Societies, Asian Institute of New York—এমনি সব প্রতিষ্ঠান ভারত-সংস্কৃতি অনুশীলনের ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে। হার্ভার্ড, পেনসিলভানিয়া, কলম্বিয়া, ইয়েল ও প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল ধরে প্রাচ্যবিদ্যা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা রয়েছে। সম্প্রতি ঐ সব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যবিদ্যার অনুশীলন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সংস্কৃতে অধ্যাপক নিয়োগ করা হয় এবং ১৮৮০খ্রীষ্টাব্দে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রাচ্যবিদ্যার অনুশীলন শুরু হয়। সে-যুগে হুইটনি লনম্যান, ওয়ারেন প্রমুখ প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌গণ অধ্যয়ন করতেন সংস্কৃত ও পালি ভাষা। বেদ সম্পর্কে আলোচনা গ্রন্থ এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ ইত্যাদি বই ঊনবিংশ শতাব্দীতেই আমেরিকায় প্রকাশিত হয় ও জনপ্রিয়তা লাভ করে।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর আমেরিকায় প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলন ক্রমশই আরও বেড়ে চলেছে। বছর কয়েক আগে আমেরিকার উটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ হেলমুট জি ক্যালিস এসেছিলেন কোলকাতায়। অনেকদিন এখানে থেকে অধ্যয়ন করে গেলেন অনেক বিষয়। ভারতে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেছিলেন—তাঁর কাজ হলো দেশ-বিদেশের সংস্কৃতির যোগসূত্র সন্ধান করে বেড়ানো, বিভিন্ন সংস্কৃতির পশ্চাৎপটে যে মানসিক সত্তা কাজ করে চলেছে তার পরিচয় লাভ করে তাকে বিশ্লেষণ করা।

এমনি করে জানার পালা শুরু হয়েছে আজ সারা পৃথিবী জুড়ে। যত জানছি পরস্পরকে ততই চিনছি। ততই দূর হচ্ছে মিথ্যা ভয় ও সন্দেহ। বুঝতে পারছি, কত সামান্য সঞ্চয়েই আমরা সন্তুষ্ট ছিলাম এতদিন। তাই আজ নতুন করে এ-কথা ভাবার সময় এসেছে

যে, আমরা ভূগোলের ব্যবধানই বড় করে দেখব, না ইতিহাসের সত্যকে? সত্যের ইতিহাস এক, অখণ্ড ও অবিনশ্বর। অগ্নিপরীক্ষা হয়েছে তার। সে জিতেছে, আরও উজ্জ্বল হয়েছে। শত মৃত্যু ও খণ্ডতার ক্ষুদ্র গণ্ডি পেরিয়ে দুর্নিবার গতিতে এগিয়ে চলেছে তার জ্যোতির্ময় রথ। সে রথের আলোকচ্ছটা পৃথিবীর মানুষের মনের সব অন্ধকার দূর করে দেবে। দেশকালের সব সঙ্কীর্ণতা লুপ্ত করে জেগে উঠবে বিশ্বমানব। কবি যার আগমনের কথা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে বলেছেন:

"ঐ মহামানব আসে, দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে।"

ভুল ব্যাখ্যার বিপর্যয়ে

পূর্ববঙ্গ তথা বাঙলাদেশে দেশপ্রেমের যে বিস্ফোরণ আমরা একাত্তর সালের প্রথমাংশে বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে লক্ষ্য করেছি তার একটা পটভূমিকা আছে। সেটা হলো তার সাংস্কৃতিক পটভূমিকা এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে পাক সরকারের সঙ্গে বাঙলাদেশের যুদ্ধকে বিচার করলে আমাদের খুব আশ্চর্য হবার কারণ থাকবে না।

সমস্ত বৈপ্লবিক পরিবর্তনেরই সূত্রপাত ঘটে সাংস্কৃতিক চিন্তায়। সংস্কৃতির ভুল ব্যাখ্যায় সময় সময় যে কি রকম ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটতে পারে হিটলারের বিভ্রান্তিকর আর্যামি তার প্রমাণ যা পৃথিবীতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। ভারত বিভাগের সর্বনাশও সূচিত হয়েছে জিন্নাসাহেব এবং তাঁর চেলা-চামুণ্ডাদের ভ্রমাত্মক ধর্মীয় ব্যাখ্যায়। ভারতের মুসলমান সমাজকে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রলোভন দেখিয়ে উত্তেজিত করার জন্যে যে পথ তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তাতে উদার ইসলাম ধর্মকে তাঁরা যে বিশ্বের কাছে কত ছোট করে ফেলেছেন স্বার্থান্ধতায় তা তাঁরা উপলব্ধিই করতে পারেন নি। তাঁদের সেই ভুলেরই প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছে বাঙলাদেশ অসংখ্য আত্মবলি দিয়ে।

সোনার বাঙলা যখন বিভক্ত হলো অনেক সুস্থ বাঙালী মুসলমানের মনেই তখন এ প্রশ্ন জেগেছে, একই দেশে একই ভাষায় যারা কথা বলে ও একই সাংস্কৃতিক পরিবেশে যাদের জন্ম এবং লালিত তারা কি কখনো পৃথক জাতি হতে পারে শুধুমাত্র ধর্মের নামে? ভাষাই হলো সবচেয়ে শক্ত জাতীয় বন্ধন, সেই ভাষাকে

উপেক্ষিত ও অবমানিত রেখে ধর্মীয় গোঁড়ামি দ্বারা পরিচালিত হওয়া এই বিংশ শতাব্দীতে কখনো সম্ভব হতে পারে না, এই প্রশ্ন পূর্ব বাঙলার যুবমনকে এমনভাবে নাড়া দিল যার পরিণতি আমরা দেখতে পেলাম ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্যে। ঐ বছরের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে যে সমস্ত তাজা তরুণ জিন্নার বেয়নেটের সামনে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের আত্মদানের ও রক্তদানের মহিমায় শুধুমাত্র ভাষাজননীই প্রতিষ্ঠিত হননি, বাঙলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত তাতে ধরা গিয়েছিল।

সংস্কৃতির অপব্যাখ্যার বিরুদ্ধে প্রকৃত সংস্কৃতিবান মানুষের যুদ্ধের সাফল্য সেদিন পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে দিয়েছিল, যা সত্য ও সুন্দর সংস্কৃতি সেই দিকেই মানুষকে আকৃষ্ট করে এবং চালিত করে। সাময়িক ভুলভ্রান্তি থেকে তাকে উদ্ধারও করে। বিকৃতির সৃষ্টি পাকিস্তানের পূর্বাংশে সংস্কৃতির বিজয়পতাকা উড়লো প্রথম পাঁচ বছরের মধ্যেই। এই বিজয় বাঙালী ঐক্যের সূচনা করে দিল এবং এখান থেকেই সূত্রপাত যুদ্ধের দ্বিতীয় তথা মূল পর্যায়ের অর্থাৎ শোষণ মুক্তির বা অর্থনৈতিক সংগ্রামের।

বাঙলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের এই পটভূমিকা সুপণ্ডিত জনাব বদরুদ্দীন উমর সাহেবের লেখা 'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা' গ্রন্থখানিতে অতি সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে।

অখণ্ড ভারতে কি ভাবে এই সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা প্রশ্রয় পেয়েছে এবং প্রসার লাভ করেছে তার একটি চমৎকার বিশ্লেষণ এই গ্রন্থখানি। নিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রচিত এরূপ গ্রন্থ প্রকাশ পাকিস্তানের প্রথম যুগে এমন কি আয়ুবশাহীর আমলেও হয়তো সম্ভব ছিল না। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের রক্তস্নানে শোধিত হয়ে পূর্ববঙ্গের মানুষ অসাম্প্রদায়িকতার মনোভাব এমনভাবে ব্যাপ্ত

করে দিয়েছে যে পাকিস্তানের পাপ নামটি পর্যন্ত তারা তাদের মানচিত্র থেকে ধুয়ে মুছে ফেলতে কৃতসংকল্প হয়েছে। এমনি একটা পরিবেশ যখন সৃষ্টি করা গেছে তখন আর কিসের ভয়, কাকেই বা ভয়? উমরসাহেব তাই সেই রক্তচিহ্নিত পবিত্র দিন ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখেই ১৯২১ সালে তাঁর 'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা' বইখানি প্রকাশ করলেন।

কোনো রকম অস্পষ্টতা না রেখে উমরসাহেব তাঁর এই গ্রন্থের একেবারে মুখবন্ধেই বললেন, 'স্বাধীনতা—উত্তরকালে সাম্প্রদায়িকতার আবর্তের মধ্যে পূর্ববাঙলার জনসাধারণকে নিক্ষেপ করে মুসলিম লীগ সরকার তাদের জিহ্বা ছেদনের চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে যা সম্ভব হয়েছিলো, জবানের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় নি। তার কারণ, জিহ্বা ও খাদ্যের সম্পর্ক যেমন ঘনিষ্ঠ, ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাথে সমগ্র আর্থিক জীবনের সম্পর্ক তেমনি গভীর—এই সত্যের উপলব্ধি তাদের মধ্যে এসেছিলো। কাজেই শেষ পর্যন্ত ইসলামী তমদ্দুনের নামে উর্দুকে বাঙলা ভাবাভাষী পাকিস্তানীদের উপর চাপানোর সাম্প্রদায়িক প্রচেষ্টা এদেশে ব্যর্থ হলো। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের এখানেই অপরিসীম গুরুত্ব। এর মাধ্যমে পূর্ব বাঙলার মুসলমান মধ্যবিত্তরা সর্বপ্রথম লাভ করলো একটা নোতুন পরিপ্রেক্ষিত এবং তাদের মধ্যে এলো অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি ও রাজনীতি চর্চার এক নোতুন অভূতপূর্ব প্রেরণা।'

বাস্তবিক পক্ষে এখান থেকেই সূত্রপাত হলো বাঙলাদেশের বর্তমান মুক্তিসংগ্রামের। বাঙালীদের চেতনাই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পূর্ববাঙলার মানুষের ঐক্যের শক্ত বনিয়াদ গড়ে তুলেছে এবং বাংলা ভাষা ও বাঙালীর সংস্কৃতিবোধই সেই বাঙালীত্বের মূল ভিত্তি। আর এ ভিত্তি এতই দৃঢ় যে তার ওপর নির্ভর করেই

বাঙলাদেশের সর্বাধিনায়ক শেখ মুজিব এই যুদ্ধ আরম্ভের কিছুদিন আগে নিশ্চিত ভরসায় বিদেশী সাংবাদিকদের তাঁর বাড়িতে বসে বলতে পেরেছিলেন, 'আপনারা কি মনে করেন মেসিনগান দিয়ে এই ঐক্যে ফাটল ধরানো কিংবা স্বাধীনতার এই দুর্বার আকাঙ্ক্ষাকে দমন করা সম্ভব ? কখনো তা সম্ভব হতে পারে না।'

একথা আজ সূর্যালোকের মতোই স্পষ্ট যে ইসলামী তমদ্দুনের নাম করে নতুন যুগের কোনো মুসলমানকে আর প্রভাবিত করা সম্ভব নয়। এমন কি প্রাচীনপন্থী মুসলমানদেরও আজ এমনভাবে ভুল ভেঙেছে যে মানুষে মানুষে বিরোধ সৃষ্টি করা কোনো ধর্মেরই লক্ষ্য হতে পারে না, ইসলামের তো নয়ই, শুধুমাত্র পূর্ব বাঙলাকে শোষণের সুবিধার জন্যেই পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরা এবং তাদের কিছু বাঙালী তাঁবেদার কথায় কথায় হিন্দু-মুসলমান বিভেদের ও ভারত-পাকিস্তান বিরোধের কথা ফেনিয়ে ফেনিয়ে বলে থাকেন—এ বিশ্বাস তাঁদের মধ্যে দৃঢ়মূল হয়ে গেছে।

মানুষের দৃষ্টিতেই মানুষের বিচার করবার এই যে নতুন চিন্তাধারার একটা স্রোত পূববাঙলায় ছড়িয়ে পড়েছে—যে স্রোততরঙ্গে গোটা বাঙলাদেশ আজ উথালপাতাল, তার একটা বিবর্তনের ইতিহাস আছে। সে ইতিহাসেরই বর্ণনা প্রসঙ্গে মুসলমানদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন শীর্ষক আলোচনায় বদরুদ্দীন উমরসাহেব তাঁর 'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা' গ্রন্থে লিখেছেন—

'মুসলমানদের এই মানসিকতার পরিবর্তনের শুরু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এবং এই পরিবর্তনের বহিঃপ্রকাশ ভাষা আন্দোলনে। পূর্বে উর্দু না জানলে কোন মুসলমানই সৎ বংশজাত বলে বিবেচিত হতেন না। শুধু তাই নয়, বাঙলা তার মাতৃভাষা একথা স্বীকার করলেও তার সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতো। পূর্ব

বাঙলার ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম বাঙালী মুসলমান বাঙালীতে রূপান্তরিত হতে শুরু করলো এবং সমস্ত সংস্কার বর্জন করে, উর্দুকে নিজের ভাষা হিসাবে বাতিল করে বাংলাকে স্বীকার করলো মাতৃভাষারূপে। এইভাবে মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমানদের জীবনে সূত্রপাত হলো এক অভূতপূর্ব চেতনার। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দ্বারা মুসলমানদের মনে যদি কোন সত্যিকারের বিপ্লব ঘটে থাকে তাহলে এই হলো তার সঠিক পরিচয়।'

এ প্রসঙ্গেই উমরসাহেব এর পরে আরো বলেছেন, 'মুসলমানদের যে দৃষ্টি দেশের প্রতি এতকাল ছিল মমতাহীন, সেই দৃষ্টিই আচ্ছন্ন হলো স্বদেশের প্রতি প্রেম ও মমতায়। ১৯৪৭ সাল থেকেই ভাষা ও সংস্কৃতির সংগ্রাম। যে মধ্যবিত্ত মুসলমান নিম্ন অবস্থা থেকে উন্নতি লাভ করে দেশের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে উদ্বিগ্ন হতো এরপর থেকে তার উদ্বেগের অবসান হতে শুরু হলো। বাঙালী পরিচয়ে সে আর লজ্জিত হলো না। যে চিত্ত ছিল পরবাসী, সে চিত্ত সচেষ্ট হলো স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে। প্রতিকূল শক্তি এবং সংস্কার এ পরিবর্তনকে প্রতিহত করা সত্ত্বেও ঘরে ফেরার এ সংগ্রাম রইলো অব্যাহত এবং তারা জয় করে চললো একের পর এক ভূমি—স্বীকৃত হলো রাষ্ট্রভাষা বাংলা, বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ঐতিহ্য; স্বীকৃত হলো রবীন্দ্রনাথ এবং পহেলা বৈশাখ। এ স্বীকৃতির কোন কোনটি এলো সরকারী ঘোষণাপত্রে কিন্তু তার সত্যিকার ক্ষেত্র হলো পূর্ব পাকিস্তানী মুসলমান মধ্যবিত্তের বিস্তীর্ণ মানসলোক। এ দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বর্তমান পর্যায়কে তাই নিশ্চিন্ত বলা চলে মুসলমান বাঙালী মধ্যবিত্তের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।'

•উমরসাহেবের এই যৌক্তিক বিশ্লেষণের মধ্যেই আমরা বাঙলাদেশের নবজাগরণের তথা পূর্ববাঙলার মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকা ও সূচনার

সন্ধান পাই। তবে এই চিন্তাধারার সমর্থক যে সবাই বা সব মুসলমানই তা নয়, মুষ্টিমেয় সাবেক জিন্নাপন্থী কিছু লোক এখনো আছেন যাঁরা হিন্দু-বিরোধিতাকে এবং হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের পার্থক্যটাকে বড়ো করে দেখানোকেই ইসলামের আসল পরিচয় বলে মনে করে থাকেন। এমনি এক শিক্ষিত বাঙালী মুসলমান ডকটর সৈয়দ আলী আশরাফ যাঁর সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতার যুক্তিকে জনাব বদরুদ্দীন উমর অত্যন্ত সার্থকভাবে খণ্ডন করেছেন।

ডকটর সৈয়দ আলী আশরাফ আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রকাশের কিছুদিন পূর্বে বলেছিলেন, বদরুদ্দীন উমরসাহেবের সঙ্গে কথা বলার অসুবিধে এই যে আলোচনার সময় একটা বিশেষ বিন্দুকে কেন্দ্র করে তিনি ঘুরতে থাকেন এবং সেই কক্ষপথ থেকে তিনি বিচ্যুত হতে রাজী হন না।

এই অভিযোগের উত্তরে 'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা' গ্রন্থের লেখক গ্রন্থের মুখবন্ধে যে বক্তব্য রেখেছেন তার মূল সূত্র হচ্ছে এই যে, 'সংস্কৃতির মূল ভিত্তি ধর্ম, বর্ণ, বংশ ইত্যাদি নয়—সে ভিত্তি মানুষের আর্থিক জীবন।' এই সেই কেন্দ্রবিন্দু যার থেকে উমরসাহেব বিচ্যুত হতে প্রস্তুত নন বলে আলী আশরাফ সাহেব অভিযোগ করেছিলেন।

জনাব বদরুদ্দীন উমর ঐ কেন্দ্রবিন্দুর গুরুত্বের প্রতি জনসমাজের দৃষ্টি সহজে আকর্ষণের জন্য নিম্নলিখিত প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন কয়টি উত্থাপন করেছেন :

(১) একই গ্রামের মুসলমান কৃষক, জমিদার ও মহাজনের জীবন ও সংস্কৃতি কি এক? (২) যে কোন গ্রামের দরিদ্র হিন্দু কৃষকের এবং মুসলমান জমিদার-মহাজনের জীবন ও সংস্কৃতি, কোনটির সঙ্গে সেই গ্রামের দরিদ্র মুসলমান কৃষকের জীবন ও সংস্কৃতির যোগসূত্র ঘনিষ্ঠতর? (৩) একজন উচ্চশিক্ষিত নগরবাসী হিন্দু এবং একজন

অল্পশিক্ষিত গ্রাম্য মুসলমান মহাজন, এ দুইয়ের মধ্যে কার সান্নিধ্য ও সাহচর্যে আলী আশরাফ সাহেবের মতো একজন উচ্চশিক্ষিত নাগরিক মুসলমান ঘনিষ্ঠ হতে না পারলেও অন্ততঃপক্ষে অধিকতর 'স্বস্তি' বোধ করবেন? (৪) ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বাঙলাদেশ ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনার এত আকাশ-পাতাল তফাৎ কেন দেখা গেলো? (৫) সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত প্রায় সব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাই প্রধানতঃ নগর-কেন্দ্রিক এবং নাগরিক ষড়যন্ত্র থেকে উদ্ভূত কেন? (৬) স্বাধীনতাপূর্ব যুগে দাক্ষিণাত্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এতো কম এবং উত্তর ভারতে তার সংখ্যা এতো বেশী হয়েছিলো কেন?

এতগুলো প্রশ্ন উত্থাপন করে উমর সাহেব বলেছেন, 'এ জাতীয় প্রশ্নের অন্ত নেই। কিন্তু এই ধরনের বাস্তব প্রশ্নগুলিকে পরীক্ষা করলেই আর্থিক জীবনের অপরিসীম গুরুত্ব এবং হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি ও সম্পর্কের সত্যিকার চিত্র উদ্‌ঘাটিত হবে।'

ইংরেজ রাজত্বের শুরু থেকেই ক্ষয়িষ্ণু মুসলমান সামন্তশক্তি এবং তাদের তাঁবেদারেরা কি ভাবে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা প্রচার করেছেন এবং দুই জাতিতত্ত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন তার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করে জনাব বদরুদ্দীন দেখিয়েছেন, কি ভাবে ঐসব লোক 'মোগল সাম্রাজ্যের দেশীয় চরিত্রকে অগ্রাহ্য করে তার ধর্মীয় চরিত্রের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছিলো।' তাদের মতে মোগল সাম্রাজ্য আসলে যে ভারতীয় ছিলো না, ছিলো মুসলমানদের রাজ্য, ওকথাই তিনি প্রমাণ করেছেন। কাজেই এইসব মুসলমানদের মতে, 'ইংরেজ রাজত্বে সমস্ত মুসলমানই হলো রাজ্যহারা—'রাজার জাতি থেকে তারা পরিণত হলো প্রজার জাতিতে।'

'রাজার জাতি' এ অবস্থা কতকাল বরদাস্ত করবে? তাই

মুসলমানদের জন্যে অর্থাৎ যেসব মুসলমান রাজা-বাদশা হয়ে শোষণের ঘোড়দৌড় চালাতে চাইতেন তাঁদের জন্যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের দাবী উঠলো। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে তখন সারা ভারতবর্ষব্যাপী জোর মুক্তির লড়াই বৃটিশরাজকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। তারই মধ্যে মাঝে মাঝে অগ্নিপূজারী বিপ্লবী তরুণের দল চরম আঘাত হেনে দেশের এক-একটি অঞ্চলের মুক্তি ঘোষণা পর্যন্ত করছেন। এমনি বিপর্যয়কর পরিবেশে মুসলিম লীগের বিভেদপন্থী রাজনীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে বৃটিশ শাসনের আয়ুষ্কালকে এদেশে আরো কয়েকটা বছর বাড়িয়ে নেবার সুযোগ করে নিল ইংরেজ সরকার। জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্বের ধুয়াকে তারা কেবলি উস্‌কে দিতে লেগে গেল।

এদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হীনবল বৃটিশ শক্তি ভারতে নৌবিদ্রোহে বিহ্বল, 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে ভীতসন্ত্রস্ত এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ-হিন্দ ফৌজের আঘাতে জর্জরিত। সেই অবস্থায় ধুরন্ধর ইংরেজ শাসকদের বুঝতে বাকি রইল না যে এবার ভারতবর্ষ থেকে পাততাড়ি না গুটিয়ে আর উপায় নেই। তখন শেষ অস্ত্র হেনে গেল ইংরেজ। তাদের পদলেহী লীগপাণ্ডাদের নবাব-বাদশা হবার সাধ মিটিয়ে দেশটাকে দু'ভাগ করে দিয়ে গেল ওরা। একটা দেশ দু রাষ্ট্র হলো ভারত আর পাকিস্তান।
কিন্তু এতে কার কতটুকু সুবিধা হলো? অনর্থক দেশ বিভাগের রাজনীতির ফলে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোকের দুঃখই শুধু বাড়ানো হলো। কোনো সমস্যারই সমাধান হলো না। সমস্যা আরো বাড়লো মাত্র। ধর্মীয় বিরোধ সৃষ্টি করে দিয়ে অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি ঘটানো হলো।

ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতার আফিম খাইয়ে সাধারণ মানুষকে

যারা নেশাগ্রস্ত করে তুলেছে তাদের কাছে একটা বড় প্রশ্ন রেখেছেন বদরুদ্দীন উমর সাহেব। তিনি জিজ্ঞেস করেছেন, ধর্মাচার আমরা কে কতটা মেনে চলি? এ প্রশ্নটি হিন্দু-মুসলমান, জৈন-খৃষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্মীয় লোকদের উদ্দেশ্যেই প্রযোজ্য। তবে উমর সাহেব মুসলমানদের লক্ষ করেই একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে দেখিয়েছেন, ইসলামী অনুশাসনে মহাজনী সুদের কারবার নিষিদ্ধ। আফগানিস্তানের কাবুলীওয়ালারা দেশে দেশে সুদের ব্যবসা করে। কিন্তু এই সুদখোর কাবুলীওয়ালারা মুসলমান নয়, একথা বললে ভুল করা হবে।'

শুধু কাবুলীওয়ালা কেন, এদেশের মুসলমানরাও কি ব্যাঙ্কে টাকা রেখে তার সুদ আত্মস্থ করেন না? এ বিষয়টির বিস্তৃত বিশ্লেষণ করে উমর সাহেব দেখিয়েছেন, 'সামন্ততান্ত্রিক মোগল সাম্রাজ্যে এবং ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে সুযোগ ও প্রয়োজনের অভাবে যে কাজ করতে তারা নারাজ ছিল, ধর্মতান্ত্রিক পাকিস্তান রাষ্ট্রে তারা সে কাজ করতে রাজী। দু-চারজন নগন্য ব্যতিক্রম ব্যতীত এদিক দিয়ে এখন হিন্দু-মুসলমান বিত্তশালী লোকদের মধ্যে ধর্মপার্থক্য সত্ত্বেও কোন তফাৎ নেই।'

এ বিশ্লেষণ একান্তভাবেই একজন প্রকৃত চক্ষুষ্মান আধুনিক মনীষী বাঙালী মুসলমানের সন্দেহ নেই এবং এও নিঃসন্দেহ যে আজকের বাঙলাদেশে এমনি ধর্মীয় গোঁড়ামি-বর্জিত যথার্থ সংস্কৃতিবান মুসলমানের অভাব নেই ঠিকই কিন্তু এমন বুদ্ধিজীবী এখনও আছেন যাঁরা আজো অবধি পুরনো বিভ্রান্তি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। ডক্টর সৈয়দ আলী আশরাফের মতো তেমনি আরেকজন হলেন ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন। এই ভদ্রলোক উমর সাহেবের অপর গ্রন্থ 'সাম্প্রদাকিতা'র সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন,

'ভারতবর্ষে বিপরীতধর্মী জাতির মোকাবেলায় মুসলমানের নিজস্ব তহবিজ ও তমদ্দুন সম্পর্কে শঙ্কিত ও সচেতন থাকতে হতো।... প্রতিপক্ষের সাংস্কৃতিক আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উপায় নিয়ে তাঁরা ছিলেন চিন্তিত। ছোটকালে ঢাকায দেখেছি মসজিদের সামনে কোন বাজনা বাজানো চলতো না। হিন্দু পর্বের সময় এ নিয়ে দাঙ্গা হয়েছে পর্যন্ত। আজকাল মুসলমানেরাই সামাজিক আচার অনুষ্ঠান উপলক্ষে নির্বিবাদে রাস্তাঘাটে বাজনা বাজায়। নামাজের সময়ে পর্যন্ত এ বাজনার বিরতি ঘটে না।...কথা এই যে পূর্বে আপত্তি হতো বাদককুল হিন্দু বলে। তাদের হাতে ইসলাম অপমানিত হবে এটা কেউ বরদাস্ত করতে রাজী ছিল না। পাকিস্তানে এসেছে ইসলাম সম্পর্কে একটা নিরাপত্তাব ভাব। দু-একজন বাদক মসজিদের সামনে বাজনা বাজালেই ইসলাম বিপন্ন হবে একথা কেউ ভাবে না।'

উমর সাহেব বলেছেন উদ্ধৃতিটির মধ্যে যে মনোবৃত্তির পরিচয় মেলে তারই নাম সাম্প্রদায়িকতা।' উদ্ধৃত অংশটি ব্যাখ্যা করে তিনি দেখিয়েছেন, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের মতে মুসলমানদের কাছে মসজিদের সামনে বাজনা বাজানোব মধ্যে আত্যন্তিকভাবে কোন দোষ নেই। অর্থাৎ তার ফলে ধর্মের প্রকৃত অবমাননা হয় না। অবমাননা হয় তখনই যখন সেই বাজনা বাজায় অমুসলমান। হিন্দু এ বাজনা বাজালে সেটা হয় সাংস্কৃতিক আক্রমণ কিন্তু মুসলমান সে কাজ করলে তার সাত খুন মাপ!'

রবীন্দ্রনাথ হিন্দু সংস্কৃতির ধারক এই বলে বাঙলাদেশ অর্থাৎ পূর্ববঙ্গকে পাক শাসকেরা বিশ্ব কবির ছোঁয়াচ থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিল। প্রতিক্রিয়ায় সে ছোঁয়াচ এতই বেড়ে গেল যে রবীন্দ্র সঙ্গীত হলো ওদের জাতীয় সঙ্গীত, রবীন্দ্রনাথ হলেন ওদের মূল প্রেরণা।

সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিকৃত ধারণা থেকেই এমনি মনোবৃত্তির সৃষ্টি এবং গোষ্ঠীগত স্বার্থচিন্তাই এ ধরনের ধারণাকে ব্যাপ্ত করে দিয়ে দেশে দেশে যুগে যুগে বিপর্যয় ঘটায়। মানব-সংস্কৃতি ও মানব-ধর্ম অবিভাজ্য। এই বোধ যখন কোন সমাজে জাগ্রত হয়ে দেখা দেয় তখনই বিকৃতির সঙ্গে, অমানবিকতার সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। বাঙলাদেশে তাই ঘটেছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সে দেশের বাঙালী মুসলমানরা যখনই দেখতে পেল তাদের সাংস্কৃতিক চেতনার ওপর ক্রমাগত আঘাত আসছে, পশ্চিমা ধনী সম্প্রদায় শোষণের রথচক্র চালিয়ে দিয়েছে সংখ্যাগুরু বাঙালীদের ওপর তখন আর তারা চুপ করে থাকতে পারলো না। বাংলাভাষার দাবী মিটিয়ে নিয়ে তারা অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তি চাইলো, তবু বিচ্ছিন্ন হতে চাইলো না পাকিস্তান থেকে। ব্যালটে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে মুজিবর ও তাঁর আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে স্বাধিকারের এ দাবী ছিল একান্তই ন্যায্য। কিন্তু ক্ষমতা-মদমত্ত জঙ্গী পাক সরকার ও নাদির সা'র বংশধর ইয়াহিয়ার কাছে ন্যায়ের কথা এবং মানবতার কথা অবান্তর। তাই ট্যাঙ্ক ও মেশিনগান ইত্যাদি সমরাস্ত্রের সাহায্যে বাঙলাদেশকে স্তব্ধ করে দিতেই তাঁরা উদ্যত হলেন। কিন্তু সাংস্কৃতিক চেতনা সম্পন্ন একটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্বাধীনতাকামী জাতিকে কখনো দাবিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

তাই বলা যায়, বিকৃতির আবর্জনা থেকে মুক্তি পেয়ে বাঙলাদেশের মানুষ যেদিন মুক্তচিন্তার অধিকারী হয়েছে পূর্ববাঙলার মুক্তিযুদ্ধেরও প্রকৃত সূচনা হয়েছে সেই দিন থেকে এবং বাঙলাদেশ ব্যালটের যুদ্ধে যেমন অসামান্য জয়লাভ করেছে, ঠিক তেমনি বুলেটের যুদ্ধেও [illegible]র জয় অবধারিত। তবে হয়তো তা কিছু সময় সাপেক্ষ। কিন্তু প্রকৃত সংস্কৃতিবোধের জয় হবেই।

ইতিহাসের গতিপথে

সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের আলোচনায় ইতিহাসের কথা বারংবার উল্লিখিত হয়েছে এবং তা স্বভাবতই হয়েছে, কারণ সংস্কৃতি বলতে আমরা কোনো বায়বীয় পদার্থ বোঝাইনি, ইতিহাসের সত্যের ওপর তার ভিত্তি দিতে চেয়েছি। তবু ইতিহাসের গতিপথে সংস্কৃতির যে-রূপ আমাদের চোখে পড়ে তার গুরুত্ব আমাদের বিচারে এতই অধিক যে, তার জন্য পৃথক আলোচনার প্রয়োজন আমরা অনুভব করি।

ইতিহাসের প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ আরম্ভের আগেও মানুষকে একটা অন্ধকারের যুগ পার হয়ে আসতে হয়েছে। সে-যুগ প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলে অভিহিত। প্রাক্-ইতিহাস কালের মানব-জীবন ও মানবাচরণ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন, তাঁদের মধ্যে অ্যাবে ব্রিউইলের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘ জীবনের অধিকারী অ্যাবে ব্রিউইল (Abbe Breuil) একালের মানুষ (১৮৭৭-১৯১১) হয়েও প্রাক্-ইতিহাস বিজ্ঞানের জনক বলে পরিচিত। শুধু ঘরে বসে গবেষণা নয়, তিনি মস্তবড় এক পর্যটক। পৃথিবীর নানা দেশ তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন, আদিম যুগের মানুষদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছেন অবিরাম এবং ধর্মীয় অনুভূতি ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিচার করে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে এসেছেন। ধর্মে গভীর বিশ্বাসী হলেও, ধর্ম এবং বিজ্ঞানকে তিনি কখনো বিপরীতধর্মী বলে মনে করতেন না। তাঁর সমগ্র জীবন বাস্তবিকপক্ষে ধর্ম ও বিজ্ঞানেরই সমন্বয়ক্ষেত্র এবং প্রাক্-ইতিহাসকালের গবেষণায় মানুষের আচরণেও তিনি সমন্বয়সূত্রের আবিষ্কার করেছেন। কর্মজীবনের আরম্ভে তাঁর সম্মুখে ছিল কতকগুলি

বিশৃঙ্খল তথ্য ; কর্মজীবন থেকে তিনি যখন নিষ্ক্রান্ত হয়ে এলেন তখন দেখা গেল সেই তথ্যাবলী· এক সুসমঞ্জস সমগ্রতার রূপ নিয়েছে। অ্যাবে ব্রিউলের প্রথম সাফল্য উচ্চতর প্রত্ন-প্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতি-পর্বের প্রতিষ্ঠায়। সেকালের মানুষও যে সংস্কৃতিবর্জিত ছিল না, সংস্কৃতিবোধ যে তাদেরও ছিল এবং তখনো যে সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হতো, তার প্রমাণ-পরিচয় তিনি উদ্ধার করেছেন, এ কি বড় কম কথা ? ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে 'উচ্চতর প্রত্ন-প্রস্তরযুগেব উপ-বিভাগ' সম্বন্ধে তিনি যে গবেষণাপত্র পাঠ করেন, তাতেই সর্বপ্রথম প্রাগৈতিহাসিক যুগ সংক্রান্ত নতুন আবিষ্কারসমূহ সুসংবদ্ধভাবে সন্নিবিষ্ট হয়েছে এবং সে আবিষ্কারসমূহের সত্যতা আজও প্রশ্নাতীত। প্রকৃতপক্ষে প্রাক্-ইতিহাস কাল বলতে একালের লোকের যে ধারণা, তা অ্যাবে ব্রিউইলেরই সৃষ্ট এবং তাঁর জীবনীকার এ্যালেন হাউটন ব্রোডরিকের[১] মতে ইতিহাসের দৃঢ়ভিত্তির তিনিই প্রতিষ্ঠাতা।

ব্রোডরিক দেখিয়েছেন, ব্রিউইল কিভাবে চীনের প্রাচীনতম যুগ ও দক্ষিণ আফ্রিকার আদিম কাল সম্বন্ধে অপরিসীম জ্ঞান অর্জন করেছিলেন এবং পরবর্তী কালে গভীব গিরিগুহা পর্যটন ছেড়ে নতুন অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান আহরণের জন্য কিভাবে হিমবাহের দেশ পরিভ্রমণ করে চলেছেন।

এ-কথা অনস্বীকার্য যে, ব্রিউইল-ই প্রথম অতি স্পষ্টভাবে সমগ্র পৃথিবীর কাছে পুরাতন প্রস্তর যুগের শিল্পকলাকে তুলে ধরেছেন। সেই শিল্পকলার যে অপূর্ব অনুলিপি তিনি রচনা কবেছেন, আজও তা গভীর গিরিগুহা থেকে শিলাশ্রয় পর্যন্ত নানা শিল্প-পর্বের কথা স্মরণ

---

১ *The Abbe Breuil, Prehistorian* by Alan Houghton Brodriek.

করিয়ে দেয় এবং পরবর্তী কালের স্পেনীয় চিত্রশিল্প সম্বন্ধে একটা ভাবানুভূতির অনুরণন জাগিয়ে তোলে।

বাস্তবিকই ব্রিউইল ছিলেন 'প্রাগৈতিহাসিক জাতি-বিজ্ঞানী'। আদিম মানুষ সম্বন্ধে তিনি আমাদের ধারণা পাল্টে দিয়েছেন। আদিম মানুষের সংস্কৃতির স্বরূপ তিনি আমাদের নিকট উদ্ঘাটন করেছেন এবং আমরা বুঝতে পেরেছি যে, সংস্কৃতিবোধই সে-যুগের মানুষকেও সংযোগ ও সমন্বয়ের পথে টেনে নিয়ে চলেছে। ব্রিউইলের আবিষ্কার এভাবেই একালের মানুষের চিন্তাধারার ওপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছে। ইতিহাসের গতিপথে সংস্কৃতির ধর্ম বিচারে ব্রিউইলের দানকে তাই অস্বীকার করার উপায় নেই।

কোনো কোনো দার্শনিকের বিচারে মানুষের ইতিহাস না-কি নিরন্তর দ্বন্দ্বেরই কাহিনী। সেই দ্বন্দ্ব হয়তো রুটি আদায়ের, অথবা ক্ষমতা দখলের। এই মতবাদের পশ্চাতে অংশত সত্যের সমর্থন থাকতে পারে, কিন্তু মনে রাখতে হবে পৃথিবীর সকল ঐতিহাসিক বা দার্শনিক এই দ্বন্দ্বের সূত্র নির্দ্বিধায় মেনে নেননি। মানুষের ইতিহাসের গোড়ার দিকে মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব নিশ্চয়ই ছিল বৃহৎ পরিমাণে এবং চিরদিনই হয়তো থেকেছে। এবং এ-কথা বলা ভুল যে, আদিকালে মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল 'আদিম সাম্যবাদ'; কারণ অনেক ঐতিহাসিকই[১] দেখিয়েছেন যে, আদিম সাম্যবাদ কথাটি হাস্যকর; কারণ, আদিতেই প্রাণ-ধারণের জন্য মানুষে মানুষে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ছিল আজকের তুলনায় অনেক বেশী।

সে যাই হোক, ইতিহাস নিরন্তর দ্বন্দ্বের কাহিনী কি-না, সে-প্রশ্ন বিচার করতে আমরা বসিনি। ইতিহাস দ্বন্দ্বের কাহিনী নয়—এ-কথা যদিও আমরা বলতে না-পারি, ইতিহাস যে শুধুই দ্বন্দ্বের

---

১ এইচ. জি. ওয়েলস্ তাঁদের অন্যতম।

কাহিনী নয়, এ-কথা আমাদের নির্দ্বিধায় বলা উচিত। কারণ, ইতিহাসের ধারায় এ-কথা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, দ্বন্দ্বের পাশে পাশে মিলনেরও একটা কাহিনী ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় এবং ইতিহাসের গতিপথে মিলনের এই ধারার গুরুত্ব মোটেই ন্যূন নয়।

আমাদের 'সংস্কৃতির ধর্ম'-এর আলোচনায় পূর্ববর্তী নানা অধ্যায়ে মানবেতিহাসের এই সমন্বয়ের ধারা প্রসঙ্গত হয়তো উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু পৃথক অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গের পুনরালোচনার কারণ, এই সমন্বয়ের ধারাটির দিকে সকলের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হওয়া উচিত বলে আমাদের বিশ্বাস।

এই সমন্বয়ের কাহিনীর সন্ধান বহু স্থানেই মিলতে পারে, কিন্তু আমাদের এর জন্য খুব বেশী দূরে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না, আমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনা[১] থেকেই আমাদের কাছে সমন্বয়ের এই ধারা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ভিন্নধর্মী মানুষের লীন হয়ে যাওয়ার কথা শুধুই কবি-কল্পনা নয়, তথ্যের ভিত্তিতে তার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠা আছে।

কিছুকাল আগে পর্যন্তও আমাদের ধারণা ছিল যে, আর্যদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে সভ্যতার সূচনা হয় এবং তার আগে ভারতবর্ষীয়েরা ছিল নেহাতই অসভ্য ও পশ্চাৎপদ। আর্যরা শুধু উন্নত দেহ নিয়েই ভারতে আসেনি, সঙ্গে এনেছিল উন্নত ভাষা, উন্নত সংস্কৃতি এবং উন্নত বস্তুসভ্যতা। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিক

---

১ এই অধ্যায়ের আলোচনায় নানা গ্রন্থের মধ্যে বিশেষত ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের 'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস' ও ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য' গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণায় এবং বিশেষত মোহেন্‌জোদড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের পর থেকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের ধারণার পরিবর্তন ঘটে গেছে। আর্যদের আগমনের পূর্বেও ভারতে যে রীতিমতো একটি অগ্রসর সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা প্রকৃতই প্রাগার্য সভ্যতা কি-না, তাই নিয়ে ইতিহাসবিদ্‌দের মধ্যে যথারীতিই মতভেদ আছে; কিন্তু এই সভ্যতাকে অনার্য অথবা আর্য-পূর্ব সভ্যতা বলে মনে করার পক্ষেই সম্ভবত দৃঢ়তর যুক্তির সমর্থন আছে।

এক সময়ে ইয়োরোপীয় জাতিসমূহের এরূপ বিশ্বাস ছিল যে, সভ্যতা-সংস্কৃতির যা-কিছু লক্ষণ তার সব-কিছুই ঐ ইয়োরোপের সীমানাতেই সীমাবদ্ধ এবং গোটা পৃথিবীকে সভ্য করার ঈশ্বর-ন্যস্ত দায়িত্ব তাদের। কিন্তু দুনিয়ার দরিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই তাদের সে ভুল ভাঙলো; তারা দেখতে পেল যে, অনেক উচ্চতর সভ্যতা ও বহু প্রাচীন সংস্কৃতির অধিকারী আফ্রিকার মিশর, এশিয়ার চীন ও ভারত প্রভৃতি দেশ। বিখ্যাত ঐতিহাসিক উইল ডুরাণ্ট ভারতবর্ষ সম্পর্কে যথার্থই লিখেছেন,

'Here is a vast Peninsula of nearly two million square miles; an impressive continuity of development and civilisation from Mohenjodaro to Gandhi; philosophers playing a thousand variations on one monistic theme from the Upanisads eight centuries before Christ to Sankara eight centuries after him; minstrels singing great epics almost as old as Homer, and poets holding world audiences today, ... that in India that patient scholarship is now opening up, like a new intellectual continent, to that Western mind which only yesterday thought civilisation an exclusively European thing'. ১

১ Will Durant: Our Oriental Heritage, Chap XIV. pp.391

ইতিহাসের গতিপথে বহির্বিশ্বে ভারত আবিষ্কৃত হবার পর সুপ্রাচীন সংস্কৃতি প্রভায় পাশ্চাত্য মনীষীমণ্ডলী স্বভাবতই চমৎকৃত ও বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছেন। সংস্কৃতির যে স্তরে সেই সুদূর অতীতে ভারত গিয়ে পৌঁছেছিল, সেখানে পৌছুবার কথা আধুনিক সভ্যতার গর্বে গর্বিত আমেরিকাও ভাবতে পারে না। সংস্কৃতির বিকাশ-সাধনে সম্পদ-প্রাচুর্যের যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে প্রাচীন ভারতে তার অভাব ছিল না নিঃসংশয়েই বলা যায়। তাই সেকালের ভারতবাসী প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও পরম পথের সন্ধানে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে, ভোগের পরিবেশে ও ত্যাগের মহিমায় আকৃষ্ট হয়েছে। ভারত-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ সংস্কৃতির সেই মহাবাণীই প্রচার করে এসেছেন ভোগবাদী নতুন পৃথিবীর নরনারীর কাছে। ইতিহাসের রথচক্রের সঙ্গে সঙ্গে সেই থেকে প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের এবং ত্যাগ ও ভোগের আদর্শের মধ্যে সমন্বয়ের কাজ চলে আসছে অতি দ্রুত তালে। সম্ভোগ-সম্পদের অতিশয়তা মানবাত্মাকে বিকৃত করে, এ-কথা উইল ডুরাণ্ট-ও স্বীকার করেছেন। সাংস্কৃতিক তৃষ্ণাই যে শেষ পর্যন্ত মানুষকে সমস্ত বিকৃতি থেকে রক্ষা করে, ইতিহাসই বার বার আমাদের সে শিক্ষা দিয়ে চলেছে।

আমেরিকার মানুষের মধ্যে সেই সাংস্কৃতিক পিপাসা আজ প্রচণ্ড রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। তাই অপরিসীম সম্পদের গর্ব করেও উইল ডুরাণ্টকে বলতে হয়,

'... We have become wealthy, and wealth is the prelude to art. In every country where centuries of physical effort have accumulated the means for luxury and leisure, culture has followed as naturally as vegetation grows in a rich and watered soil. To have become wealthy was the first necessity; a people too must live before it can philosophize. No doubt we have grown faster than nations usually have grown; and

the disorder of our souls is due to the rapidity of our development. We are like youths disturbed and unbalanced, for a time, by the sudden growth and experiences of puberty. But soon our maturity will come; our minds will catch up with our bodies, our culture with our possessions. Perhaps there are greater souls than Shakespeare's, and greater minds than Plato's, waiting to be born. When we have learned to reverence liberty as well as wealth, we too shall have our Renaissance'.৫

এই তো সত্যিকাবের সাংস্কৃতিক পিপাসা। এবং এ পিপাসার পূর্ণ তৃপ্তি সময়সাপেক্ষ। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে ডুরাণ্ট তাই বলেছেন,

'... let us remember that England needed eight hundred years between her foundation and her Shakespeare; and that France needed eight hundred years between her and her Montaigne.'

আমেরিকাব ইতিহাসই তো মাত্র সাড়ে তিনশ' বছরের। কাজেই তাব সাংস্কৃতিক জীবনের মহিমময় বিকাশে যদি আরো কিছু বিলম্ব ঘটে, তার জন্য অস্থিরতা প্রকাশের কোনো কারণ নেই, ডুরাণ্টের এমত যুক্তি গ্রাহ্য বটে।

ইতিহাসের গতিপথে সংস্কৃতি কিভাবে তার সমন্বয়ের কাজ করে চলেছে, ভারত-ইতিহাসের পর্যালোচনায় তা স্নুন্দবভাবে বিশ্লেষণ করা চলে।

নৃতাত্ত্বিকদের গবেষণায় সন্ধান পাওয়া গেছে যে, ভারতের আদিতম অধিবাসীরা ছিল নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু জাতির মানুষ। ন্যূনপক্ষে পাঁচ-ছ' হাজার বছর পূর্বে ভারতে এদের বাস ছিল, সভ্যতায় এরা ছিল নিতান্তই পশ্চাৎপদ এবং কৃষিকাজও এদের কাছে

---

৫ Will Durant: The Story of Philosophy, pp. 530. (Pocket Lib. Ed.)

অজ্ঞাত ছিল। এই সময় উত্তর-পূর্ব দিক দিয়ে অস্ট্রিক জাতি সম্ভবত ইন্দোচীনের কোনো স্থান থেকে এদেশে এসে পৌঁছয়। এই অস্ট্রিক জাতি ছিল সভ্যতায় প্রাগ্রসর এবং তারা এদেশে উল্লেখযোগ্য সভ্যতার পত্তন করে। যদিও এই অস্ট্রিক জাতির লোকরা সভ্যতায় উন্নত ছিল বলে অনুমান করা হয়, তবু ভারতে এসে অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ নিগ্রোবটুদের কাছ থেকে এরা দূরে সরে থাকতে পারেনি। আদিম নিগ্রোবটুদের সঙ্গে এদের মিলনের ফলে নিগ্রোবটু ও অস্ট্রিক রক্তের মিশ্রণ ঘটে। এই রক্ত-মিশ্রণের ফলেই কোল, মুণ্ডা প্রভৃতি জাতির সৃষ্টি হয় বলে নৃতাত্ত্বিকদের ধারণা।

অস্ট্রিক জাতির উন্নততর সভ্যতার কথা ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে; তারাই ভারতে কৃষিকাজের ভিত্তিতে সুসভ্য জীবনের সূচনা করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, শুধু এই অস্ট্রিক জাতি-প্রবর্তিত বস্তুসভ্যতার ধারাই যে আমরা এখনও বহন করে চলেছি তাই নয়, এদের বহু আধ্যাত্মিক বিশ্বাসও আমাদের মধ্যে বর্তমান। মৃত্যুর পরেও যে মানুষের আত্মা বর্তমান থাকে, অস্ট্রিকদের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত ছিল এবং এই ধারণাই পরবর্তী কালে হিন্দু পুনর্জন্মবাদের রূপ গ্রহণ করে। তাছাড়া, ভারতের ধর্ম-অনুষ্ঠানে ধান, পান, কলা, হলুদ, সিঁদুর প্রভৃতির স্থান অস্ট্রিক প্রভাবেরই অবদান।

আর শুধু আধ্যাত্মিক বিশ্বাসই নয়, অস্ট্রিকদের ভাষার বহু শব্দও আমরা আজও ব্যবহার করে চলেছি। এইসব শব্দের নানা উদাহরণই উল্লেখ করা যায়, কিন্তু আমরা হয়তো সকলে জানি না 'গঙ্গা'র মতো শব্দও অস্ট্রিক ভাষার কাছ থেকেই নেওয়া বলে ভাষাতাত্ত্বিকরা অনুমান করেছেন।

অস্ট্রিকদের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় একই সময়ে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আরো একটি শক্তিশালী জাতি ভারতে এসে প্রবেশ করে। তারা

দ্রাবিড়। অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় উভয়েই সভ্য জাতি ছিল, কিন্তু উভয়ের সভ্যতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল। অষ্ট্রিকদের সভ্যতা ছিল মূলত গ্রামীণ এবং দ্রাবিড়দের সভ্যতা ছিল নাগরিক। মোহেন্‌জোদড়ো ও হরপ্পায় যে নগর-সভ্যতার প্রমাণ পাওয়া গেছে, তা থেকে দ্রাবিড়দের সভ্যতার উচ্চমান সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অষ্ট্রিকদেব বসবাস ছিল প্রধানত উত্তব ভাবতে, বিশেষত গাঙ্গেয় উপত্যকায়; এবং দ্রাবিড়দেব বসবাস ছিল দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে। কিন্তু তবু অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড়রা পরস্পবের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকতে পাবেনি। গাঙ্গেয় উপত্যকায় এই দুই জাতির মধ্যে বিশেষ মিশ্রণ ঘটে বলে নৃবিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত কবেছেন।

এ-যাবৎ যারা ভাবতে এসে পৌছেছে তারা যখন কোথাও মিলে-মিশে, কোথাও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করছে, তখন আর্য জাতির আবির্ভাবে ভারতবর্ষেব ইতিহাসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেল। সর্ববিষয়েই যে আর্যবা প্রাগার্যদেব চেয়ে অগ্রসর ছিল এমন নয়, বরং বস্তুসভ্যতায় তারা ছিল পশ্চাৎপদ—কিন্তু তাদেব সম্পদ ছিল তাদেব কর্ম ও কল্পনাশক্তি, শৃঙ্খলাবোধ এবং নতুনকে গ্রহণ করার ক্ষমতা। আর্যদের সর্বাপেক্ষা বড় দান এই যে, তারা ভারতে এসে এক ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির বন্ধনে সারা দেশকে বাঁধতে পেরেছে। সেই ভাষা শক্তিশালী সংস্কৃত, সেই ধর্ম বৈদিক ধর্ম এবং সেই সংস্কৃতি আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি।

আর্যরা যখন ভারতে এল সঙ্গে সঙ্গেই তাবা সমগ্র দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিল এবং বিনা সংঘর্ষেই এই ঐক্য সাধিত হয়েছিল এমন ধারণা করা ভুল। কোনো জাতিই বিনা প্রতিরোধে কিছু গ্রহণ করে না। অনার্যরাও আর্য সংস্কৃতি গ্রহণে নিশ্চয়ই প্রাথমিক বিমুখতা দেখিয়েছিল, কিন্তু প্রবলতর আর্য সংস্কৃতি ও ভাষার কাছে তারা পরাজয় না মেনে পারেনি।

কিন্তু শুধু প্রবল বলেই যে আর্য সংস্কৃতি জয়ী হয়েছিল, এ-ধারণা করাও সমান ভুল। আর্যদের সবচেয়ে বড় গুণ ছিল যে, তারা শুধু দিতেই নয়, নিতেও সমান প্রস্তুত ছিল। কৃষিকাজের সার্থকতা বুঝে তারা এই কাজ অনার্যদের কাছ থেকে শিখে নিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। এবং এই দেওয়া নেওয়ার মধ্য দিয়েই আর্য ও অনার্য মিলিত হয়ে হিন্দু জাতি গঠিত হয়েছিল। আচার্য সুনীতিকুমারের ভাষায়: "আর্যের ভাষা ও আর্যের ধর্ম—বৈদিক ধর্ম ও বৈদিক হোম যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান—অনার্যেরা শিরোধার্য করিয়া লইল।...কিন্তু অনার্যের ধর্ম মরিল না, অনার্যের ইতিহাস-পুরাণও মরিল না; ক্রমে অনার্যের ধর্ম ও অনুষ্ঠান পৌরাণিক দেবতাবাদে, পৌরাণিক পূজাদিতে, যোগচর্যায়, তান্ত্রিক মতবাদে ও অনুষ্ঠানে, আর্যদের বংশধরদিগের দ্বারাও গৃহীত হইল। আর্য ও অনার্য, এই টানা ও পড়িয়ান মিলাইয়া হিন্দু সভ্যতার বস্ত্র বয়ন করা হইল।"

প্রাথমিক অবশ্যম্ভাবী সংঘর্ষ সত্ত্বেও এই যে মিলন—মানবেতিহাসে এটি নিতান্তই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা; কারণ, এ-থেকে আমরা এই প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভ করি যে, বিরোধে নয়, বিভেদে নয়, সমন্বয়ের মধ্যেই আমাদের অস্তিত্বের রহস্য লুকিয়ে আছে।

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, মানুষের ইতিহাসে এই সমন্বয়ের ধারার উদাহরণ অপ্রতুল নয়। ভারতীয় সভ্যতা ছাড়াও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে যে উদাহরণ মনে পড়ে, তা হলো গ্রীক সভ্যতা। ফিনিশীয়দের গ্রীসে আগমনের পর গ্রীকরা যেভাবে নতুন সভ্যতাকে গ্রহণ করে নতুনতর বিস্ময়কব এক সভ্যতার জন্ম দিল তা ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। পূর্বের একটি পরিচ্ছেদে ('সভ্যতার উপকরণ প্রসঙ্গে') এ-বিষয়ে বিশদ আলোচনা আমরা করেছি বলেই এখানে তার পুনরুল্লেখ করা হলো না।

এমনিভাবে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য-সম্পন্ন যে-কোনো প্রাচীন জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে, দেহ ও মনের বহুবিধ কার্যের সমন্বয় বিধানই ছিল তাদের যাবতীয় কর্মবিধির মৌল লক্ষ্য। গ্রীস ও রোমের প্রথম সাক্ষাৎ তাই সংঘাতের মাধ্যমে হলেও পরিসমাপ্তি ঘটেছে তার পূর্ণ সমন্বয়ে। এশিয়ার বা আফ্রিকার সঙ্গে ইয়োরোপের সম্পর্কের ইতিহাস যখন ভবিষ্যতের নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকরা বিশ্লেষণ করবেন, তখনও এই সত্য স্বীকৃত হবে যে, সংগ্রামের ভীষণতার মধ্যে যে মহামিলনের সূত্রপাত হয়েছিল, একে একে সাম্রাজ্যের শৃঙ্খল খসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটে চলেছে তার সার্থক রূপায়ণ। তরবাবি হাতে সংহারকের মূর্তিতে যারা একদিন বেরিয়েছিল বিশ্বজয়ের দুরন্ত খেয়ালে, সে-সময় তাদেব কাছে হয়তো কোনোরূপ সমন্বয়ের চিন্তা কল্পনারও অতীত ছিল। কিন্তু ইতিহাসের গতিপথে সংস্কৃতিব যে রূপান্তর ঘটে চলেছে, যুগ যুগ ধরে সংগ্রহ, সংমিশ্রণ ও সহযোগিতার মাধ্যমে মানব-সংস্কৃতির একটি সমন্বিত রূপ যে ক্রমশ সত্য ও স্পষ্ট হয়ে উঠছে, তাতে ইতিহাসেব ঐ পররাজ্যলোভী খেয়ালী মানুষগুলির পরোক্ষ দান কিছু কম নয়।

আসল কথা, সংস্কৃতি যে সমগ্র মানব সত্তার পরিচয়বাহী আলোকিত কেন্দ্র-বিন্দু, ইতিহাসই তা প্রমাণ করবে।* ইতিহাসের গতি সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সেই পথেই যেন এগিয়ে চলেছে।

অন্ধকারে আলো বিকিরণ

সংস্কৃতির অবস্থিতি সর্বত্র। কি অন্ধকারে, কি আলোর রাজ্যে—সবখানেই তার অনিবার্য অধিষ্ঠান। ইতিহাস এগিয়ে চলে। তার অগ্রবর্তী আলোর মশালবাহী সংস্কৃতি। অন্ধকারে আলো বিকিরণ তার অন্যতম ধর্ম।

আফ্রিকার দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টিকে পরিষ্কার করে দেখানো চলে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে
স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে
নতুন সৃষ্টিকে বারবার করছিলেন বিধ্বস্ত,
তাঁর সেই অধৈর্যে ঘন-ঘন মাথা নাড়ার দিনে
রুদ্র সমুদ্রের বাহু
প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে
ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, আফ্রিকা—
বাঁধলে তোমাকে বনস্পতির নিবিড় পাহারায়
কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে।

এই 'কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে' বন্দিনী আফ্রিকাকেই বলা হতো 'ডার্ক কন্টিনেন্ট' অর্থাৎ 'অন্ধকার মহাদেশ'। শুধু কালো আদমীদের বাসভূমি বলেই যে আফ্রিকা 'অন্ধকার মহাদেশ' বলে অভিহিত তা নয়, দীর্ঘকাল সে তথাকথিত সভ্য পৃথিবীর কাছে অপরিচিত রয়ে গেছে, তাই তার এই বিশেষ পরিচয়। যা জানি না তাই তমসাবৃত,

যা অনাবিষ্কৃত তাই অন্ধকার। মূলত, সেই অর্থেই আফ্রিকা 'অন্ধকার মহাদেশ'।

কিন্তু সভ্য পৃথিবীর সঙ্গে দীর্ঘকাল তার পরিচয় ঘটেনি বলে যে আফ্রিকা অসভ্য ছিল, এরূপ ধারণা করা ঠিক নয়। সভ্য জগতের সংস্পর্শে আসবার আগেও তার নিজস্ব সভ্যতার একটা গর্ব ছিল আফ্রিকার, সংস্কৃতির এক স্বতন্ত্র ধারায় সে লালিত চালিত হয়ে এসেছে যুগ যুগ ধরে। তার সেই সংস্কৃতি-সাধনার স্বরূপ কি? দুর্গমের রহস্য উদ্ঘাটনের সাধনা, ভীষণের সম্মুখীন হওয়ার এবং ভয়কে জয় করার সাধনা। শুধু প্রাচীন আফ্রিকার মানুষই নয়, একালের আফ্রিকানরাও বীরত্বে অতুলনীয়। মৃত্যুকে ওরা পরোয়া করে না এবং বীরের সমরযাত্রা ও বীরের মতো মৃত্যুই ওদের কাছে চিরকাম্য। নারীদেহ-লোভী অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে কী তীব্র ঘৃণা আফ্রিকাবাসীর! পরদেশী অন্যায়কারীকে শায়েস্তা না-করা পর্যন্ত ওদের নিবৃত্তি নেই। তাই ঘানার এক আধুনিক কবি জি. অত্তনুর উইলিয়ামস্‌কে তাঁর 'রণাঙ্গনের গানে' গাইতে শুনি—

'মরবই যদি সমরাঙ্গনে করে যাব প্রাণপাত,
মৃত্যুর সাথে অন্য কোথাও চাহি নাকো মোলাকাত।'

এমনি গৌরবময় মৃত্যু-বিলাসের, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় এমনি সমর-পিপাসার অসংখ্য স্বাক্ষরের সন্ধান পাওয়া যায় আফ্রিকার প্রাচীন লোকগাথায় ও শিল্পকর্মে এবং সেই ঐতিহ্যধারারই সফল পরিণতিকে আমরা একালে প্রত্যক্ষ করি আধুনিক আফ্রিকার শিল্প-সাহিত্যে। গর্বোদ্ধত পশ্চিমী সভ্যতার সংস্পর্শে এসেও আফ্রিকার মানুষ কখনো সভয় কোমলতার আশ্রয় নেয়নি, বরং 'বিভীষিকার প্রচণ্ড মহিমা'য় সে সমস্ত 'শঙ্কাকে হার মানাতে'ই উদ্গ্রীব উৎকণ্ঠায় কাল কাটিয়ে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথও সে কথাই বলেছেন তাঁর 'আফ্রিকা' কবিতায়। সেই 'কৃপণ আলোর অন্তঃপুরে'—

সেখানে নিভৃত অবকাশে তুমি
সংগ্রহ করছিলে দুর্গমের রহস্য
চিনছিলে জলস্থল-আকাশের দুর্বোধ সংকেত,
প্রকৃতির দৃষ্টি-অতীত জাদু
মন্ত্র জাগাচ্ছিল তোমার চেতনাতীত মনে।
বিদ্রূপ করছিলে ভীষণকে
বিরূপের ছদ্মবেশে,
শঙ্কাকে চাচ্ছিলে হার মানাতে
আপনাকে উগ্র ক'রে বিভীষিকার প্রচণ্ড মহিমায়
তাণ্ডবের দুন্দুভিনিনাদে।

এই দুর্দম যৌবন-ভাবনা, এই ভয়ঙ্করের সাধনাই আফ্রিকার জীবন-সংস্কৃতির বড় পরিচয়। বিশ্ব-সংস্কৃতির ভাণ্ডারে তার অবদান এইখানে। শ্রীজওহরলাল নেহরু ঠিকই বলেছেন :

'Each country has something substantial to contribute to World's culture. Africa, though an old continent, is still capable of giving a feeling of youth and vitality to its children, which are very precious for any race or individual.' ১

বিশেষ এক সাংস্কৃতিক পরিবেশে আফ্রিকাও আর দশটা সভ্য দেশের মতোই বিবর্তনের এক সুনির্দিষ্ট ধারা ধরে এগিয়ে চলেছিল। সে ধারা আফ্রিকার নিজস্ব প্রাণরসে পুষ্ট। সে সম্পদ তার বাইরে থেকে ধার করে আনা সম্পদ নয়, সে তার মাঠের ফসলের মতোই নিজস্ব মাটির দান। প্রাকৃতিক প্রতিবেশে আপনা থেকেই তা গড়ে

---

১ From a speech addressing African students in India, December 26, 1953.

উঠেছে, বাইরে থেকে এসে তার ঘাড়ে চেপে বসেনি। সুপ্রাচীন কাল থেকে আফ্রিকার জনগণ তাদের যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করে নিয়ে চলেছে, যে জীবন-নীতি তারা অনুসরণ করে আসছে, তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় তাদের চিত্রকলায় ও ভাস্কর্যে, তাদের নৃত্য-গীতে ও উৎসব-সজ্জায় এবং এ-সবেরই যথেষ্ট আকর্ষণ রয়েছে সভ্য পৃথিবীর মানুষের কাছে। ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের একটি কথা এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন,

'A civilisation should be judged not merely by advances in technology but by the state of the human being and the relations among men.' ২

এই মাপকাঠিতে বিচার করলে প্রাচীন আফ্রিকাকে একেবারে সংস্কৃতি বর্জিত অসভ্য দেশ বলে সরাসরি রায় দিয়ে দেওয়া চলে না। বরং এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে, বিচ্ছিন্ন পশ্চাদ্‌গামী আফ্রিকাতেও মানুষের সহজাত সংস্কৃতিবোধ বিদ্যমান ছিল। সেই 'অন্ধকার মহাদেশে'ও সংস্কৃতি তার আলো বিকিরণের কাজ করে আসছে এবং সে অনুপাতেই সেখানে নানা ক্ষেত্রে নতুন নতুন পরিবর্তনের সূচনা হচ্ছে। অতীত বর্তমানকে এবং বর্তমান ভবিষ্যৎকে পথ ছেড়ে দেয়। তারই জন্যই তো আমরা পরিবর্তনের স্বাদ গ্রহণে সক্ষম। সেই নতুন স্বাদ গ্রহণ করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে ভালো ভালো কিছু পুরনো আকর্ষণকেও বিদায় দিতে হয়। ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ-ও তাই বলেছেন,

'All life is a transition from the past into the future. If the Africans in their eagerness to raise their status and standards breaks their links with the past, humanity at large will to that extent be impoverished.' ৩

২, ৩ From Foreward to AFRICANISM by Suniti Kumar Chatterji. এ অধ্যায় রচনায় ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের AFRICANISM গ্রন্থের সাহায্য বিশেষভাবে নেওয়া হয়েছে।

অবস্থা চিরকাল অপরিবর্তিত থাকে না, আর তা থাকা সম্ভবও নয়। মানুষের লোভ, মানুষের অনুসন্ধিৎসা একদিন মধ্য-এশিয়া ও ইয়োরোপের মানুষকে টেনে নিয়ে গেছে 'অন্ধকার আফ্রিকা'র অভ্যন্তরে। আফ্রিকার অন্ধকার ঘরের দরজা খুলে গিয়েছে সভ্য পৃথিবীর কাছে। সেই ঘরে এসে উপস্থিত হয়েছে মধ্য-এশিয়ার মুসলমান শক্তি, পরে আগমন ঘটেছে ইয়োরোপের খ্রীষ্টানদের। মুসলমানরা উত্তর আফ্রিকার এক বৃহদংশ দখল করে বসেছে, দখলে রেখেছে এবং শেষ পর্যন্ত তারা সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়ে উত্তর আফ্রিকার স্থায়ী অধিবাসীই ব'নে গিয়েছে। এমনিভাবেই সংস্কৃতির এক ধারার সঙ্গে আরেক ধারার সংমিশ্রণ ঘটেছে সেখানে।

ইয়োরোপীয় খ্রীষ্টানদের বেলায় কিন্তু তা হয়নি। খ্রীষ্টান মিশনারিরা ধর্মের আড়ালে খ্রীষ্টীয় রাজশক্তিকে ডেকে নিয়ে গেছে তুরধিগম্য আফ্রিকায়। সে শক্তি প্রমত্ত, সাম্রাজ্যের ভিৎ গাঁথবার তুরন্ত নেশা তাদের মনে। সে ভিৎ তারা গেঁথেছে, সাম্রাজ্য তারা গড়েছে। অন্ধকার অজ্ঞ আফ্রিকার পায়ে সভ্য ইয়োরোপের চতুর মানুষরা লৌহ শৃঙ্খল পরিয়ে দিয়েছে।

এ বন্ধন-যন্ত্রণা অন্ধকার আফ্রিকা সয়ে আসছে বহুকাল। যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী। কিন্তু তার অন্তর্নিহিত সংস্কৃতিবোধ তার ভেতর মুক্তির স্পৃহা জাগিয়ে দিয়েছে, ক্রমে তাকে করে তুলেছে অগ্নিগর্ভ। সেই অগ্নিগর্ভ আফ্রিকা থেকে আজ তাই একে একে সব বিদেশী শক্তি বিদায় নিতে বাধ্য হচ্ছে। স্বাধীনতার স্থবর্ণ কিরণে এক-একটি আফ্রিকান দেশ আজ সমুজ্জ্বল।

• উত্তর আফ্রিকার কোনো কোনো দেশে মধ্য-এশিয়ার মুসলমান শক্তি স্থায়িভাবে থেকে যাওয়ায়, সেখানে এমনভাবে তুই সংস্কৃতি-

ধারার সমন্বয় ঘটেছে যে, সে-সব দেশে খাঁটি আফ্রিকান সংস্কৃতির অনুসরণকারী লোক আজ আর চোখে পড়ে না। কিন্তু মধ্য-আফ্রিকা এবং পশ্চিম আফ্রিকায় তেমন অবস্থা ঘটেনি। সেখানকার আদি অধিবাসীরা তাদের স্বকীয় সংস্কৃতির দীপ-শিখাকে প্রজ্বলিত রেখেছে। সেই দীপ-শিখার আলোকেই তারা সংস্কারের পথে, সুন্দরের পথে এগিয়ে চলেছে। অবশ্য, এই সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রাখতে কম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়নি তাদের। খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মিশনারির দল আফ্রিকানদের ভেতরে যেয়ে ঘর বাঁধলেন, গীর্জার ভিৎ গাঁথলেন, আর তাঁদের সংস্পর্শে আসার ফলে আফ্রিকা-বাসীদের ধীর-গতি সমাজ-জীবনে কিঞ্চিৎ বেগেরও সঞ্চার হলো। তবে সে শুধু বাইরের সমাজ-জীবনেই, অন্তর-লোকে তা সঞ্চারিত হতে পারেনি। সেখানে আফ্রিকাবাসী তাকে প্রতিরোধ করেছে, প্রতিহত করেছে। সেখানে সে আপন ভাবমণ্ডলে আপন ভাবনার ভাবুক রয়ে গেছে, বাইরের কোন ধ্যান-ধারণাকে দোর-গোড়া পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে দেয়নি। নিজ ভাবনা ও ভাবধারাকে নাড়িয়ে দিতে সে নারাজ। কারণ, এ ভাবনা তার রক্ত-প্রবাহে প্রবাহিত, তার হৃৎ-স্পন্দনের সঙ্গে স্পন্দিত। একে ছেড়ে দিলে সে নিজেই যে আর থাকে না, নিজেই বাঁচে না। কারণ, এখানেই যে তার আফ্রিকানত্ব। এ থেকেই তার নিজস্ব জীবন-দৃষ্টির জন্ম। এ ভাবনাই তার নিজস্ব সংস্কৃতি-ধারার উৎস-মুখ।

আফ্রিকাবাসীর এই বিশেষ ভাবনাটি কি? বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিটি কি?

এ সম্পর্কে আফ্রিকা-বিশেষজ্ঞ ডক্টর পারিণ্ডা লিখেছেন,

'Force, power, energy, vitality, life, dynamism these are the operative motions behind prayers to God, invocations of divinities, offerings to ancestors, every thing that may be

termed religion, including therein what we are pleased to designate 'magic' or 'medicine'. The aim of all these practices being to strengthen and affirm life. . . .

'All things in the visible and world possess some degree or type of force, whether we call it 'soul' or not, animate or inanimate.

'It is evident, then, that the whole tone of the philosophy of most African peoples is distinctly life-affirming. Here is no pessimism or other worldly way of negation.' [৪]

সর্বভূতে এই জীবনারোপ, এই জীবনতৃষ্ণাই আফ্রিকান দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য। এই জীবনবোধে নৈরাশ্যের, হতাশার স্থান নেই, আছে আশা, আছে উচ্ছ্বাস আর জয়ধ্বনি। জীবনকে অস্বীকার করে, জীবনবেগকে পাশ কাটিয়ে এ দৃষ্টি অন্য দিকে যেতে রাজী নয়। কিন্তু ইয়োরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে এ জীবন-দৃষ্টির পার্থক্য কোথায়?

এ প্রশ্নের উত্তরও ডক্টর পারিণ্ডার কথাতেই দেওয়া যেতে পারে। তিনি বলেছেন,

'It might be said that European philosophy assumes that the universe is inanimate, following the presuppositions of materialistic science, whereas African philosophy assumes that there is life, or least power, in all things, being thereby to the modern conception of all pervading energy.' [৫]

আফ্রিকার এই জীবন-দৃষ্টি ও ইয়োরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ এইখানে। বস্তুবাদী চিন্তার ফলে ইয়োরোপীয় সৃষ্টির সব-কিছুতে জীবনসত্তার লীলাকে স্বীকার করে নিতে রাজী নয়। কিন্তু আফ্রিকা-বাসীর জীবনদর্শন ঠিক তার উল্টো। তাই সৃষ্টির সর্বত্র সকল বস্তুতে জীবন-রাখাল তার বাঁশী বাজিয়ে চলেছে। সেই বাঁশীর সুরেই সৃষ্টির সকল কিছু ছন্দিত ও স্পন্দিত। আমাদের চারপাশে এই যে প্রকৃতি একটি সুশৃঙ্খল নিয়মের ভেতর দিয়ে প্রতিদিন কাজ

৪, ৫ West African Psychology by Dr. Parinda.

করে চলেছে, এর ভেতর জীবনের ছন্দ ও শক্তির উত্তাপ না থাকলে তার পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব হতো না। কাজেই, জীবন সত্য এবং এ সত্যও সর্বজীবে, সর্বভূতে এবং সর্বত্র বর্তমান।

আফ্রিকার এই জীবন-দৃষ্টি ইয়োরোপের কাছে অপরিচিত হলেও, ভারত-চিন্তার সঙ্গে এর গভীর সাদৃশ্য, একাত্মতা রয়েছে। হিন্দু দর্শনে সৃষ্টির অন্তরালে এক অদৃশ্য অমোঘ শক্তির লীলার কথা স্বীকার করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লেখ আছে ঃ

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়।

যে ভজন্তি তু মাংভক্ত্যা ময়িতে তেষু চাপ্যহম্॥ (নবম অধ্যায়)

অর্থাৎ, শ্রীভগবান বলেছেন, আমি সর্বভূতে সমভাবাপন্ন। আমার দ্বেষের বা প্রীতির পাত্র কেউ নেই। তবে যাঁরা ভক্তিভাবে আমার ভজনা করেন তাঁরা যে জাতীয়ই হোন না কেন, তাঁরা আমার মধ্যে বিরাজ করেন, আমিও তাঁদের মধ্যে বিরাজ করি।

এই যে সর্বভূতে ঈশ্বরানুভূতির মনোভাব তা মানব-মনীষাকে মহিমান্বিত করে, সংকীর্ণতার প্রাচীর ভেঙে মানব-দৃষ্টিকে ব্যাপক করে তোলে। এই দিক থেকে আফ্রিকা ও ভারত পরস্পরের খুবই কাছাকাছি।

আধুনিক সভ্যতার বিচারে আফ্রিকার মানুষকে যত পশ্চাদ্‌পদ বলেই ধরা হোক না কেন, প্রেম-প্রীতিতে, হাসি-কান্নায় এবং সুখে-দুঃখে পৃথিবীর আর সব মানুষের মতোই তাদের মনেও একই রকমের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তারাও যে সমগ্র মানব-জাতির একটা অংশ এ বোধ তাদের নেই এরূপ মনে করা ভুল। অস্ট্রেলিয়া বা আন্দামানের আদিবাসী, ভারতের নানা উপজাতি এবং আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান প্রভৃতির ন্যায় আফ্রিকার মানুষের মধ্যেও একটা সুপ্ত সাংস্কৃতিক চেতনা বিদ্যমান রয়েছে। ধীরে ধীরে চেতনার বিকাশও

ঘটেছে। নিজেকে বিশ্ব-সংস্কৃতির সন্তান মনে করেন বলেই বিখ্যাত নিগ্রো কবি কে. এল. কুয়েস্টাস আপনার মধ্যে বিশ্বরূপ দর্শন করেছেন। তিনি তাঁর একটি কবিতায় লিখেছেন—

……তারপর আমার আত্মায়
সূর্য বিস্ফোরণ ;
এবং সে আত্মা পুড়ে ছারখার।
সমগ্র মানবজাতির বেদনার বন্যাকে
আমি ধারণ করলাম
আর সবাই ভাবলো,
ও শুধু আমারই কান্না !

অপূর্ব ! এমনিভাবেই মানুষের অন্তর্নিহিত সংস্কৃতিবোধ অন্ধকারকে অপসারণ করে চলেছে, বিশ্ব-সংহতি ও বিশ্ব-সমন্বয়ের পথকে সহজ এবং সুগম করে চলেছে।

আর এই নবজাগৃতির সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় আফ্রিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আফ্রিকা-তত্ত্ব অনুশীলনে যে সাড়া জেগেছে তা থেকে। বাস্তবিকই 'প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়েরই স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি একটা কর্তব্য আছে। সীমাবদ্ধতায় সে দায়িত্ব কিঞ্চিৎ সঙ্কীর্ণ ও আঞ্চলিক হতে বাধ্য। তাহলেও এ নিতান্তই স্বাভাবিক যে, যে-কোনো জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ই জার্মান ভাষা-সাহিত্য এবং জার্মান ইতিহাস ও সমাজ-তত্ত্ব সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত একটু বেশী আকর্ষণ বোধ করবে। ও বিষয়টি প্রত্যেক দেশের পক্ষেই তার স্বকীয় চিন্তার ব্যাপার।' আফ্রিকান মনীষী ডঃ সাবুরাই বিয়োবাকু-র এ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে তাঁর লিখিত 'আফ্রিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে আফ্রিকা-তত্ত্বের চর্চা'[৬]

---

৬ *African Studies in a African University* by Dr. Saburai Biobaki

বিষয়ক এক দীর্ঘ আলোচনায়। তাঁর এ-মত অত্যন্ত যুক্তি-গ্রাহ্য ও সত্য-সম্মত এবং তিনি যথার্থভাবেই তাঁর প্রবন্ধে প্রমাণ করেছেন যে, যে জাতি আপন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন নয়, অন্যান্য জাতির কাছে তার প্রাপ্য স্বীকৃতি লাভ কিছুতেই সহজ হতে পারে না। ডঃ বিয়োবাকু দেখিয়েছেন, ইংরেজ এবং ফরাসীরা আফ্রিকায় তাদের নিজ নিজ অধীনস্থ দেশগুলিকে পাশ্চাত্য ভাব-ধারায় উন্নত কবে তুলতে সচেষ্ট, আফ্রিকার স্বকীয় সংস্কৃতির মূল্যায়নে কোনোদিন তারা উদ্যোগী হয়নি। ফলে, আফ্রিকাবাসীরা এতকাল তাদের নিজেদেব সংস্কৃতির দীপালোককেই তেমনভাবে অনুভব করতে পারেনি। এই দিক থেকেই আফ্রিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আফ্রিকা-তত্ত্ব চর্চার ব্যবস্থা এবং তথাকথিত এই 'অন্ধকার মহাদেশে'র বিভিন্ন অংশে আফ্রিকা-তত্ত্ব গবেষণাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা শুভারম্ভের ইঙ্গিতবাণী। ডঃ বিয়োবাকু ঠিকই বলেছেন, 'আফ্রিকার সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিস্তারের পক্ষে এই হলো যথার্থ উপায়।...বিশ্বসংস্কৃতির ক্ষেত্রে আফ্রিকার যে বিশিষ্ট দান নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে এভাবেই তা স্বীকৃতি পাবে।' এবং এই পথেই তা যে ক্রমে ক্রমে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে, সে লক্ষণও আজ সুস্পষ্ট। আজ যতই আফ্রিকা পরাধীনতার গ্লানি কাটিয়ে উঠছে ধীবে ধীরে, পৃথিবীর দেশে দেশে ততই ধুম পড়ে গেছে আফ্রিকা-চর্চার। আর ঠিক সেই অনুপাতেই আফ্রিকাবাসীদের মনেও বিশ্ব-ভাবনার তরঙ্গাঘাত ঘটে চলেছে।

শেষ কথা

মানুষের জীবন বহুমুখী, বহু ধারায় জীবন প্রবাহিত। সংস্কৃতির আলোকে আমরা যেমন সেই সব ধারায় মানুষের নানাবিধ কার্য-কলাপের বিচার করে থাকি, মানুষের জীবনের নানা দিকের ওপর সংস্কৃতির কোথায় কি প্রভাব—সংস্কৃতির ধর্ম কোথায় কিভাবে কতটা কার্যকর, তাও আমাদের তেমনি গুরুত্বসহকারে বিচার্য। পূর্বেকার অধ্যায়গুলোতে জীবনের নানা ক্ষেত্রে সংস্কৃতির কাজ সম্পর্কেই মোটামুটি আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিশ্চয় করে এ-কথা বলা চলে না যে, মূল 'সংস্কৃতি' শব্দটি সম্পর্কে পাঠকদের মনে যথার্থ কোনো ধারণা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে।

একটি বহু-আলোচিত এবং বহু-পুরাতন শব্দ এই 'সংস্কৃতি'। এত শ্রদ্ধা ও সমীহা বোধ করি আর কোনো শব্দই বহন করে না। সংস্কৃতিবান ব্যক্তি সম্পদশালী না হলেও, তাঁর সম্মান মহা সমৃদ্ধি-শালীরও অনেক ঊর্ধ্বে। কিন্তু তবুও এ-কথা নিরতিশয় দুঃখজনকভাবেই সত্য এবং অসঙ্কোচে স্বীকার্য যে, যুগে যুগে এই সংস্কৃতি কথাটিকেই অপব্যাখ্যার নিগ্রহ সয়ে আসতে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। আর যে শব্দটি এমনি ভীষণভাবে নিগৃহীত, সে হলো 'ধর্ম'। মজার কথা, সংস্কৃতি ও ধর্মের মধ্যে যে গভীর যোগসূত্র রয়েছে (অন্ততঃ ভারতবর্ষের মানুষের কাছে ধর্ম-বর্জিত সংস্কৃতি অকল্পনীয়), সে-কথা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। যাই হোক, এ-দুটি শব্দের ওপর অপব্যাখ্যার নিগ্রহ সম্বন্ধে ইংরেজ সমালোচক W. P. Ker যে মন্তব্য করেছেন, তা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন,

"There can be no doubt that the word (culture) has been badly treated. It has been treated almost as cruelly as the

word religion, and in much the same way. Both words have suffered from being carried far away from their original meaning. It is a fallacy, of course, and a familiar one, to say that words are only to be used in their strict etymological sense, the original sense need not be the right one. But very often the original meaning is nearly the best, and that is the case with the words culture and religion. Religion, meaning duty and implying reverence and awe, is degraded to mean a sort of invention that may be pocked up, or a kind of sentiment to be proud of. Culture, which implies some process of training and discipline, a definite aim, and the choice of adequate means often is made to denote the very reverse of all this—the dissipation of the mind, without aim or study or even any strong desire, among ready made opinions, with a wearisome pretence of interest in 'ideas' ১

কেউ মনে করেন সংস্কৃতি মানে বিদ্যা, আবার অনেকের ধারণা সংস্কৃতি মানে আভিজাত্য। সাধারণ অর্থে সংস্কৃতি বলতে বুঝায় শিল্প-সাহিত্য, আর একেবারে 'গণ' অর্থে সংস্কৃতির পরিচয় এসে দাঁড়িয়েছে নাচ-গানে। এই খণ্ডিত অনুভূতি ও আংশিক উপলব্ধির সঙ্গে কেবলমাত্র বোধ হয় 'অন্ধের হস্তীদর্শন'-এরই তুলনা চলে।

সংস্কৃতির সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সংস্কৃতির যথার্থ মানে পূর্ববর্ণিত কোনো অর্থই নয়, এমনকি তাদের সমষ্টিফলও নয়। সংস্কৃতি হলো আসলে মানুষের মনের নিঃস্বার্থ বিকাশোন্মুখতা। জৈবিক জীবনের ঊর্ধ্বে আরও একটি স্বতন্ত্র জীবন আছে, এ সত্য যেদিন মানুষ উপলব্ধি করেছে, সেইদিনই সংস্কৃতির অরুণোদয় ঘটেছে পৃথিবীতে। মানুষ যে ক্রমে ক্রমে তার সমস্ত পশুবৃত্তিকে সংযত করে সত্যকারের 'মানুষ' হয়ে উঠছে, তা হচ্ছে তার সংস্কৃতিবোধের প্রেরণায়, তার সংস্কৃতিসাধনায়। মানুষের মনের সব অন্ধকার দূর হয়ে চলেছে সংস্কৃতির প্রোজ্জ্বল আলোয়।

১ *On Modern Literature* : W. P. Ker

উপমা হিসাবে বলা যায়, সংস্কৃতি হলো সূর্যের আলো, আর তারই দ্যুতিতে উজ্জ্বল গ্রহ-উপগ্রহের মতো চতুর্দিকে অবস্থিত রয়েছে সভ্যতার নানা বাহন—সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, চিত্রকলা, নৃত্য-গীত ও যাবতীয় চারু ও কারু শিল্প। অন্ধকার আকাশে চাঁদের আলোয় মুগ্ধ হয়ে আমরা যদি সকল আলোর আকর সূর্যকে ভুলে যাই, তাহলে যে ভুল করা হবে ঠিক তেমনি ভুলই আমরা করে থাকি নৃত্য-গীতাদির সরস ঔজ্জ্বল্যের বিভ্রান্তিতে সভ্যতার মূল উৎস সংস্কৃতিকে ভুলে গিয়ে। এই মূল সত্যটি আমাদের অনেক সময়ই মনে থাকে না যে, সূর্য ছাড়া যেমন বিশ্বচরাচরের সব-কিছুই মৃত, সংস্কৃতির সম্পর্কবর্জিত শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদিও তেমনি অন্তঃসারশূন্য এবং অর্থহীন। সংস্কৃতির বিকৃত অর্থের ব্যাপকতার ফলেই এযুগে সংস্কৃতির সম্পর্কহীন অন্তঃসারশূন্য কলাবিদ্যার দিক্‌দিগন্ত-বিস্তৃত প্রসার সম্ভব হয়েছে।

অবশ্য, ডবলিউ. পি. কের ঠিকই বলেছেন, কোনো শব্দের একেবারে আদি ভাবটিকেই বরাবর অব্যাহত রাখতে হবে কিংবা আদি বা মূল ভাবটিই নির্ভুল হবে, এমন কোনো কথা নেই; কিন্তু মূল অর্থটি প্রায়শই শ্রেষ্ঠ অর্থ, আর সংস্কৃতি এবং ধর্ম কথা দুটি সম্পর্কেও এ-কথা প্রযোজ্য। কর্তব্য ও ভক্তি ভাবার্থক ধর্ম কথাটিকে অতি নীচে নামিয়ে আনা হয়েছে, আর সংস্কৃতি—যার মধ্যে সূচিত হয় একটি নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রক্রিয়া, একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও লক্ষ্যসিদ্ধির যথোপযুক্ত পন্থা—আজ তা প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে দাঁড়িয়ে গেছে। মনের অবক্ষয়, দিশাহীনতা এবং কতকগুলো বাঁধাধরা মতামতের মধ্যে একটা দৃঢ় আকাঙ্ক্ষার পর্যন্ত অভাব—সংস্কৃতির বিকৃত বোধের ফলে সমাজের এই রূপ একালে আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হচ্ছে।

একজন বিশিষ্ট পর্যবেক্ষক[১] ফরাসী বিপ্লবের প্রথম কয়েক বৎসরের

১ Antoine Rivarol—1789

ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে শ্লেষের সঙ্গে লিখেছিলেন, কী করে মহান্ দার্শনিকদের রচনা সমাজের গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষ উপেক্ষা করে থাকে কিংবা তার অপব্যবহার করে। দীর্ঘদিন উপেক্ষিত থাকবার পর সেই সব রচনার যে সমস্ত নীচুস্তরের ভাষ্য হয়, তাকেই তখন লোকে সমাদর করতে শুরু কবে। ফরাসী বিপ্লবের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষকের এই মন্তব্য ভুল হোক বা নির্ভুল হোক, তাঁব এই কথা আমাদের স্মরণ কবিয়ে দেয়, কী করে মানুষ বহু জিনিসকে ভ্রান্তরূপে গ্রহণ করে জ্ঞানকে করে বিকৃত বা ব্যর্থ। অনেক মহলে এমনিভাবেই সংস্কৃতিরও অধঃপতন ঘটেছে। বিদ্যার কোনো ধ্যান-ধারণাই যাদের নেই, তাদেরই অনেককে দেখা যাচ্ছে বিদ্যার ফলাফল নিয়ে এবং সংস্কৃতির নানা দিক নিয়ে কোলাহল করতে এবং সে-সবের যদৃচ্ছ ব্যবহার করতে।

ইতিহাসের সবচেয়ে বেদনাদায়ক দৃশ্য হলো এই যে, মহৎ মানুষদের চিন্তা-ভাবনাগুলোব সাফল্যের প্রক্রিয়ার পথে বা প্রক্রিয়ার মধ্যেই সেই সব চিন্তাধারার অধোগতিও ঘটে থাকে।

মনকে উন্নত করাই সংস্কৃতির চরম সার্থকতা; কিন্তু বড় বড় শিল্পী, সাহিত্যিক প্রভৃতি তাঁদেব নিজ নিজ সৃষ্টিকার্যেব উদ্দেশ্যেব মধ্যে সংস্কৃতিকে সীমাবদ্ধ রাখতে প্রয়াস পেয়েছেন। সংস্কৃতির বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যা নিয়ে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রধানত দুটি দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় ইয়োবোপে। ইংরেজি সাহিত্যের বিচারে দেখা যায়, মানুষের অনন্ত সত্তাব ওপব সংস্কৃতিকে দাঁড় করাতে চেয়েছেন একটি মহল, আর অন্য একটি মহলে সংস্কৃতির কাজ চলেছে মানুষেব বাস্তব সঙ্গতির প্রয়োজনের মধ্যে। এই দু'দলের প্রতিনিধি হিসাবে দেখানো চলে মিলটন আর সুইফটকে। বলা বাহুল্য, উভয় দলেরই চিন্তার ভিত্তি মানবিকতাবাদ বা হিউম্যানিজম। তবে শেষোক্ত দল জ্ঞানের ভাণ্ডারে কিছু কাঁচা রসের সমজদার। ব্রাউনিং আবার

বিভিন্ন জায়গায় মিলটন এবং সুইফট-এর স্বতন্ত্র দুটি আদর্শকে ভিত্তি করেই আলোচনা করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষের অনন্ত জিজ্ঞাসায় এসেই তাঁর সিদ্ধান্তকে খাড়া করেছেন, মানব-প্রেমিক জোনাথান ডিন সুইফট-এর একশ' বছর পরে প্রকৃতির কবি উইলিয়ম ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ যা বলেছেন তা-ও অনেকটা সুইফট-এরই অনুরূপ। তিনিও অত্যধিক জটিলতা অপছন্দ করেছেন, যে জটিলতা মানুষের বাস্তব জীবনের চলার পথকে বিঘ্নিত করে। তবে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ-প্রদর্শিত সমাধানাদি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। সুইফট মনে করতেন, মানুষ তার অনন্ত শক্তির ধারণায় বড় বেশি উদ্ধত, তাকে সংযত করা উচিত, তার স্বাধীনতার রাশ টেনে রাখা উচিত। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ-ও মানুষের এই দম্ভের দুর্দান্ত পরিচয় নিজের জীবনেই নানাভাবে পেয়েছেন, তাই প্রকৃতির দিকেই ছিল তাঁর মূল আকর্ষণ। তাহলেও সুইফট চেয়েছেন মানুষের বৈজ্ঞানিক দাপট বা বাহ্যিক উদ্যমকে শৃঙ্খলিত করতে; কিন্তু ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ তা চাননি। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ পড়ে অবশ্য মনে হতে পারে, তিনিও আধুনিক যুগের জটিল সংস্কৃতিকে একেবারে পরিহার করে সেই আদিম যুগের সহজ প্রাকৃতিক জীবনে ফিরে যেতে চেয়েছেন। এ ধরনের সহজ সুন্দর স্বাভাবিক জীবনের প্রতি সর্বাধিক আকর্ষণ বোধ করলেও, বৈজ্ঞানিক যুগের প্রাপ্তিকে কখনো তিনি অস্বীকার করেননি বা কোথাও তার বিরূপতা করেননি।

বিগত দুই শতাব্দীতেই (অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দী) 'সংস্কৃতি সম্পর্কে ভ্রান্তি ও আতিশয্য'-এর ব্যাধি ধরা পড়েছে।[১]

অষ্টাদশ শতাব্দীর সুইফটবাদীরা বলেছেন, "তোমার খরচা শতকরা নব্বুই ভাগ কমাও এবং আয় অনুপাতে জীবনধারণ করো। নির্বোধের মতো শুধু কাজ করো না, সরল ও সাদাসিধা ভাবে

১ ***On Modern Literature*** : W. P. Ker.

চলো ; তোমার মনকে সহজ করো।" পক্ষান্তরে, উনবিংশ শতকের পথ-নির্দেশকরা বলেছেন, "তোমাকে কতদূর পর্যন্ত যেতে হবে, কতটা বোঝা তোমাকে বইতে হবে, সেটা আমাদের বলবার কথা নয়। অনেক জিনিস রয়েছে যা পেতে হবে, অনেক কাজ রয়েছে যা করতে হবে। হয়তো তোমাদেরই কেউ কেউ তা পাবে ও করবে। আধ্যাত্মিক ও শব্দগত বিচারে সংস্কৃতির জন্য চাই আলো, বাতাস ও সময়। অনেক কিছুই রয়েছে যা সংস্কৃতির পক্ষে সহায়ক ; কিন্তু সহায়ক বা হিতকর হলেও এগুলোর আহরণ সংস্কৃতি নয়।"

ভাষা সংস্কৃতির মুখ্য বাহন। ভাষা নেই মনুষ্যেতর প্রাণি-জগতের, তাই সংস্কৃতিরও কোনো বালাই নেই তাদের। ভাষার মাধ্যমেই সমাজের এক মানুষ অপরকে বুঝতে চেষ্টা করেছে, একের চিন্তা প্রতিফলিত হয়েছে অপরের অন্তর-মানসে। তাতে পরস্পরের সান্নিধ্য নিকটতর হয়েছে, মানুষে মানুষে সৌহার্দ্য গড়ে চলেছে নিবিড়তর-ভাবে। ভাষার আশ্রয়ে এমনিভাবেই সাংস্কৃতিক ভাবস্রোতে একাত্ম হয়ে উঠেছে এক-একটি জাতি। যতদিন সে-স্রোতের উৎস অ-স্তিমিত রয়েছে, তত কালই অপরাজেয় থেকেছে সে-জাতির অখণ্ড সত্তা। ইতিহাসের শত অভিশাপেও বিনষ্ট হয়নি তারা। ইহুদিরাই এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ। নিজ বাসভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে প্রায় দু'হাজার বছর আগে তারা ছড়িয়ে পড়েছিল সারা পৃথিবীতে। কিন্তু তবুও ইহুদিজাতি মরেনি, সংস্কৃতির জীবনকাঠির ছোঁয়ায় অমর অবিনশ্বর হয়ে থেকেছে তারা। ইস্রায়েল তাদের দুই সহস্রাব্দব্যাপী জীবন-যুদ্ধের সাফল্যের স্বীকৃতি।

সংস্কৃতির শক্তি যতদিন অটুট অক্ষুণ্ণ থাকে, ততদিন অস্ত্রের শক্তিও শেষ অবধি হার মানতে বাধ্য হয় তার কাছে। এইজন্যই আমরা দেখতে পাই শক-হূণ-পাঠান-মোগলের দুর্নিবার স্রোতধারাও গতি

হারিয়ে একাকার হয়ে গেছে 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে'। অস্ত্রবলে রোম একদা জয় করেছিল সংস্কৃতিবলে বলীয়ান গ্রীসকে, কিন্তু কয়েক দশকের মধ্যেই কল্পনাতীত ঘটনা ঘটে গেল। বিজেতাকেই জয় করে বসলো বিজিত, অস্ত্র নতি স্বীকার করলো সংস্কৃতির কাছে। গ্রীসের সংস্কৃতির আলোয় নতুনভাবে আলোকিত হয়ে উঠলো রোমের মনোরাজ্য। এই বিস্ময়কর ঘটনাকে ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন 'The conquerer was conquered' বলে। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের ইতিহাসেই বার বার ঘটেছে এমনি ঘটনার পুনরাবৃত্তি। এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের মানুষের প্রথম সাক্ষাৎ হয়তো ঘটেছে প্রচণ্ড সংঘর্ষের পরিবেশে, কিন্তু পরে তাদের মধ্যে প্রকৃত মিলনের সেতুবন্ধন ঘটিয়েছে সংস্কৃতি। ইয়োরোপ একদিন সাম্রাজ্যবাদের কঠিন শৃঙ্খলে বেঁধেছিল প্রায় সমগ্র পৃথিবীকে। সে শৃঙ্খল আজ ভেঙে খান্‌খান্‌ হয়ে চলেছে, কিন্তু তার জন্য মিলনের সূত্র ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে না সেই সঙ্গে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বেদনাদায়ক বন্ধন আজ কমনওয়েলথ-এর সৌভ্রাত্র বন্ধনে পর্যবসিত। আজও ভেদাভেদকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শাসক। কমনওয়েলথ-এর মহামিলনের আসবে তাই তার স্থান প্রত্যাখ্যাত। বিশ্বসংগঠন রাষ্ট্রসঙ্ঘেও সে ঘৃণিত, ভৎর্সিত এবং একঘরে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘে আজ একুশটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি মনের কথা প্রকাশ করেন ফরাসী ভাষায়, ঊনিশটি রাষ্ট্রের জাতীয় ভাষা স্পেনীয়। ইয়োরোপের দুটি ভাষার মাধ্যমে তিন মহাদেশের চল্লিশটি দেশ এমনিভাবেই পরস্পর প্রভাবিত ও ঘনিষ্ঠ হয়ে চলেছে। বহুতর দেশের সঙ্গে ইংরেজী ভাষাও সেই যোগসূত্রের কাজ করে যাচ্ছে দীর্ঘকাল ধরে। একদিন অস্ত্রের ওপর নির্ভর করেই ঘটেছিল এই বিপুল বিস্তার। কিন্তু সেই অস্ত্র আজ প্রায় সবক্ষেত্রেই অন্তর্হিত

এবং অস্ত্রের স্থলে সংস্কৃতিকে ভিত্তি করেই দেশে দেশে আজ গড়ে উঠছে স্থায়ী সম্পর্ক। এই প্রসঙ্গে সমগ্র বিশ্বে এক ভাষা প্রবর্তনের প্রয়াস—'এসপারেণ্টো'র প্রচলন এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের পথে ভাষা-সমস্যাই প্রধান অন্তরায়। সেই সমস্যার সমাধানে 'এসপারেণ্টো'র আবিষ্কার ও আবির্ভাব অভিনন্দনীয়। ইউনেস্কোর প্রেরণায় UEA[১]-র উদ্যোগে বিভিন্ন দেশেই আন্তর্জাতিক ভাষা 'এসপারেণ্টো'য় সাময়িক পত্র ও গ্রন্থাদি প্রকাশিত হচ্ছে। বহু প্রাচীন গ্রন্থের অনুবাদ হচ্ছে 'এসপারেণ্টো'য়। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সাংস্কৃতিক সংযোগ-বিধানে এ এক অমোঘ অস্ত্র।

সংস্কৃতির পটভূমিকায় বিশ্ব-সমন্বয়ের প্রসঙ্গ আলোচনায় বার বারই রাষ্ট্রসঙ্ঘের কথা এসে পড়েছে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন,

"Whether it be by grouping of powerful and organised states enjoying carefully regulated and legalised relations with each other or by the substitution of a single world-state for the present half-chaotic half-ordered comity of nations" [২]

কোনো রাষ্ট্রশক্তি দ্বারাই বিশ্বসমন্বয় সাধনের স্বপ্ন সফল হবার নয়। তাঁর মতে,

"If the religion of humanity which is at present the highest active ideal of mankind, spiritualises itself and becomes the general inner law of the human life" [৩]

তাহলেই এবং তখনই সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে যথার্থ ঐক্য সংঘটিত হবে। এককথায় 'মানুষেরই ধর্ম'ই মানুষকে ঐক্যবদ্ধ

---

১ Universal Esperanto Association. Ref. *Orient Occident, News Organ of Unesco's Major Project on Mutual Appreciation of Eastern and Western Cultural Values.*

২ *The Ideal of Human Unity* : Sri Arobindo (1919)

৩ *The Ideal of Human Unity* : Sri Arobindo (1919)

করবে এবং তারই মধ্যে সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম বিকাশের পরিচয়। আজকের দিনে মানুষের চেতনা মানবিক ঐক্যের আদর্শটিকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করেছে। বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের চিন্তাও সেই চেতনা থেকেই উদ্ভূত। কিন্তু এই ধরনের জাগৃতি, অগ্রগতি ও ঐক্যবিধান নিছক রাষ্ট্রের সাধ্যায়ত্ত নয় এই কারণে যে, আসলে রাষ্ট্র তো সংযুক্ত ও সংগঠিত আত্মম্ভরিতারই প্রতীক। অবাধ সহযোগিতা ও সহজাত প্রেরণা থেকেই সমাজ এগিয়ে যায়, আর রাষ্ট্র এগুলোকে দমিত ও চূর্ণ করে। আত্মবিকাশের জন্য মানুষ মন থেকে চায় সমাজকে, রাষ্ট্রকে নয়। এ বিষয়টিই বিশ্লেষণ করে শ্রীঅরবিন্দ দেখিয়েছেন যে, সাম্রাজ্য জাতি বিশ্ব-সাম্রাজ্য ইয়োরোপ-যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি রাষ্ট্রিক বা প্রশাসনিক স্তরে যান্ত্রিক ঐক্য রচনা সম্ভবপর হলেও তা হবে বিপজ্জনক। মানবজাতির যথার্থ ঐক্য তখনই সম্ভব হবে যখন মানুষের ধর্মবোধ (সংস্কৃতি) আধ্যাত্মিকতায় রূপান্তরিত হবে এবং মানব-জীবনের সর্বমান্য নিয়মে পরিণত হবে। মানুষের ধর্ম হচ্ছে তাই যাতে এমন একটি নিগূঢ় সত্তা, এমন একটি দৈবী শক্তির অস্তিত্ব রয়েছে যেখানে আমরা বস্তুতই সকলে এক। শ্রীঅরবিন্দ রাষ্ট্রিক বা প্রশাসনিক সংগঠনের বিরোধিতা করেননি, কিন্তু মানবিক ঐক্যের মূল সূত্রটিকে এক নতুন দিক থেকে নির্দেশ করেছেন,—যা নিতান্তই মানবজাতির অন্তর-অঙ্গের ব্যাপার, বহিরঙ্গের নয়। আর বাস্তবিকপক্ষে সংস্কৃতিও কি তা-ই নয়?

নিঃসন্দেহে বলা যায়, মানুষের মহামিলনের সেতু সংস্কৃতি। সেই সংস্কৃতি আজ নানাদিক থেকে ঘোরতর বিপদের সম্মুখীন। তাই মহাসঙ্কট আজ বিশ্বসভ্যতারও। ঐশ্বর্যের দম্ভ, শক্তির দম্ভ, ধর্মের ছদ্মবেশে অন্ধ কুসংস্কার সংস্কৃতিকে বন্দী করতে চাইছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডির বদ্ধকুণ্ডে। সূর্যের আলোর মতো সংস্কৃতিও বিশ্বসম্পদ।

কিন্তু ঐশ্বর্যবানের আকাশ-ছোঁয়া প্রাসাদ যেমন করে সূর্যের আলো থেকে বঞ্চিত রাখে পশ্চাতের পর্ণকুটিরকে, ঠিক তেমনি করেই একালের শক্তিমানরা সংস্কৃতিকে তাদেরই অধিকারভুক্ত করে নিতে উদ্যত হয়েছে। বহু ভগীরথের জীবন-সাধনায় যে মন্দাকিনী স্রোত নেমে এসেছে মর্ত্যের ঘাটে ঘাটে, ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র, ওরা চায় আবার তাকে এখানে-ওখানে ওদেরই পাহারায় পাথরের কুণ্ডে কুণ্ডে বন্দী করে রাখতে। তাই আজ শোনা যায়, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংস্কৃতির কথা, হিন্দু ও ইসলামী সংস্কৃতির কথা, অভিজাত নগর-সংস্কৃতি ও লোক-সংস্কৃতির কথা, এবং সংস্কৃতির এমনি আরও কত খণ্ড ক্ষুদ্র ভাগের কথা। এ যেন সতীর সম্পূর্ণ দেহ বিষ্ণুচক্রের আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে একান্ন অংশে। আর সর্বত্র পাণ্ডারা বসে আছে খণ্ডিত দেহাংশের প্রহরী হয়ে কিছু কিছু প্রাপ্তির আশায়।

অশিক্ষা ও কুসংস্কারের প্রভাবে ধর্ম যেমন অধঃপতিত হয় লোকাচারে, ঠিক তেমনিভাবেই একালে আমাদের দেশে শুধুমাত্র নাচ আর গানেই চলে সংস্কৃতির বন্দনা। নাচ আর গানের মধ্যেই নাকি সংস্কৃতির পরিচয়! আর জন-ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই বোধ হয় আমাদের জাতীয় সরকার যখন বিদেশে ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল পাঠান তাতে শুধু দেখা যায় চিত্রতারকা, নৃত্যপটীয়সী ও চিত্রনাট্য-রচয়িতাদেরই ভিড়। পাঁচ-ছ' হাজার বছরের গৌরব-দীপ্ত সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী বর্তমান ভারতের সাংস্কৃতিক দৌত্যের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে প্রধানত এ-সব শ্রেণীর গুণিজনদের ওপর।

দীর্ঘ ইতিহাসের আঁকাবাঁকা গতিপথে সংস্কৃতির আলোয় ভারত-ঐতিহ্যের সমুজ্জ্বল রূপকে অনুধাবনের তেমন চেষ্টা বা আগ্রহ আমাদের কোথায়? এমনকি আধুনিক ভারতের পুনরুজ্জীবনের মহান নায়ক সেই রামমোহনকেও আমরা ভুলতে বসেছি। ভারত-জ্ঞান-সিন্ধু

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার মহামতি টিলক বা কবি ভারতীকে কি আমরা তেমনভাবে স্মরণ করি? বাংলা সাহিত্য ও সমাজ নতুন করে প্রাণ ফিরে পেল যে বিরাট সংস্কৃতিবান পুরুষ-প্রতিভার জাদু-স্পর্শে, সেই বিদ্যাসাগরও আজ বেঁচে আছেন কতকগুলো কিংবদন্তী ও উপকথার মধ্যে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জাতির এইসব মহা-নায়কদের ভুলে যাওয়া মহাপাতক। আশার কথা, একালে একদল সাহিত্য-সাধক এমনি সব মহারথীদের জীবনতথ্য ব্যাপকভাবে সংগ্রহে ব্রতী হয়েছেন এবং তাঁদের জীবন থেকে ঐক্য ও সমন্বয়ের বার্তা বিশেষভাবে তুলে ধরে সংস্কৃতির জয়যাত্রার পথকে সুগম করে তুলছেন। তাঁরা ধন্যবাদার্হ। তামিল কবি সুব্রহ্মণ্য তাঁর 'বিজয় ডঙ্কা' শীর্ষক গানে যথার্থই বলেছেন—

'কাক এবং ঐ চড়াই পাখি
আমাদেরই স্বজাতি,
অসীম সমুদ্র এবং সব পর্বতমালা
আমরা এক দলের।
যেদিকেই তাকাই সেদিকেই
আমরা ছাড়া আর কিছু নেই,
যতই দেখি ততই বেশী আনন্দধ্বনি।'

বাস্তবিকই আমাদের পূর্বাচার্যগণ 'বান্ধবাঃ ভুবনত্রয়ম্' বা 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' প্রভৃতি যে সমস্ত বাণী সহস্রাধিক বছর আগে আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন, তার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর কবি-মনীষীদের রচনায় প্রতিনিয়ত অনুরণিত। এমনকি আমার মতো সাধারণের চিন্তায়ও সেই ভাবনা—

'আমি কি এখানে শুধু?
শুধু এই মুহূর্তের আমি?

কালের সমুদ্রে আমি
ক্ষুদ্র জলকণা, আমি বিশ্বময়।'

এই বিশ্বময়তার ভাবনাই প্রকৃত সমন্বয়তার ভাবনা। এই ভাবনা যত ব্যাপক এবং যত গভীর হবে ততই আমরা শান্তির সান্নিধ্যে এগিয়ে যাব। একটিমাত্র পৃথিবীতে একই হৃদয় কাজ করে চলেছে, অনেক সময় এ-কথা আমরা ভুলে যাই বলেই যত বিরোধ-বিসম্বাদ। ডক্টর রাধাকৃষ্ণণের কথায় বলা যায়

'On earth one family. Truly religious people are called upon to strive for and serve this World-Community. Religious men wll be revolutionaries as long as there are errors to be corrected and evils to be overcome. Their ambition would be to remove the greatest burden of man, namely exploitation of man by man.' ১

এই তো প্রকৃত সমন্বয়-ভাবের কথা। সমগ্র মনুষ্য-সমাজ এক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, বিশ্বমৈত্রীর জন্য এই ভাবনা আজ একান্ত প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, বস্তু এবং চৈতন্যও যে বিরুদ্ধ সত্তা নয়, সে বিষয়টিও পরিষ্কার হওয়া দরকার। অতীত ভারত অন্তর্মুখীন ধ্যানের পথ, চৈতন্যের পথকে অধিকতর গুরুত্ব দিলেও আধুনিক ভারতের বস্তুতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা যে ভুল বা মিথ্যা তা মনে করলে মূলে গোলমাল হয়ে যাবে। বস্তু ও চৈতন্যের মধ্যেও যে অপূর্ব এক সমন্বয়-সূত্র রয়েছে—'A subtle and indefinable fusion of the two terms' ২ তা একালের শ্রেষ্ঠ পদার্থ-বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন। এ-বিশ্ব সর্বদিক থেকেই সমন্বিত, আমাদের সংস্কৃতিও সমন্বিত মানব-সংস্কৃতি—এই সার কথা।

রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব মহাসমারোহেই দেশব্যাপী

---

১ *Occasional Speeches* : Dr. Radhakrishnan

২ *Matter and Light* : Louis D. Briggly

পালিত হলো, কিন্তু আড়াই হাজার গান ও কয়েকটি নৃত্যনাট্যের গণ্ডির বাইরেও যে বিশ্বমানব বিরাট রবীন্দ্রনাথ মূর্ত হয়ে রয়েছেন, তাঁর সম্বন্ধে প্রকৃত উপলব্ধির দাবি আমাদের ক'জনের আছে? আলোর উজ্জ্বলতার অন্তরালে যে অন্ধকার তা সহজে নজরে পড়ে না, নইলে চমকে উঠতাম আমরা আমাদের সম্পদের শূন্যতা দেখে। সুমহান ঐতিহ্য ও বিপুল সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারী হয়েও আমরা আজ প্রায় নিঃস্ব। এবং তারই ফলে অনৈক্য ও বিভেদের বিভ্রান্তি মাঝে মাঝেই আমাদের সর্বনাশসাধনে সমুদ্যত হয়ে ওঠে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিচারে আজিকার ভারত-ভূখণ্ডে এইটিই বোধ হয় সবচেয়ে বেদনাদায়ক দৃশ্য।

সংস্কৃতির কাজ হলো মানুষের মনের অন্ধকার দূর করা, অশিক্ষা, কুসংস্কার ও আত্মম্ভরিতার অন্ধকারে ডুবে আছে যে মন তাকে উদ্ধার করে আলোর পথ ধরিয়ে দেওয়া। পূর্বের একাধিক অধ্যায়ে এ-প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তবু বলতে হয়, 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা' অতিক্রম করে যুগ যুগ ধরে চলেছে যে মানুষের জয়রথ, তার পথের নিশানাই হলো সংস্কৃতি। কিন্তু সংস্কৃতির নিজের আলোই সময় সময় এমন স্তিমিত হয়ে পড়ে যে, একদল মানুষের দুর্বুদ্ধিতে সমগ্র মানব-সমাজ দিশেহারা হয়ে ওঠে। মহাকালের রথের গতি যেন স্তব্ধ হয়ে যায়।

সভ্যতার এই শঙ্কাবহ সঙ্কটের কথাই কবিগুরু বর্ণনা করেছেন তাঁর 'কালের যাত্রা'য়। তিনি বলেছেন, 'মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ বন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথটানার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানব সম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ।' কিন্তু তবুও কবি নিরাশ হননি, বা বিশ্বাস হারাননি মানুষের শাশ্বত শক্তিতে। মহাকালের রথের এই

স্তব্ধতাকে কবি সাময়িক বলেই জেনেছেন। তাই গভীর আস্থা নিয়েই তিনি আমাদের শুনিয়েছেন, 'এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহন রূপে। তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।'

কবিগুরুর এই মহান উক্তি আজ সত্য হতে চলেছে। সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের মতো উদ্দাম গতিতে আজ এগিয়ে চলেছে 'মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকারে' বঞ্চিত নীচের তলার অগণ্য মানুষ। মহাসমুদ্রের গর্জনের মতোই প্রচণ্ড তাদের সমবেত কণ্ঠের জয়োল্লাস। মহাকালের রথও আবার তাই চঞ্চল হয়ে উঠেছে দ্রুত অগ্রগতির উন্মাদনায়। কিন্তু এই উন্মাদনা মানে যে উচ্ছৃঙ্খলতা নয় বা সব-কিছু ভেঙে তচনচ করা নয়, সে-কথাও কবি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। নতুন এই জাগরণও যেন হয় ছন্দোময়। কারণ এই ছন্দোময় চলমান জীবনই হলো সংস্কৃতির কল্যাণময় বসুধারা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছন্দ'-এ বলেছেন, 'যেমন মানুষের আত্মার তেমনি মানুষের সমাজেরও প্রয়োজন ছন্দোময় সংস্কৃতি। সমাজ ও শিল্প। সমাজে আছে নানা মত, নানা ধর্ম, নানা শ্রেণী। সমাজের অন্তরে সৃষ্টিতত্ত্ব যদি সক্রিয় থাকে, তাহলে সে এমন ছন্দ উদ্ভাবন করে যাতে তার অংশ-প্রত্যংশের মধ্যে কোথাও ওজনের অত্যন্ত বেশি অসাম্য না হয়। অনেক সমাজ পঙ্গু হয়ে আছে সমাজের এই ত্রুটিতে, অনেক সমাজ মরেছে ছন্দের এই অপরাধে। সমাজে যখন হঠাৎ কোনো সংরাগ অতি প্রবল হয়ে ওঠে, তখন মাতাল সমাজ পা ঠিক রাখতে পারে না, ছন্দ থেকে হয় ভ্রষ্ট। কিংবা যখন এমন সকল মতের বিশ্বাসের ব্যবহারের বোঝা অচল হয়ে কাঁধে চেপে থাকে, যাকে ছন্দ

বাঁচিয়ে সম্মুখে বহন করে চলা সমাজের পক্ষে অসম্ভব হয়, তখন সেই সমাজের পরাভব ঘটে। যেহেতু জগতের ধর্মই চলা, সংসারের ধর্ম স্বভাবতই সরতে থাকা, সেইজন্য তার বাহন ছন্দ, যে গতি ছন্দ রাখে না তাকেই বলে দুর্গতি।' আর বাস্তবিকপক্ষে সংস্কৃতি-বর্জিত মানুষই হয় ছন্দহীন এবং কবি-বর্ণিত অসীম দুর্গতি তাদেরই জন্য।

এই দুর্গতির অভিশাপে আজ শুধু আমাদের এই দারিদ্র্য ও অশিক্ষা-লাঞ্ছিত দেশই অভিশপ্ত নয়, আতঙ্কগ্রস্ত আজ সারা পৃথিবী। শক্তির দম্ভ, ঐশ্বর্যের অহমিকা ও বিজ্ঞানের বড়াই মাতাল করে তুলেছে বড় বড় কয়েকটি জাতিকে। ফলে, শঙ্কাকুল নিখিলবিশ্ব আজ দারুণ দুর্গতির সম্মুখীন—বিরোধের ব্যাপকতায় পৃথিবীর এগিয়ে চলার ছন্দ আজ পদে পদে ব্যাহত। এই ঘনায়মান দুর্দিনের গাঢ় অন্ধকারে একমাত্র সংস্কৃতির আলোই আমাদের নতুন করে পথ দেখাতে পারে। সংস্কৃতিই শুধু জাগিয়ে তুলতে পারে মানুষের শুভবুদ্ধিকে, পরাস্ত করতে পারে তার পশুমনকে। একালের রাজনীতি সংস্কৃতিবোধ বা ধর্মবোধ বর্জিত বলেই আজ পৃথিবীময় ঘৃণা, বিদ্বেষ ও পঙ্কিলতার এমন ব্যাপক পরিব্যাপ্তি। জাতীয় বা আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ক'জন আছেন চরম শত্রুর বিরুদ্ধেও আজকের দিনে মহাত্মা গান্ধীব মতো বলতে পারেন,

'My non co operation has its root not in hatred, but in love. My personal religion peremptorily forbids me to hate anybody.' ১

একমাত্র সাংস্কৃতিক চেতনাই মানুষের মনকে ঘৃণা, বিদ্বেষ এবং সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা এবং ভেদবুদ্ধি থেকে মুক্তি দিতে পারে। মহাত্মা গান্ধীর মতো সমস্ত বিশ্ব-রাজনীতিকরা যেদিন বুঝতে পারবেন যে, 'Politics bereft of religion are absolute dirt ever to

---

১ জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকারী ডায়ার-প্রসঙ্গে গান্ধীজী

be shunned'. সেদিনই সকল বিরোধের অবসান সম্ভব হবে, তার আগে নয়।

সহস্রের পর সহস্রাব্দ ধরে চলেছে এই গ্রহের বিভিন্ন প্রান্তে বুদ্ধ যীশু জরথুস্ট্র কনফুসিয়াসের জীবনজিজ্ঞাসা, হোমার সেক্সপীয়ার গ্যেটে টলস্টয় ও বাল্মীকি কালিদাস রবীন্দ্রনাথের সুন্দরের পূজা এবং সক্রেটিস লিংকন গান্ধীর অকৃপণ আত্মদান। বিশ্বজোড়া এই যে অগণ্য মহামানবের একনিষ্ঠ তামস-তপস্যা, এ কখনো ব্যর্থ হতে পারে না। আজকের রক্তিম দিগন্ত হয়তো সেই কল্যাণময় প্রত্যূষের ইঙ্গিত, আজকের এই প্রলয় আলোড়ন হয়তো সেই মহাসৃষ্টিরই জন্ম-যন্ত্রণা। তাই দেখি, একদা বৃহত্তম সাম্রাজ্যের অধীশ্বর উদ্ধত অত্যাচারী ইংরেজ জাতিরই একজন মনীষী তাঁর সুদীর্ঘ উপন্যাসে[১] প্রমাণ করে চলেছেন যে, পৃথিবীর মানুষ একে অন্যের সঙ্গে অপরিচিত হলেও আসলে আমরা সবাই ভাই-ভাই। এই ইংরেজ বিজ্ঞানী-ঔপন্যাসিক যে বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে খণ্ড খণ্ড আকারে তাঁর ধারাবাহিক উপন্যাস রচনা করে চলেছেন, এ-যুগের সাহিত্যের পক্ষে তা নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম। চতুর্দিকের অন্ধকাররাজির মধ্যেও এমনিভাবেই দিগ্‌দিগন্তে সংস্কৃতিবোধের বিস্তার ঘটছে, এটা আশার কথা।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্বদেশ, সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা,—তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহংকার আমার ভেদবুদ্ধি স্খালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।'[২] লক্ষ্যে পৌঁছবার পথে মানুষকে এই 'দুঃসাধ্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত' রাখাই সংস্কৃতির আসল ধর্ম।

---

১ *Strangers and Brothers* : C. P. Snow

২ আত্মপরিচয় : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর